শ্রীশ্রী ভারত ব্রহ্মচারী বাবার আবির্ভাব শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

প্রকাশক :
শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবার মন্ত্রশিষ্য ও ভক্তবৃন্দ
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৫৯

মুদ্রণে :
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩

নিবেদন

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের কথা, উপদেশ ও প্রসঙ্গ সংগৃহীত হয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেশিত হলে মনুষ্যসমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হয়। ধর্ম, দর্শন ও বিচিত্র রকমের শিক্ষা ও সাধনার অনুকূল প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে মানুষের চিন্তা, কর্ম ও জীবনযাত্রা সবল ও সফল করে।

শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারী বাবার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কথা ও উপদেশ ও তাঁহার সঙ্গে জীবনের মূলকথা যাহা পাওয়া যায় তাহা এই "শতবর্ষজন্মবার্ষিকী গ্রন্থ" গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণ মিলে প্রকাশিত করলেন।

শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারী বাবার আবির্ভাব শতবার্ষিকীর স্মারক এই গ্রন্থ প্রকাশে নানাকারণে বিলম্ব হয়েছে। যাঁর উপর প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি ব্রহ্মচারী বাবার মন্ত্রশিষ্য।

একাজে তিনি অগ্রসরও হয়েছিলেন। এমনি সময়ে তাঁর ডাক এল পরপাব থেকে। তিনি চলে গেলেন। গুরুদেবের কাছের মানুষ তাঁর আরও কাছে গেলেন—অমৃতলোকে। তারপর নানা বিশৃঙ্খলা ও প্রতিবন্ধকতা একাজেব অগ্রগতি ব্যাহত করে। যা হোক, বর্তমানে অনেকের চেষ্টায় ও সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশের পথে।

এই স্মারক গ্রন্থে অনেক বিদগ্ধ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, বিচার করেছেন এবং তাঁদের রচনার মাধ্যমে নিজ নিজ শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেছেন। অংশবিশেষ হলেও তাঁরা সমুদ্রই দেখেছেন এবং তাঁদের বর্ণনা সমুদ্রেরই। রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মত যিনি ব্রহ্মময়ীর আদরের দুলাল তার পূর্ণ রূপ এক পলকে দেখা ও বুঝা সম্ভব নয়। তাই সকলের আলোচনার সামগ্রিক মর্ম অনুধাবন করলেই এই মহাপুরুষের ভাগবত কর্মধারার স্বরূপ কিছুটা বোধগম্য হবে।

শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব এক যুগসন্ধিক্ষণে। তাঁর লীলার যে বৈচিত্র্য তা সত্যি বিস্ময়কর। তিনি সাধারণের মধ্যে অসাধারণ। কখনও লৌকিক আচরণে, আবার কখনও অলৌকিক যোগ-বিভূতিতে তিনি রূপের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন অরূপের বার্তা, বস্তুর মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন আত্মার প্রকাশ।

'ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়ানি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্ব কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।'—উপনিষদের এই বাণী মূর্ত এই মহাত্মার জীবনে। দেশের তথা জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি আহ্বান করেছিলেন মহাশক্তিকে। বৈদিক ঋষিগণের মত মনোবুদ্ধির অগোচরে যে সত্য নিহিত, তাকে নামিয়ে এনেছিলেন মনোবুদ্ধির জগতে, উপলব্ধি করেছিলেন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন—যা সত্য তা প্রতিষ্ঠার জন্য মহাশক্তি কাজ করে চলেছেন মানুষেরই ভিতব দিয়ে। নির্জ্ঞানের মোহে পরে মানুষ যেন ভগবানের কাজে বাধা না দেয়। সত্যকে জীবনে ও সমাজে প্রকট করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেই সত্যস্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তি তা সম্পাদন করান।

ব্রহ্মচারী মহারাজ ব্রহ্মচারী হয়েও জগতে মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় সদাসচেষ্ট ছিলেন। তিনি একদিকে ধর্মযোগী, অপরদিকে কর্মযোগী—স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দন্তি সাধবঃ। নিষ্কাম যোগী ভক্তি-চন্দন চর্চিত কর্মের পুষ্পে দেশমাতৃকার তথা জগজ্জননীর পূজা করে গেছেন। আনন্দলোকে তাঁর বিচরণ, কণ্ঠে তাঁর মহাসরস্বতী। একদিকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বাত্মার স্পন্দন, তেমনি পরাধীনতার শৃঙ্খলে লাঞ্ছিতা দেশজননীর মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন হৃদয়ের অন্তস্তলে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সমাজ ও জাতীয়তাকে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা। এই ধর্ম কোন বিশেষ ধর্মমত বা Religion নয়। সমস্ত মতভেদের ঊর্ধ্বে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের গভীরে এর দৃঢ় ভিত্তি। যার প্রতিষ্ঠায় সমস্ত বিভেদ অপসারিত হয়, জাগ্রত হয় মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান—এই ধর্ম সেই ধর্ম। এ ধর্মের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক বিকাশের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ।

ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধং দশকং ধর্মলক্ষণম্॥

দেশ, কাল ও বিশেষ মানবগোষ্ঠীর সীমায় একে আবদ্ধ রাখা যায় না। এই ধর্ম সর্বজনীন, সর্বকালীন, যা মানুষকে ইন্দ্রিয়ের স্তর থেকে নিয়ে ইন্দ্রিয়াতীত লোকে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই মহাপুরুষের স্থূল অস্তিত্ব ছিল অতি স্বল্প ও অনাড়ম্বর। তা সত্ত্বেও ধর্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির ব্যাপক পরিমণ্ডলে তিনি যে দিব্যচেতনার উন্মেষ

ঘটিয়েছিলেন বর্তমান কালেও তা অপরিহার্য। এ যুগে বিভ্রান্তির কলুষে ধর্মের আলোক পরিবেষ্টিত, আচ্ছন্ন। তামসিক শাসনের গ্লানিভারে দেশ দুর্বল, দলিতপ্রায়। ব্রহ্মচারীবাবার মত মহাজনদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকাই চক্ষু উন্মীলিত করতে পাবে, মনকে অন্তর্মুখী করে জাগ্রত করতে পারে প্রকৃত ধর্মবোধ। সেই সত্যধর্মের দিব্য আলোক উদ্ভাসিত করবে, উজ্জীবিত করবে, উদ্দীপিত করবে উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র সকল মানুষকে। তাঁর বাণী ও কর্মধারায় মুমুক্ষু পাবে মুক্তির সন্ধান, দেশসেবক পাবে নূতন চেতনা, আর সমাজ-সংস্কারক পাবে স্থির প্রেরণা। অমৃতলোকের সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে জানাই আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, প্রার্থনা করি তাঁর আশীর্বাদ।

ভক্তবৃন্দ

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	অষ্টোত্তরশত শ্রীমাতা ভারতেশ্বরী মহাদেবীর ধ্যান—	অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী এম. এ.	১
২।	শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবার জীবনালেখ্য—	... ...	৩

৩। **কল্যাণবাণী ঃ অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক**

শিষ্যগণের নিকট লিখিত পত্রের সারাংশ ... (পৃঃ ৭১—৯৫)

[ইন্দুভূষণ দত্তরায়, শান্তিদানন্দ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্তরায়, যোগানন্দ, মোক্ষদানন্দ, সরলানন্দ, অক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য, সিদ্ধাশ্রমের সন্ন্যাসীগণ, সত্যেন্দ্রচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র ব্রতাচারী, মোক্ষদানন্দ, (কাশ্মীর) শ্রীনাথ চন্দ, মহেশচন্দ্র সরকার, শচীন্দ্রচন্দ্র রায়, কুমুদানন্দ, কুমুদচন্দ্র শীল, অশ্বিনীকুমার ধর, লীলাবতী সরকার, শঙ্করচন্দ্র সরকার, শিবেন্দ্রচন্দ্র রায়, জনৈক ভক্ত, তারকচন্দ্র চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রমোহন দত্ত, সিদ্ধাশ্রমের ব্রতাচারী সন্ন্যাসীগণ]

৪। **কল্যাণবাণী দেশাত্মবোধক**

শিষ্য ও অন্তরঙ্গগণের নিকট লিখিত পত্রের সারাংশ ; (পৃষ্ঠা ৯৫—১০০)

[মহিমচন্দ্র রায়, সুশীলানন্দ, সত্যেন্দ্রচন্দ্র রায়, যোগেশচন্দ্র শীল, রাজেন্দ্রচন্দ্র শীল, নগেন্দ্রচন্দ্র দে]

মনীষী মণ্ডলীর রচনাঞ্জলি ঃ

১। শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারী দেব প্রশস্তি—ডক্টর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ... ১০১

২। ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শ ঃ জগতের কল্যাণ—
ডক্টর রণজিৎ সরকার ... ১০৩

৩। ধর্মধারার মিলনসেতু ভারত ব্রহ্মচারী—
আচার্য যোগেশ ব্রহ্মচারী এম. এ. ... ১২৫

৪। পুণ্যশ্লোক শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও বাণী—
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ১৩২—১৩৮

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

৫। মহাত্মা ভারত ব্রহ্মচারীবাবার ব্রহ্মচিন্তা—
ডক্টব অমিয়কুমার মজুমদার ... ১৩৯

৬। ভারতকথা—শ্রীরণজিৎকুমার সেন ... ১৪৭

৭। ভারত আত্মাব বাণী—ডক্টর হীবেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ... ১৫১

৮। শ্রীশ্রীভাবত ব্রহ্মচারীবাবা ও তাঁহাব পত্রাবলী—
শ্রীজগন্নাথ ভক্তিভূষণ ... ১৫৩

৯। শ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারীজীব আত্মচিন্তা ও স্বদেশচিন্তা—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার ... ১৬৬

১০। শ্রীভাবত চবিতামৃত—শ্রীপুর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য ... ১৭৫

১১। শ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচাবীবাবাব কথা—
ডক্টব আশুতোষ ভট্টাচার্য ... ২০৩

১২। শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবাব সাধন কথা—
অধ্যাপক শ্রীসুবেন্দ্রনাথ দাস ... ২০৭

১৩। ব্রহ্মচারীবাবা ভাবতচন্দ্র—
অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী ... ২১২

১৪। আমার দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীভাবত ব্রহ্মচারী—
শ্রীসুধীর কুমার ভট্টাচার্য ... ২২৮

১৫। সিদ্ধপুরুষ শ্রীমৎ ভাবত ব্রহ্মচাবী স্মবণে প্রণাম—
শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ ... ২৩১

১৬। শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারীজীর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রীমৎ
অনির্বাণজী ... ২৩৫

১৭। শ্রীভাবত জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণে
শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য ... ২৩৬

১৮। ভারত ব্রহ্মচারীজী স্মবণে
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত .. ২৩৭

১৯। বিপ্লবী গুরু— শ্রীপূর্ণেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য ... ২৩৯

২০। নেপথ্য সারথী তুমি— শ্রীপরিমল চক্রবর্তী ... ২৪০

মনীষী মণ্ডলীর রচনাঞ্জলী ঃ

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
২১।	শ্রীশ্রীভারতেশ্বরী বন্দনা—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	...	২৪১
২২।	শ্রীশ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারী মহাত্মন্ স্মরণে	শ্রীমোহিনীমোহন শাস্ত্রী ...	২৪২
২৩।	যুগ প্রয়োজনে যুগাচার্য শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারী	শ্রীনিশিভূষণ দত্তরায়	২৪৪
২৪।	করুণা সাগর শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারী	রাণা বসু	২৪৭
২৫।	শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবা স্মরণে—	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ...	২৪৮
২৬।	Mission & Message of the Holy Saint Sri Sri Bharat Brahmachari	—Dr. K. K. Sengupta ...	২৪৯
২৭।	Bharat Brahmachari	—Chinmoy ...	২৫৫
২৮।	Tribute from Sanfrancisco	Dr. Haridas Choudhuri—California ...	২৫৫

শিষ্য, প্রশিষ্য, ও ভক্তগণের আত্মসমীক্ষা ঃ

২৯।	শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীবাবার স্মারকগ্রন্থ ...	২৬০
৩০।	ভক্তিমূলক সঙ্গীত চয়নিকা ...	৩২৮

শ্রীশ্রীমাতা ভারতেশ্বরী মহাদেবী

শ্রীভারত আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের

নদীয়া—তাহেরপুরে পূজিতা মায়ের প্রতিমূর্তি

মহাযোগী শ্রীশ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচাবীবাবা

আবির্ভাব—১১৩৭ তিবোভাব—১২৯৭

শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব শতবার্ষিকী

স্মারক-গ্রন্থ

অষ্টোত্তরশত-শ্রী মাতা ভারতেশ্বরী মহাদেবীর ধ্যান

ব্রহ্মচারীবাবা ভারতচন্দ্রের দ্বিতীয়গুরু শ্রীমদ্ গোপাল গোস্বামিপাদ তাঁহাকে প্রকট গায়ত্রী—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই তারকব্রহ্ম নামে দীক্ষিত করিয়া প্রত্যহ তামার টাটে চন্দনে প্রণব (ওঙ্কার) লিখিয়া ৫টী তুলসীপত্রে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া নিশীথে উদাত্ত ওঙ্কার-মন্ত্র সর্বদেবময় বাসুদেবের উপাসনার আদেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা গুরুদত্ত এই সাধনার ফলে দেহ-সম্বরণের পূর্বে তাঁহার দ্বিতীয়গুরু শ্রীমদ্ গোপাল গোস্বামিপাদ তাঁহাকে যে লক্ষ্মীজনার্দন নামক শালগ্রামশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শালগ্রামের মধ্য হইতে আবির্ভূত, অদীক্ষিতকালে তিনি যাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন, সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাবা শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনকালে ব্রহ্মচারী-বাবা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি কে? উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—আমি তোর "বাবা" শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মচারীবাবার 'বাবা' তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'আমি তো প্রসন্নই হইয়াছি, আগামী শিব-চতুর্দশী রাত্রিতে তোর মাকে আনিব, খুব প্রার্থনা করিতে থাক।' ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার গুরুদত্ত সাধনায় অটল থাকিয়া খুব প্রার্থনা করিতে থাকিলে, একদিন শিব-চতুর্দশীর নিশীথে জগজ্জননী মহেশ্বরী উমার দর্শন ঐ লক্ষ্মীজনার্দন শিলা হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। এই মাতৃমূর্তি দর্শন করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন,—"ইনি জগজ্জননী ভারতেশ্বরী মা—ইনিই কৈলাসের উমা"।

ব্রহ্মচারীবাবা যে রূপে মা ভারতেশ্বরীকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই রূপের বর্ণনা বা মা ভারতেশ্বরীর ধ্যানটি এই—

ওঁ সিংহস্থার্দ্ধকজাসীনাং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বিভ্রাণামম্বরং রক্তং শ্বেতকিরীট শোভিতাম্।
ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাঞ্চ চারুচন্দ্রস্মিতাননাম্।
অভয় কর্ত্তরীহস্তাং নীলাকাশ সমপ্রভাম্॥
নাশনীং বিশ্ববিঘ্নানাং বিশ্বমঙ্গলকারিণীম্।
মহাজ্যোতির্ম্মহাশক্তিং ধ্যায়েদুমাং মহেশ্বরীম্॥

"ওঙ্কারপদবাচ্যা মহাজ্যোতিঃ, মহাশক্তি, মহেশ্বরী উমাকে সিংহস্থিতা, অর্দ্ধপদ্মাসীনা (অর্দ্ধকজাসীনা=অর্দ্ধপদ্মাসীনা। কজ= জলজ, পদ্ম), রত্নালঙ্কারভূষিতা, রক্তাম্বরধারিণী, শ্বেতকিরীটশোভিতা, ত্রিনয়না, দ্বিভুজা, চারুচন্দ্রসদৃশস্মিতহাস্যোজ্জ্বলবদনা, দক্ষিণ হস্তে অভয় ও বাম হস্তে খড়্গধারিণী, নীলাকাশসমপ্রভা, অখিলবিপত্তিহন্ত্রী ও সর্ব্বমঙ্গলকারিণীরূপে ধ্যান করিবে।"

এই ধ্যানে লক্ষণীয় এই যে এখানে উমা দ্বিভুজা, নীলাকাশসম-প্রভা, ও চারুচন্দ্রসদৃশস্মিতহাস্যোজ্জ্বলবদনা—দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী, মহাঘোরা, যোগিনীকোটি পরিবৃতা দুর্গার ন্যায় দশভুজা ও অতসী-পুষ্পবর্ণাভা নহেন। উমা সিংহের উপর অর্দ্ধপদ্মাসীনা, দুর্গার ন্যায় সিংহের উপর এক চরণ ও মহিষাসুরের বক্ষে এক চরণ রাখিয়া দণ্ডায়মানা নহেন। উমা দুর্গার ন্যায় দশভুজে দশপ্রহরণধারিণী নহেন—তিনি বাম হস্তে খড়্গধারিণী ও দক্ষিণ হস্তে অভয়দায়িনী। বাম হস্তে অসি থাকিলেও উমা দুর্গার ন্যায় যোদ্ধ্রীবেশিনী নহেন, শান্তিময়ী।

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম-এ,
কাব্য সাংখ্য-বেদ-বেদান্তাদি নবতীর্থ

সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমদ ভারত ব্রহ্মচারী

আবির্ভাব— আষাঢ় শুক্লা ত্রয়োদশী	তিরোভাব রাধাষ্টমী

৩ শ্রাবণ ১২৮	৮ই ভাদ্র ১৩৭০

শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবার জীবনালেখ্য

আবির্ভাব : ১২৮১, ১২ই শ্রাবণ ; ইং ১৮৭৪, ২৭শে জুলাই।

তিরোভাব : ১৩৩৩, ২৮শে ভাদ্র ; ইং ১৯২৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর।

পূর্ববঙ্গের একটি নিভৃত পল্লী (অধুনা বাংলাদেশ)—নাম তার জগদল। গ্রামটি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। পুণ্যতোয় ব্রহ্মপুত্র নদের অদূরে পূর্বদিকে অবস্থিত বাংলা মায়ের শ্যামাঞ্চলঘেরা ছোট্ট গ্রামখানি যেন একটি শান্তির নীড়। বিরল বসতি হইলেও গ্রামের যে কয়ঘর অধিবাসী—হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলিয়া-মিশিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যেন একটি যৌথ পরিবার। দাদা, মামা, কাকা, চাচা, ভাই ইত্যাদি যথাযোগ্য প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্ভাষণ পরস্পরের মধ্যে ব্যবহৃত হইত, এবং এই ডাকাডাকির মধ্যে ছিল একটা অনাবিল আন্তরিকতা। অভাব অনটন তেমন কিছু ছিলনা কাহারও, ছিলনা বিলাস-ব্যসনেরও বাহুল্য। জায়গা জমি কিছু না কিছু ছিল প্রায় সকলেরই। ক্ষেতের ধান, বাগানের ফল মূল, তরিতরকারী, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ এতে স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার কাহারও বড় একটা ব্যাঘাত ঘটিত না। প্রয়োজন মত একে অন্যের সহযোগিতায় স্বতঃই অগ্রসর হইয়া আসিতে কুণ্ঠিত হইত না। এরূপ আদর্শ পল্লীই ছিল তৎকালে বাঙালীর তীর্থভূমি।

ব্রহ্মপুত্রের পূর্বকূলে অবস্থিত হুসেনপুর ছিল একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। অনেক মহাজনের আড়ৎ, দোকান ও গদী ছিল সেখানে; একটি মুন্সেফী আদালত এবং কয়েকটি জমিদারী কাছারী বাড়ীও ছিল। নানা জায়গার ব্যবসায়ীরা নৌকাযোগে এখানে মালপত্রের আমদানী রপ্তানী করিত। চৈত্রমাসে বারুণী ও অষ্টমীর সময় পূতসলিল ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিবার জন্য বহু পুণ্যার্থী নরনারী ও সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হইত, এবং এই উপলক্ষে মাসাধিককাল বিরাট মেলা বসিত। এইসব

কারণে স্থানটির সবিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। হুসেনপুর-ঘাট হইতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এক প্রশস্ত সড়ক জগদল গ্রাম ঘেঁষিয়া কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরকে সংযুক্ত রাখিয়াছে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চল হইতে যাহাদিগকে মামলা মোকদ্দমা বা অন্যান্য কার্য উপলক্ষে ময়মনসিংহ সদরে যাইতে হইত, তাহাদিগকে এই পথেই যাইয়া হুসেনপুরের ঘাটে ফেরিতে নদী পার হইয়া গফরগাঁও ষ্টেশনে রেলগাড়ী ধরিতে হইত।

পূর্ববঙ্গের বঙ্গজ কায়স্থ জগদল গ্রামের অন্যতম অধিবাসী স্বর্গীয় রামরতন দেব মহাশয়েরও একটি মনোহারী দোকান ছিল এই হুসেনপুর বাজারে। তিনি প্রত্যহ বাড়ী হইতে যাতায়াত করিয়া দোকানের কাজকর্ম পরিদর্শন করিতেন—বিশ্বস্ত কর্মচারী দ্বারাই সমস্ত কাজ পরিচালিত হইত।

রামরতন দেব এবং পত্নী দিনমণি দেবী উভয়েই ছিলেন পরম ধর্মানুরাগী এবং সদাচার সম্পন্ন আদর্শ দম্পতি। সাধু সেবা, দান ধ্যান, পূজা, পার্বণ ইত্যাদিতে তাঁহাদের ছিল ঐকান্তিক নিষ্ঠা। গ্রামবাসী সকলেই এজন্য তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের কোন সন্তানাদি না হওয়ায় দিনমণির মাতা ক্ষুণ্নমনে তাঁহার আরাধ্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। এইভাবে কিছুদিন প্রার্থনা করিতে থাকিলে তিনি স্বপ্নাদেশ পাইলেন—'রামরতন ও ও দিনমণিকে পুত্র কামনায় শারদীয়া মহাষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া শুদ্ধশান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিতে হইবে।' এই আদেশের কথা কন্যাকে জানাইলে দম্পতিযুগল মহাষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত একাগ্রচিত্তে প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তিন বৎসর অতীত হইলে তাঁহারা একটি কন্যা-সন্তান লাভ করিলেন—নাম রাখিলেন নিত্যময়ী। কিন্তু পুত্র-সন্তান লাভ না হওয়ায় তাঁহাদের অন্তর তৃপ্ত হইতেছিল না। দেবী দিনমণি সৎপুত্র কামনা করিয়া অধিকতর কঠোরতার সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং স্বপ্নে চন্দ্রদেবের দর্শন পাইলেন।

চন্দ্র.দব "দোহাই চন্দ্র" এই মন্ত্রে আরাধনা করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন—'আরাধনার চিহ্নস্বরূপ গলায় 'ধবা' ধারণ পূর্বক সাধন করিতে থাক, আমি আসিব।'

চন্দ্রদেবের আদেশ পাইয়া দিনমণি পুনরায় কঠোব সাধনায় ব্রতী হইলেন। এই সময় তিনি প্রায়ই বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইতেন। এইভাবে ক্রমাগত ছয় বৎসর সাধনার পর ১২৮১ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ, সোমবার শুভ শুক্লা ত্রয়োদশী নিশীথে এক উজ্জ্বল গৌরকান্তি সুঠাম গঠন, সৌম্য দর্শন শিশু দেবী দিনমণির কোল আলো করিয়া আবির্ভূত হইলেন। এই শিশুই পিতামাতার বহু আকাঙ্ক্ষিত ধন 'ভারত-রতন'—আর পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের প্রায় দশ সহস্র ভক্তের প্রাণারাম সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবা। কথিত আছে এই শিশু একাদশ মাসে ভূমিষ্ঠ হন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাতৃগর্ভে পদ্মাসনে অবস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মচারীবাবার জন্ম ও সাধনার প্রারম্ভিক অবস্থা, তাঁহাব নিজের ভাষায় -"আমার জন্মের পূর্ব হইতেই বাবা শ্রীকৃষ্ণ আমার গর্ভধারিণীকে স্বপ্নাদেশ বা দৈববাণী দ্বারা উপদেশ দিয়া ও উপাসনা প্রার্থনাদি করাইয়া জানাইয়াছেন যে, তুমি এইভাবে চল আর চন্দ্ররূপের উপাসনা কর—আমি আসিব। আমি জন্ম লইয়াছি পর গর্ভধারিণীর কার্যকলাপ দেখিতে দেখিতে একটু বড় হইলাম। গুরুকৃপা লাভ করিলাম পর বাবা শ্রীকৃষ্ণরূপে আদেশ ও উপদেশ দিয়া আমাকে একটু জ্ঞান দিলেন এবং মাকে আনিয়া, আমাকে মায়ের কোলে দিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং জানাইলেন—"আমরা অসিয়াছি জগতের মঙ্গল বিধান করিতে।"

শুক্লা প্রতিপদের শশিকলার ন্যায় তিলে তিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই শিশু দিন দিন সৌন্দর্য ও চরিত্রমাধুর্যে গ্রামবাসী সকলের বিশেষ আকর্ষণীয় ও আদরের হইয়া পড়িলেন। দম্পতি যুগলের বহু সাধনার ধন কোলে পাইয়া আজ যেন আনন্দ আর ধরে না। দেবী দিনমণির

কোল আলোকরা 'ভারত' যেন মা-যশোদার কোলে নন্দদুলাল। গ্রামবাসী সকলে ধন্য ধন্য করে।

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আর দশটি বালকের মত তো এ বালক নয়—এর যে চলা, বলা, খেলা সব কিছুই আলাদা। সমবয়সীদের নিয়া খেলিতে যাইবে—পূজা পূজা খেলা—মাটি দিয়া শালগ্রাম তৈয়ার করিয়া তারই পূজা। কি যেন এক অদ্ভুত কাণ্ড! ড্যাং-গুলি, কপাটি যা ছোটরা খেলিয়া থাকে সাধারণতঃ তাহাতে অরুচি। মাঝে মাঝে কথার ভিতর দিয়াও ফুটিয়া উঠে এমন এক একটা সুদূর প্রসারী অজানা ভাবের ইঙ্গিত যাহার কোন অর্থবোধই হয়ত হয়না কাহারও। পিতামাতা চিন্তিত হন পুত্রের এই হাবভাবে—হয়ত বা ইষ্ট চরণে অজান্তে কি আকাঙ্ক্ষা নিবেদিত হয় তাঁহাদের। প্রতিবেশীরা বলাবলি করে—এ ছেলে তো ঘরে থাকবার নয়।

ঘরের কোণে আসন পাতিয়া শিশু-ভারত ফুলচন্দনে মনের আনন্দে মাটির গড়া শালগ্রামের পূজা করেন শিশু-মনের আধ আধ ভাষা আর ভাব মিশাইয়া। মা উৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া দেখেন বালকের খেলার পূজা। মায়ের কাছে বায়না ধরে পূজারী—'আমার ঠাকুরকে ভোগ সাজাইয়া দাও মা!' বালকের আব্দার রক্ষা করেন মা—অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যাহাই রান্না হয়, পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দেন বালকের ঠাকুর মাটির শালগ্রামের সামনে। বালক হৃষ্টমনে তার প্রাণের ঠাকুরকে খাওয়াইয়া অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে।

এইভাবে পূজার খেলা খেলিতে খেলিতে শিশুর বয়স ক্রমে বাড়িয়া ছয় বৎসরে পড়িল। পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পিতা ব্যস্ত হন। গ্রামেই একটি পাঠশালা ছিল, তাহাতে ছয় বৎসরের বালক ভারতকে ভর্তি করিয়া দিয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। মা দিনমণি নাওয়াইয়া খাওয়াইয়া, কাপড়-চাদরে সাজাইয়া এবং পুঁথি পাততাড়ি গুছাইয়া হাতে তুলিয়া দিয়া ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিতেন।

ছুটির পর বাড়ীতে আসিলে মা আবার আসিয়া হাত হইতে পুঁথিপত্র রাখিতেন, কাপড়চোপড় বদলাইয়া দিতেন এবং বিশ্রামের পর খাইতে দিতেন। দু'বেলাই মাকে ইহা করিতে হইত। মা না আসা পর্যন্ত বালক মায়ের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত। ছেলের এরকম হাবভাব দেখিয়া মা কোন কোন সময় ভাবিতেন—তা'হলে ছেলেটি কি হাবা হবে ?

এইভাবে বালক ভারতের বাল্যশিক্ষা চলিতে লাগিল। পাঠশালার পড়ায় বালকের মন বিশেষ আকৃষ্ট হইত না, কিন্তু যতটুকুই পড়াশোনা করিতেন তাহাতে প্রচুর ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। গুরুমহাশয় যাহা পড়াইতেন, অনায়াসেই তাহা তাঁহার অধিগত হইত। কিন্তু পাঠশালার এই মামুলী ধরণের পাঠ নিয়া যেন তাহার কিছুতেই তৃপ্তি হইত না—এই শিশু-মনের কি এক উন্মনা ভাব যেন সর্বদাই কোন্ এক অজানার সন্ধানে ছুটিয়া চলিতে চায়—যে দেশের সন্ধান এই পাঠশালার গুরুমহাশয দিতে পারেন না। কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করিয়াও আরও কিছু পাওয়ার সতৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সর্বদাই জাগিয়া থাকিত।

গুরুমহাশয় তাঁহার গতানুগতিক ধারায় পড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। ছেলেদেরে যোগ, বিয়োগ ও গুণ অঙ্ক পর্যন্ত শিক্ষা দিয়াছেন, এখন ভাগ শিখাইতে হইবে। তিনি তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'তোমাদিগকে যোগ, বিয়োগ ও গুণন শিক্ষা দিয়াছি, এখন ভাগ শিক্ষা দিব।' এই বলিয়া ভাগ অঙ্কের প্রণালী বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। বালক ভারত তন্ময় হইয়া গুরুমহাশয়ের কথা শুনিয়া যাইতেছিলেন। গুরুমহাশয়ের কথা শেষ হইলে তন্ময়াবিষ্টের মত হঠাৎ তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"যোগ বিয়োগ গুণ শিখিয়াছি, এখন আবার ভাগও শিখিতে হইবে?" বালকের এই কথার তাৎপর্য গুরুমহাশয় কিংবা সহপাঠিগণ কাহারও বোধগম্য হইল না। সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলে বালক

ভারত যেন একটু লজ্জিত হইলেন। যে বিদ্যা লাভ করিয়া জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয় সেই পরাবিদ্যা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে স্বতঃই স্ফুরিত হইয়া উঠিল—অবলীলাক্রমে লৌকিক বিদ্যার পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাবিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিণত হইলেন। পাঠশালার পাঠ এখানেই সমাপ্ত হইল।

শৈশবকাল হইতেই তিনি গোপনে কঠোর ভাবে সাধন-ভজন করিতে আরম্ভ করেন। তখনও গুরু-করণ না হওয়ায় বীজমন্ত্র বা শ্রীভগবানের নাম পান নাই। আজ্ঞাচক্রে ধ্যান, আসন এবং কখনও একপদে কখনও বা ঊর্দ্ধপদে শ্বাস রোধ করিয়া 'বাবা' নাম জপ করিতেন এবং ধূপ দীপ ও ফুল চন্দনাদি দ্বারা অমন্ত্রক পূজা করিতেন। লোক-চক্ষুর অন্তরালে এইরূপে সাধনায় অধিকাংশ রাত্রিই তাঁহার অতিবাহিত হইত।

১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই মাঘ তাঁহার পিতৃদেব সজ্ঞানে হরেকৃষ্ণ শিবদুর্গা ইত্যাদি নাম স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স সাড়ে চৌদ্দ বৎসর মাত্র। পিতৃ বিয়োগের পর মা, বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও দুইটি ভাগিনেয়ীর প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর পড়িল। নিজের সাধন ভজনের কঠোরতা বিন্দুমাত্র শিথিল না করিয়া তিনি সামান্য আয়ে সামান্য ব্যয়ে ইহাদের ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অম্বুবাচী ইত্যাদিতে নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া পূজাদি করিতেন এবং আহার কমাইবার চেষ্টায় বায়ুপান করিয়া উদর পূরণ করিতেন।

এই সময়ে তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ অবস্থা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রাতঃকালে কিছু আহারান্তে একটি দা হাতে নিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইতেন এবং আশেপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে কেহ মারা গিয়াছে সংবাদ পাইলে তাহার যথোচিতভাবে সৎকার করিয়া কোন দিন বৈকালে, কোন দিন বা রাত্রিতে বাড়ীতে ফিরিতেন। একবার সংবাদ পাইলেন, তাঁহার গ্রামের এক বৃদ্ধা তিন দিন যাবৎ

অচৈতন্যাবস্থায় মৃত্যুশয্যায়; আত্মীয় স্বজন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধাটি মলমূত্রপূর্ণ বিছানায় শায়িতা, মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া কেহই বিছানা পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেন না। এই অবস্থা দেখিয়া ব্রহ্মচারীবাবা মুমূর্ষু বৃদ্ধার শরীর ধোয়াইয়া মোছাইয়া বিছানা বদলাইয়া দিতে লাগিলেন, ইহাতে সকলে বলিতে লাগিলেন—ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগী মরিয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন—"পরিষ্কার না করিলে মরিবে না?" বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তাহার সৎকার করিয়া অপরাহ্নে তিনি বাড়ীতে ফিরিলেন। এই ঘটনার পর হইতে শবদাহের আগ্রহ ক্রমে তাঁহার কমিয়া গেল। সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করাই যেন ছিল তাঁহার এই শবদাহ-যজ্ঞের নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

পিতৃ বিয়োগের পর এক বৎসরের মধ্যেই তিনি উস্থিগ্রাম নিবাসী শুদ্ধশান্ত স্বভাব শ্রীমৎ শিবকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের নিকট 'রাম' মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার তিনবার গুরু করণ হইয়াছিল জানা যায়। গুরু-করণ প্রসঙ্গে তিনি নাকি "শিব, গোপাল, অভয়" এইরূপ পর পর তিনটি নাম উল্লেখ করিতেন। ইহাতে বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার মন্ত্র-শিষ্য শ্রীমৎ অভয়াচরণ ব্রহ্মচারীই সর্বশেষ গুরু ইহাই প্রতীত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় হইতে 'রাম' মন্ত্র, গোপাল গোস্বামী হইতে তারকব্রহ্ম নাম ও প্রণব এবং অভয়াচরণ হইতে ব্রহ্মগায়ত্রী ও সোঽহং মন্ত্র লাভ করেন।

অভয়াচরণ সরল প্রকৃতি ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। সংসারের জঞ্জাল তাঁহার আদৌ ভাল লাগিল না। একদা স্ত্রী পুত্রাদি রাখিয়া সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করিলেন। অভীষ্ট বস্তুর অনুসন্ধানে সতের বৎসর পাহাড়-পর্বত পরিভ্রমণ করিলেন, বহু সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ করিলেন। মনের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইল না। সতের বৎসর পর পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

শিবচতুর্দশী উপলক্ষে অভয়াচরণ প্রতিবৎসর চন্দ্রনাথতীর্থে

যাইতেন। এবার তাঁহার জনৈক বন্ধুর পরামর্শে "জীবন্তশিব" বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী দর্শনে রওনা হইলেন। বারদীর আশ্রমে পৌঁছিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল, জীবন্তশিব দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বাবা লোকনাথকে প্রণাম করিয়া নিকটেই ভূমিতে উপবেশন করিলে, লোকনাথ তাঁহার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে অভয়াচরণের সঙ্গে কিছু আলাপ করিলেন।

পরদিন পূর্ববৎ অভয়াচরণ বাবার সম্মুখে মাটির উপর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বসিলেন। বাবা লোকনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই যে সতের বৎসর পাহাড়-পর্বত পরিভ্রমণ করেছিস্, যার জন্য ঘুরেছিস্, তা' পেয়েছিস্?"

অভয়াচরণ উত্তর করিলেন, "না, পাই নাই।"

তখন লোকনাথ স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী বেষ্টনে অভয়াচরণের ডান হাতের মণিবন্ধের উপরিভাগ ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "যা'র জন্য ঘুরেছিস, তা তোর হাতে বেঁধে দিলাম, আর ঘুরতে হবে না। ঘুরলে কি হবে রে—কর্মই ব্রহ্ম।" দীক্ষাদান ও দীক্ষাগ্রহণ মণিবন্ধ-বন্ধনে সমাধা হইয়া গেল। নূতন জীবন লাভ করিয়া অভয়াচরণ ব্রহ্মচারী জগদল গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্বীয় জন্মভূমি হরিশচন্দ্রপট্টিতে ফিরিয়া আসিয়া স্বগৃহে থাকিয়াই সাধন-ভজনে নিমগ্ন হন। ('বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী' নামক গ্রন্থ হইতে)।

পরবর্তীকালে একসময় শ্রীমদ্ভারত ব্রহ্মচারীবাবার কয়েকজন সন্ন্যাসী-শিষ্য পর্যটনে যাওয়ার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমরা দূরদেশে গেলে সাধুসন্ত মহলে কি বলিয়া আমাদের ক্ষেত্রের পরিচয় দিব?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা বারদীর শ্রীশ্রীমৎলোকনাথব্রহ্মচারীবাবার ঘর বলিলে সকলেই চিনিবে। তবে যিনি ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন ও ভগবদাদেশে পরিচালিত তিনি আমাকেও চিনিতে পারিবেন।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় অল্পকালের মধ্যেই দেহরক্ষা করিলে তাঁহার

স্বগ্রামবাসী শ্রীমৎগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের নিকট হইতে তারকব্রহ্ম মন্ত্র ও ওঁকার-সাধন লাভ করেন। গোস্বামী মহোদয় একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার উপদেশ মত ব্রহ্মচারীবাবা তামার টাটে চন্দন দ্বারা প্রণব লিখিয়া পাঁচটি তুলসীপত্র দ্বারা অর্চনা করিতেন এবং মধ্যরাত্রিতে প্রণব-ধ্বনি করিয়া শ্রীভগবান্‌কে আহ্বান করিতেন। শ্রীমৎগোস্বামী মহোদয়ের উপদেশ মত আড়াই বৎসর সাধনার পর এক গভীর রাত্রিতে যখন তুলসী তলায় বসিয়া প্রণব-ধ্বনি দ্বারা শ্রীভগবানকে আহ্বান করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে,—সমস্ত আকাশ আলোকিত করিযা এক দিব্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আহ্বান বন্ধ রাখিয়া তিনি এই জ্যোতিটি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—আকাশব্যাপী ঐ বিরাট জ্যোতি ক্রমশঃ ছোট হইতে হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে, এবং ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া তুলসী তলায় প্রণবাঙ্কিত ঐ তামার টাটে মিলাইয়া গেল।

শ্রীমৎগোপাল গোস্বামী মহোদয়ও অল্পকাল মধ্যে দেহরক্ষা করেন। জ্যোতি দর্শনের পর ব্রহ্মচারীবাবা স্বপ্নাদেশ ও ব্যাক্যাদেশে সাধনার ইঙ্গিত পাইতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি যে কথা বল, তুমি কে?" উত্তর হইল—"আমি তোর বাবা।" এই "বাবা"-ই পরে শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহাকে দর্শন দেন।

ব্রহ্মচারীবাবার সাধনার কঠোরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে উপাসনা ও ধ্যানাদিতে তিনি একাদিক্রমে পাঁচ ছয় দিন পর্যন্ত সমাধিস্থ থাকিতেন। এই কয়দিন সেবা পূজার কাজ এবং আহার গ্রহণাদিও বন্ধ থাকিত। প্রতি মাসে কয়েক বারই এই অবস্থা ঘটিত।

পরবর্তী সময়ে সংসারত্যাগী শিষ্যগণকে ভগবৎ উপাসনায় আহার সংযমের আবশ্যকতার প্রতি তিনি বিশেষ জোর দিয়া নিজের প্রসঙ্গে বলিতেন—"আমার পূর্বকার অবস্থা স্মরণ করিলে দেখিতে পারিবা

যে, সাধনাবস্থায় প্রায় ১২।১৩ বৎসর পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ৮।১০ দিন খাওয়া ঘটিত কিনা সন্দেহ। এমন কি আমি ১৪।১৫ বৎসর বয়সে দীক্ষিত হই ; ইহার পূর্বেও আহার সংযম ও নানা উপবাসাদি করিয়াছি।……একবার নিয়ম করিলাম দুই বেলাই খাওয়া—কিন্তু ৮।১০ গ্রাস মাত্র।"

শ্রীমৎগোপাল গোস্বামী মহোদয় দেহরক্ষার পূর্বে তাঁহার নিজের শালগ্রাম বিগ্রহ ব্রহ্মচারীবাবাকে দান করিয়া যান। ব্রহ্মচারীবাবা বসত বাড়ীর নিকটেই বাবার আদেশে আর একটি নূতন বাড়ী তৈয়ার করিয়া তাহাতে ঐ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন শালগ্রাম বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং এইখানেই শ্রীশ্রীজগন্মাতার আবির্ভাব হয়। নূতন বাড়ীতে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া আদেশক্রমে নিজ হাতে তাঁহার সেবা পূজা করিতে লাগিলেন। এই শালগ্রাম বিগ্রহ হইতে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া আবার উহাতেই অন্তর্দ্ধান হইতেন। কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীবাবার সেবা পূজার অপরাধ প্রদর্শন করিয়া বলিতেন —"আমি চলিয়া যাইব।" শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ব্রহ্মচারী-বাবাও সেবা পূজা বন্ধ রাখিয়া পুনরায় আবির্ভাবের জন্য প্রাণপণে প্রার্থনা করিতেন। পুনরায় আবির্ভাবের আদেশ পাইলে তাঁহারই আদেশে সেবা পূজার কাজ আবার আরম্ভ হইত।

একদা ব্রহ্মচারীবাবা রাত্রিতে শালগ্রাম বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় পিছন দিক হইতে একটি তীব্র আলো আসিতেছে অনুভব করিলেন। আলোটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, গগনস্পর্শী এক বিরাট নাগ সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার না হইয়া এক দিব্য আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। নাগটি ক্রমে ছোট আকার ধারণ করিয়া নিকটবর্তী হইল এবং সম্মুখস্থ লক্ষ্মীজনার্দন শালগ্রামের গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র ফণা বিস্তার করিয়া রহিল। ব্রহ্মচারীবাবা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?"

নাগ বলিল 'আমি অনন্তদেব'। ইহার পর ক্রমে ক্রমে নানা দেবদেবী আসিতে লাগিলেন এবং নিজ নিজ পরিচয় দিয়া লক্ষ্মীজনার্দন শালগ্রাম বিগ্রহের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সমস্ত ঘটনার পর হইতে লক্ষ্মীজনার্দনরূপী শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভাবে আদেশ দান করিয়া তাঁহাকে সাধন পথে অগ্রসর করাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারীবাবা জানিতেন, 'ঈশ্বর লাভই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য', তাই দারপরিগ্রহপূর্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগ্নী সর্বদাই উত্তরসাধিকারমত তাঁহার সাহায্য করিতেন, সুতরাং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ন্যায় কঠোর উপাসনায় অভ্যস্তা হইয়া উঠিলেন।

হুসেনপুর বাজারে তাঁহার যে পৈতৃক দোকান ছিল তাহা তিনি শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দোকান পরিচালনার ভার তাঁহার বাল্যবন্ধু মহিম পালের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেন—"আমার দোকান বন্ধ থাকিবে, তুই মন দিয়া উপাসনা কর" তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ হইয়া গেল, সেদিকে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না।

তখন সেবা পূজার কাজে এত তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে, অর্থোপার্জনের আর সময় বা চিন্তার অবসর রহিল না। জমিজমা যাহা ছিল, আদেশক্রমে আস্তে আস্তে পূজার কার্যের জন্য সমস্তই বিক্রয় করা হইল। ক্রমে থালা, বাটি, ঘটি, গ্লাস এবং ঘরের অন্যান্য তৈজসপাত্রাদি সমস্তই বিক্রয় হইল, এমন কি চূণের হাঁড়িটাও দুই পয়সায় বিক্রয় হইয়াছিল। এই সমস্ত জিনিষের মূল্য পর্যন্ত আদেশক্রমে ধার্য হইত।

নূতন বাড়ীর ঘর দরজা মেরামত করার আদেশ না থাকায় ব্রহ্মচারী-বাবা ঘর দরজার দিকে মনোযোগ দিলেন না। ক্রমে ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময় তাঁহার গর্ভধারিণী আর সহ্য করিতে না পারিয়া সংসারে বীত-স্পৃহ হইয়া, কঠোর-পা পুত্রকে

ফেলিয়া দৌহিত্রীর বাড়ীতে চিরতরে চলিয়া গেলেন। তখন ব্রহ্মচারীবাবা আদেশ পাইয়াছিলেন, "ও (গর্ভধারিণী) তোর ছটাকে মা, আমিই আসল মা।" তখনও জগন্মাতার আবির্ভাব হয় নাই। সাধনার শেষ অবস্থায় জগন্মাতার আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে আনিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"এই তোর মা, এখন আমি যাই।" যথাস্থানে তাহা লিখিত হইবে।

আদেশক্রমে সমস্ত তৈজসপাত্র বিক্রয় করা হইল। রান্নার এবং পূজার বাসনপত্রও সমস্তই বিক্রয় করা হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই সমস্ত বিক্রয়ের মূল্য পর্যন্ত আদেশ ক্রমে ধার্য হইত এবং বিক্রয়-লব্ধ যৎসামান্য অর্থদ্বারাই দৈনন্দিন সেবা পূজাব কার্য সম্পন্ন করিতে হইত। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের অমাবস্যা রাত্রি হইতে অন্নভোগ না দিয়া যথালব্ধ ফলমূলাদি দ্বারা সেবার কার্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বেই আদেশক্রমে বাড়ীতে অনেক ফলমূলের গাছ লাগান হইয়াছিল। দীপাধারটিও আদেশক্রমে বিক্রয় করা হইয়াছিল। আলো কেমন করিয়া জ্বলিবে জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার গোলোকের আলোতেই কাজ চলিবে।" ব্রহ্মচারী বাবা বলিয়াছেন, বাস্তবিকই কোন আলো ব্যতীতই রাত্রিতে সমস্ত দেখা যাইত, সমস্ত কাজ চলিত। এইরূপে ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আবার অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগ প্রদানের আদেশ হইল। ফলমূল ভোগ দেওয়ার সময় ব্রহ্মচারী-বাবার ভাগিনেয়ী পুত্র সাড়ে চারি বৎসর বয়স্ক শিশু সুধীর কাহারো কোন কথা না শুনিয়া তাহাদের বাড়ী হইতে ব্রহ্মচারীবাবার কাঁধে চড়িয়া জগদল উপস্থিত হইল, এবং ফলমূল প্রসাদ পাইয়া ছয় মাস কাটাইয়া দিল, একদিনও অন্ন প্রসাদের জন্য আবদার করে নাই। পাড়ার কোন কোন লোক ভাবিত, হয়ত তাহারা রাত্রিতে অন্নপাক করিয়া খায়। কিন্তু একদিন এক ঘটনা হইল; ব্রহ্মচারীবাবার পাশের বাড়ীর স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র নাগ মহাশয়ের স্ত্রী প্রভৃতি সকলে

ভাবিলেন যে, এই শিশুটি না খাইয়া মরিয়া যাইবে। তাই একদিন আদর করিয়া সুধীরকে কোলে তুলিয়া উক্ত নাগ মহাশয়ের স্ত্রী তাহাদের বাড়ীতে ভাত খাওয়াইবার জন্য নিয়া আসিলেন। কিন্তু যখন সে বুঝিল তাহাকে ভাত খাওয়াইবার জন্য আনা হইয়াছে, তখন সে চীৎকার করিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিল—"দোহাই ঠাকুর! দোহাই ঠাকুর। আমায় ভাত খাওয়াইয়া ফেলিল!" (সুধীর ও অধীর ছোটকালে ব্রহ্মচারীবাবাকে "দোহাই ঠাকুর" ডাকিত। ব্রহ্মচারীবাবা সুধীরের চীৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া উমেশ নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন এবং সুধীরকে নিয়া আসিলেন। বালকের এইপ্রকার নিষ্ঠা দেখিয়া নাগ-বাড়ীর এবং গ্রামের সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল এবং তখন গ্রামবাসী সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, তাঁহারা সত্যই ভগবৎ আদেশে অন্নভোগ দেওয়া ছাড়িয়াছেন। যথালব্ধ ফলমূল ও দুধ দ্বারাই ঠাকুরের ভোগরাগ হইত এবং সেই যৎসামান্য প্রসাদ পাইয়াই তাঁহারা ভগবদানন্দে দিন কাটাইতেন।

ছয়মাস ফলমূলাদি ভোগের পর অন্নভোগের আদেশ হইলে, এই সময় হইতে ভিক্ষাদি দ্বারা সেবার কাজ করিতে হইত। তাঁহার সাধন-জীবনে জগদল গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র নাগ, স্বর্গীয় গঙ্গাদাস সরকার এবং স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায় দেবশর্ম্মা ও গ্রামের অন্যান্য সকলে এবং পার্শ্ববর্তী গাঙ্গাটিয়া গ্রামের উদার হৃদয় জমিদার মহোদয়গণ তাঁহাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে প্রার্থনা করিতেন—"বাবা, কাল সেবার কি হইবে?" কোন দিন আদেশ হইত—"কাল সেবার আসিবে।" সেদিন ভোগের জন্য কেহ কিছু দিয়া যাইতেন। কোনদিন আদেশ হইত, "কাল তুই মিলাইবে।" সেদিন ব্রহ্মচারীবাবা ভিক্ষা করিতেন। এই অবস্থায় কোন্ দিন কি পরিমাণ অন্ন ও কি কি ব্যঞ্জনে ভোগ লাগিবে তাহারও নির্দেশ পাইতেন এবং সেই অনুসারে দ্রব্যাদি ভিক্ষায় মিলিত। কোন দিন পাঁচ সের চাল, পাঁচ প্রকার ব্যঞ্জন, কোনদিন বা দশ সের

চাল, চৌদ্দ প্রকার ব্যঞ্জন, কোনদিন বা ধান ভিক্ষা করিয়া পাঁচ সের চিড়া সদ্য তৈয়ারী করিয়া ভোগ দেওয়ার আদেশ হইত, এবং ব্রহ্মচারীবাবা সেই অনুসারে কাজ করিতেন।

এই সময়ে কোন তৈজসপাত্র না থাকাতে, মাটিতে গর্ত করিয়া কলারপাতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া ভোগ নিবেদন করিতেন। ভোগ নিবেদন করিয়া ভোগের ঘর আদেশক্রমে বুকে হামাগুড়ি দিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হইত। তদবস্থায় গ্রামবাসী কেহ কেহ দেখিয়াছেন, যেন ব্রহ্মচারীবাবার শরীরে হাড় নাই—একটি মাংসপিণ্ড গড়াগড়ি দিতেছেন। কোন কোন দিন বা শিশু সুধীর তাঁহার পিঠে চড়িয়া বসিত, তাহাকে নামাইয়া দেওয়ার আদেশ ছিল না। সুধীরকে পিঠে করিয়াই ভোগের ঘর প্রদক্ষিণ করিতেন। "ভোগ নিবেদন কালে গুরুস্তুতি (শ্রীশ্রীগুরু-গীতা) পাঠ না করিলে ভোগ গ্রহণ করিব না, গুরুস্তুতি আমার অমিয় পাঠ" 'বাবা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। ভোগ-গ্রহণের আদেশ পাইলে, তাঁহারা প্রসাদ পাইতেন ও গ্রামবাসিগণকে দিতেন। গ্রামবাসীরা অনেকে প্রসাদের জন্য আগ্রহের সহিত গভীর রাত্রি পর্যন্ত আশে পাশে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত। ভোগ গ্রহণের আদেশ পাইলেও প্রসাদ গ্রহণ ও বিতরণের আদেশ না পাইলে প্রসাদ গ্রহণ ও বিতরণ করিতেন না। এই অবস্থায় তিনি নিজের অপরাধ মনে করিয়া প্রার্থনা করিলে, কোন কোন সময় দুই একদিন পরেও প্রসাদ গ্রহণ করিবার কিম্বা জলে ফেলিয়া দিবার আদেশ হইত। অনেক সময় প্রসাদ বিতরণের আদেশ হইতনা, অথচ প্রচুর প্রসাদ থাকিত, কয়েকদিন থাকার ফলে প্রসাদে ফুল হইত এবং তাহাই তিনি পাইতেন,—ফেলিয়া দিবার আদেশ হইতনা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশক্রমে একদা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পদ্মফুল অর্পণ করিয়া, গ্রহণ করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইলেন—"কত রাজা মহারাজা আমাকে এই রকম ফুল দেয়।"

তখন তাঁহার কৃপার অভাব বুঝিয়া সারারাত্রি ও পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আবদার ও আর্তনাদ করিয়াও কোন সাড়া না পাওয়ায় জীবন নিষ্প্রয়োজন মনে করতঃ উন্মাদের ন্যায় নির্মমভাবে কণ্ঠদেশে দা'র আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, কে যেন হঠাৎ দা কাড়িয়া নিয়া বলিলেন—"এত অনুরাগ দিনে কেন করিলে?"

"বাবা" শ্রীকৃষ্ণ একদিন বলিলেন—"আমি ত প্রসন্নই হইয়াছি, তোর মা না আসিলে হইবে না। আগামী চতুর্দশীর রাত্রিতে তোর মাকে আনিব, তুই খুব প্রার্থনা করিতে থাক্।"

মাকে ডাকিতে ডাকিতে এই সময়ে একদিন মা দশভুজারূপে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—"পূজার মন্ত্র বলিতেছি শুন।" তখন তিনি অঙ্গুলি দ্বারা মাটিতে মন্ত্রগুলি লিখিয়া প্রভাতে কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া তদনুসারে পূজাদি করিতে লাগিলেন। মায়ের আদেশবাক্য বলিয়া শাস্ত্রের সহিত এইসব মন্ত্র মিলাইবার প্রয়োজন হইল না।

তদবধি বাবাব আদেশক্রমে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ, শ্রীশ্রীমা মনসাদেবী, শ্রীশ্রীমাসরস্বতী, শ্রীশ্রীকার্ত্তিক, শ্রীশ্রীমাকুলেশ্বরী দেবী, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীবনদুর্গা, শ্রীশ্রীশনি, শ্রীশ্রীমা মঙ্গলচণ্ডী, শ্রীশ্রীমাষষ্ঠী, শ্রীশ্রীকর্মপুরুষ, (করমাদি), শ্রীশ্রীমাশুভচণ্ডী, শ্রীশ্রীমারক্ষাকালী ও শ্রীশ্রীমাদুর্গা এবং এইরূপ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ও মাতৃসমাজে প্রচলিত অনেক দেবদেবীর আবির্ভাবের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে উপাসনাদি করিতে হইয়াছে।

তাঁহার এইরূপ কঠোর সাধনার সময় আশে পাশে নানা প্রকার শক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। প্রতিকূল শক্তিগুলি ব্রহ্মচারী-বাবাকে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অন্য কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সচ্চিদানন্দ লাভ—ইহা হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই; কোন প্রলোভনই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। এই শক্তি সমূহ অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় প্রকারের ছিল—এমন কি

সাক্ষাৎ মায়ের রূপ ধরিয়াও এই শক্তি সমূহ তাঁহার কাছে আসিত। ব্রহ্মচারীবাবা নিজেই আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, মায়ের অশেষ কৃপায় তিনি অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তিগুলিকে এবং সাক্ষাৎ জগন্মাতাকে বুঝিতে পারিতেন। প্রতিকূল শক্তির কোন প্রলোভনে তিনি আকৃষ্ট হইতেন না। তখন মায়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের জন্য শুধু মা মা বলিয়া ডাকিতেন। মা আবির্ভূতা হইয়া এই প্রতিকূল শক্তিগুলিকে দূরে তাড়াইয়া দিতেন।

এইভাবে কঠোর তপস্যা ও নানারূপ ভীষণ পরীক্ষার পর স্বয়ং আদ্যাশক্তি কৃপাপূর্ব্বক ১৩১৪ বঙ্গাব্দের শুভ শিবচতুর্দশী নিশীথে—সিংহবাহিনী, আকাশবরণী, ত্রিনয়নী, ত্রিভুজা, বাম হস্তে কাটারী, দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা, দক্ষিণ পাদ নিম্নদিকে লম্বিত, অর্দ্ধপদ্মাসীনা, হস্ত ও পদতল রক্তবর্ণ এবং মুখে মৃদু মৃদু হাসি, মাথায় শুভ্রকিরীট, এই মূর্তিতে দর্শন দিলেন।

এই দর্শনের বর্ণনায় ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন, প্রথমতঃ তিনি দেখিলেন—শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দন শালগ্রাম বিগ্রহের আসনটিতে একটি সিংহশাবক, তাহার উপর মাকে উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী আসীন দেখিতে পাইলেন।

মা কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিলেও অপ্রসন্নভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রহ্মচারীবাবা নিরাশ হইয়া একবার একদিকে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, একদিন শ্রীশ্রীমহাদেব আবির্ভূত হইয়া তিনবার বলিলেন—'তুমি এখানে বসে থাক, তোমার কালী-সিদ্ধি হবে।" ইহাতে তিনি আশ্বস্ত হইয়া নবোৎসাহে মা'র প্রসন্নতা লাভের জন্য যত্নবান হন, এবং সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ করতঃ রক্তসিক্ত পুষ্প মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। এই সময়ে একদিন বাবা মহাদেব বলিলেন—"ভারতের ইহা (রক্তদান) ভুল।" মাও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—"তোকে চতুর্বর্গের ফল দিলাম।"

ইহার পরেও তাঁহার শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আরও অনেক দেবদেবী ও মহাপুরুষের দর্শন ও আদেশ লাভ হইতে লাগিল।

ব্রহ্মচারীবাবা একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, আমি সচ্চিদানন্দ লাভ করিতে চাই, দেবতাদি দর্শনের প্রয়োজন কি?" মা বলিলেন—"আমি যাঁহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হই, তিনিই সচ্চিদানন্দ।"

তারপর মায়ের আদেশে ১৩১৫ সনের পৌষ মাসের অমাবস্যা রাত্রিতে বোয়াল মাছের ভোগ, এবং মাঘ মাসের অমাবস্যা রাত্রিতে ছাগ বলি দিয়া পূজা ও ভোগ প্রদান করিলেন। বাবা জীব হত্যার প্রবল বিরোধী ছিলেন। মায়ের ইচ্ছাতেই বলি সম্পন্ন হইল এবং উক্তরূপ আমিষ ভোগ প্রদত্ত হইল।

১৩১৬ সালে তেসরা আষাঢ় তিনি মা'র আদেশক্রমে কিশোরগঞ্জে যাইয়া তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবগত করাইলেন যে, মা আদেশ করিয়াছেন, "আগামী মঙ্গলবার পূর্ণিমায় অধীরকে বলি লইব।" অধীর সুধীরের ছোট ভাই। উক্ত সংবাদে তাঁহাকে কিশোরগঞ্জে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে মাতাপিতাসহ অধীরকে জগদল হইতে আনাইয়া তৎপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ব্রহ্মচারীবাবা সাতদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। "বাড়ীতে মা ও বাবা উপবাসী আছেন, তাঁহাদিগকে না খাওয়াইয়া আমি আহার করিতে পারি না," এই বলিয়া সেই সাতদিন জলবিন্দুও গ্রহণ করিলেন না। কারাবাসের সময় এস, ডি, ও, কোর্ট-ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ ব্রহ্মচারীবাবাকে দেখিতে যাইতেন। কোর্টইন্সপেক্টর সদাচারী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এই 'বলি'র সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীবাবার সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—'মা অধীরকে বলি লইবেন অর্থে মা তাহাকে গ্রহণ করিবেন,' ইহাই বলির গূঢ়ার্থ; এবং তখন তিনি অবাঙালী এস, ডি, ও-কে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে এস, ডি, ও, ঘটনাটি উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং ব্রহ্মচারীবাবা

এতদিন অনাহারে আছেন জানিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও মুক্ত করিয়া দিলেন।

কারামুক্তির কয়েকদিন পর মা'র আদেশে অধীরের পিতা মাতা অধীরকে কোলে লইয়া ছয়মাসের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইলেন। এই সময়ে ৪ঠা কার্তিক মঙ্গলবার অমাবস্যায় দশমাস বয়সে মা'র প্রসাদ গ্রহণে অধীরের অন্নপ্রাশনের কাজ সম্পন্ন হয়। ইহাতে মা বলিলেন —"আমার প্রসাদ গ্রহণেই বলি হইল।"

ব্রহ্মচারী বাবা 'মা'-'বাবা'র নিকট এরূপভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন যে, তাঁহাদের আদেশ ব্যতীত কোন কার্যই করিতেন না। আদেশানুক্রমে ভিক্ষা করিতেন, আদেশ হইলে ভোগের জন্য অন্নাদি পাক করিতেন, নতুবা পাকই হইত না। ভোগাদি নিবেদন করিয়া গ্রহণের আদেশের অপেক্ষায় থাকিতেন। গৃহীত হওয়ার আদেশ না হইলে অন্নাদি ফেলিয়া দিতেন। আর গৃহীত হওয়ার আদেশ পাইয়াও প্রসাদ গ্রহণের আদেশ পাইলে তবে প্রসাদ পাইতেন।

ক্রমে নূতন বাড়ীর ঘর দরজা সব নষ্ট হইয়া গেলে একটা ধারার চালা বাঁধিয়া তথায় 'আসন' প্রতিষ্ঠা করিলেন, আর সেই সঙ্গে আর একটি ধারা দিয়া চালা বাঁধিয়া ভোগ পাকের ঘর করিলেন। শীত বা ঝড় বৃষ্টিতেও কোন বৃক্ষতলে বা কাহারও গৃহতলে আশ্রয় নেওয়ার আদেশ ছিল না। জ্যেষ্ঠা ভগিনীসহ এবং পরে ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর সন্তান-সন্ততিসহ বার তের বৎসরের অধিককাল সময়ই খোলা জায়গায়, অর্থাৎ মুক্ত আকাশতলে অতিবাহিত করিয়াছেন। কঠোরতপা সাধকের অনিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধির পর হিমালয়ের পর্বতগুহায় প্রাপ্ত বয়সে একাকী যে তিতিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, ব্রহ্মচারীবাবা গ্রামে সমাজের দশজনের চক্ষুর সম্মুখে পরিবারবর্গসহ সেইরূপ তিতিক্ষারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমান অধীর সহ তাহার পিতা মাতা কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের নানা গ্রামে ভ্রমণ করিতেন এবং মায়ের আদেশে ব্রহ্মচারীবাবার

প্রবর্তিত পূজার্চনা, ভিক্ষা, ভোগ নিবেদন, হত্যা, গুরুস্তুতি পাঠ ইত্যাদি অতি নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতেন। ভগবৎ উপাসনার এইরূপ অভিনব প্রণালী দেখিয়া গ্রামবাসীরা অনেকেই তাঁহাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু একস্থানে বেশীদিন অবস্থান করিবার আদেশ না থাকায় তাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেন এবং এইরূপে তাঁহারা লক্ষ্মীয়া গ্রামে উপস্থিত হন। তথাকার কায়স্থ তালুকদার, কিশোরগঞ্জের উকিল স্বর্গীয় গুরুচরণ দাস মহাশয়েব বিধবা ভগিনী অমৃতময়ী তাঁহাদের সেবা পূজায় আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ৺পাগলনাথ দেবালয়ে তাঁহাদিগকে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহারা ঐস্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথারীতি সেবা পূজা ও উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। বালবিধবা পরম নিষ্ঠাবতী সাধিকা অমৃতময়ী অবসর সময় তাঁহাদের ৺পাগলনাথ দেবালয়ে আসিয়া গোবিন্দ ব্রহ্মচারীর সহিত ধর্ম সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনায় শ্রীমৎ ব্রহ্মবারীবাবার কঠোর তপস্যা ও সাধনার কথা শুনিয়া ক্রমেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে এই দেবালয়ে আনিবার জন্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারীকে অনুরোধ করিয়া কৈলাসকে সঙ্গে দিয়া জগদল পাঠান। গোবিন্দ ব্রহ্মচারী জগদলে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচাবীবাবাকে গুরুচরণ বাবুর ও অমৃতময়ীর অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মচারীবাবা চিরদিনই মায়ের আদেশের প্রত্যাশায় থাকিতেন—এবারও তাহাই হইল। পরে মা'র আদেশক্রমে লক্ষ্মীয়া যাইতে সম্মত হইলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি চলিয়া গেলে তোমার সেবা পূজার কি হইবে?"

মায়ের আদেশক্রমে মা'র প্রতীক প্রণব অঙ্কিত তামার টাটখানি সঙ্গে লইয়া ১৩১৬ সনের শেষভাগে চিরতরে জন্মভূমি ও সাধনভূমি এবং সিদ্ধপীঠ জগদল ত্যাগ করিয়া সমাজের সম্মুখে এই সর্বপ্রথম বাহির হইলেন। ব্রহ্মচারীবাবা গোবিন্দ ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্মীয়া গ্রামের পাগলনাথ দেবালয়ে উপনীত হইলে, দেবালয়ের

অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বাবা মহাদেব আদেশ করিলেন, "তুই এখানে থাক্।" ব্রহ্মচারীবাবা এখানেই বাস করিতে লাগিলেন, এবং এখান হইতেই মায়ের আদেশে সর্বপ্রথম দীক্ষা প্রদানে শিষ্যাদি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পাগলনাথ দেবালয়টিই পরে 'সিদ্ধাশ্রম' নামে অভিহিত হয়। স্থানটি এমনই মনোরম পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে অবস্থিত যে ইহা সার্থকরূপেই আশ্রম-পদবাচ্য! গ্রামের জনকোলাহল হইতে বেশ কিছুটা দূরে ব্রহ্মপুত্রের শুষ্ক প্রায় একটি খাড়ি নদীর দক্ষিণ তীরে বাবা পাগলনাথের প্রতীক এক সুপ্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ, গোড়াতে একটি ছোট্ট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ছোট্ট আঙ্গিনা, দক্ষিণদিকে একটি টিনের ছোট চৌচালা ঘর। কোনকালে হয়ত কোন ভক্ত পূজারী এখানে বসিয়া বাবা-মহাদেবের পূজার্চনা করিতেন, এখন তাহারই জীর্ণস্মৃতি মাত্র রহিয়াছে। গ্রামের পাশ দিয়া প্রবাহিত এই ছোট নদীটি স্থানে স্থানে মজিয়া গেলেও আশ্রমবাটিকার সংলগ্ন এই স্থানটিতে একটি গভীর ডোবার আকার ধারণ করিয়া এখনও জনপদের পরম কল্যাণব্রতে বিদ্যমান। ইহার তীরে গ্রামের শ্মশান। গ্রাম হইতে নিবিড় বাঁশবনের ভিতর দিয়া একটি পথ এই পাগলনাথের বাড়ী পর্যন্ত আসিয়াছে। যাহারা এই ডোবার তীরে মৃতের সংকার করিতে আসে, তাহারা ঝড় বৃষ্টিতে এখানে আশ্রয় নেয়। একা দিনের বেলাও এখানে বড় একটা কেহ আসে না। অদূরের ক্ষেতের চাষীরা দুপুরের রোদে কাজ বন্ধ রাখিয়া দল বাঁধিয়া আসিয়া ছায়ায় বিশ্রাম করে।

প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলায় অবস্থিত আশ্রমটির প্রায় তিনদিক ঘেরিয়া আম, জাম, কাঁঠাল ও বনুয়া ঝোপঝাড় আর বাঁশবনের ঘন সন্নিবেশ হেতু ইহা সর্বদাই ছায়া-শীতল। গাছে গাছে দোয়েল, বুলবুল, শ্যামা, কোকিল প্রভৃতি নানা বন্যপাখীর স্বাধীন বিচরণ আর আনন্দ-কূজন সত্যই নয়ন-মনোমুগ্ধকর! ব্রহ্মচারীবাবার আগমনে স্থানটির মাহাত্ম্য যেন আরও বাড়িয়া গেল। আশ্রম-বাটিকাটিকে পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন করা হইল। সারি বাঁধা নানাজাতীয় ফুলের গাছ, তুলসীমঞ্চ ইত্যাদির সমাবেশে আশ্রমটি একটি পুণ্য দেবস্থানে পরিণত হইল। এখানে আসিলে পৌরাণিক যুগের ঋষি-মুনিগণের পবিত্র তপোবনের কথাই যেন স্মরণ করাইয়া দেয়।

গ্রামে গ্রামে রটিয়া গেল—পাগলনাথের বাড়ীতে আগত সাধু মহাপুরুষের সংবাদ। গ্রামবাসিগণ দলে দলে আসিতে লাগিলেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন—প্রায় সার্দ্ধ ছয় ফুট দীর্ঘ, শারদ-সিত-শশিপ্রভ উজ্জ্বলকান্তি বিশিষ্ট সুঠাম-সুগঠিত ঋজু দেহী এক সুশান্ত পুরুষ, মাথায় কৃষ্ণ কেশদাম, বিরল শ্মশ্রুসমন্বিত প্রশান্ত মুখমণ্ডল, প্রশস্ত উন্নত ললাট, আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়, আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগল, ওষ্ঠাধরে সদা দিব্য-আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহ। ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জরিত মানুষ সাধুসন্দর্শনে আসিয়া তাঁহার প্রাণস্পর্শী অন্তরঙ্গ আলাপনে মোহিত হইলেন, তাঁহার অমিয় উপদেশবাণীতে পাইলেন অন্তরে অনন্ত সান্ত্বনা। অতি সহজ সরল ও স্পষ্ট ভাষায় ভগবদ্‌তত্ত্ব কথার পরিবেশনে জিজ্ঞাসু প্রাণে জাগ্রত করে নিশ্চয়াত্মিকা ভক্তি ও বিশ্বাস, প্রাণ মন স্বতঃই যেন প্রণত হয় ভগবৎ চরণে। মায়েরা সাধু দর্শনে আসিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করেন—উৎকর্ণ হইয়া শোনেন ব্রহ্মচারীবাবার অমিয়বাণী।

ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার স্বভাব সুলভ হাস্যমুখে সাধারণতঃ সকলকে 'মা' 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন—ভক্তমণ্ডলীও তাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গে তাঁহার আধ্যাত্মিক অন্তরঙ্গতা নিবিড় হইয়া উঠিল।

১৩১৬ সনে কিশোরগঞ্জের নিকটবর্তী জঙ্গলবাড়ী নিবাসী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুন মহাশয় তাঁহার জয়কালী যাত্রারদল সহ লক্ষ্মীয়া গ্রামে উপস্থিত হন। যাত্রার দল লক্ষ্মীয়া গ্রামের ৺মহেশচন্দ্র দাসের বাড়ীতে অবস্থান করিত। ঐ গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র ধর, সূর্যকান্ত দাস, কার্তিক দেব প্রভৃতি অনেকেই সপরিবারে ব্রহ্মচারী-

বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কারকুন মহাশয়ের যাত্রাদলেরও বহুলোক ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দলের উত্তম গায়ক ও অভিনেতা সুরেন্দ্র নামে একটি ১৩।১৪ বৎসরের বালক ব্রহ্মচারী-বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গেই থাকিয়া গেল। এই বালক খুব বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিল। ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে থাকিয়া নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া অতি সহজেই বিভিন্ন দর্শন-শাস্ত্রের মতবাদের সারমর্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল, এবং ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য আশ্রমোচিত শিক্ষা লাভ ও ধ্যান ধারণা করিয়া বিচারশীল তপস্বী হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মচারীবাবা পরে এই বালককে সর্বপ্রথম সন্ন্যাস সংস্কার প্রদান করিয়া 'শান্তিদানন্দ' নামে অভিহিত করেন। শান্তিদানন্দ 'সত্যগাথা' নামে একটি ছোট কবিতা পুস্তকে ব্রহ্মচারীবাবার উপলব্ধ ও উপদিষ্ট সত্যগুলিকে অতি সহজ ও সরল ভাষায় সাবলীল ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার প্রেরণা-সঞ্জাত জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া শান্তিদানন্দ পরে কলৌ-কালীমঙ্গল বা উমা-প্রেম, লিঙ্গপূজা-তত্ত্ব, ধর্মসম্মিলন ইত্যাদি অধ্যাত্মতত্ত্ব সমৃদ্ধ আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন এবং 'মাতৃভাণ্ডার' কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

যাত্রার দলের প্রধান গায়ক রাধানাথ সরকারও এইখানেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে লক্ষ্মীয়া গ্রামের বহুলোক সপরিবারে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তর তাঁহার অনুষ্ঠিত পথে সাধনা ও উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনেকেই সস্ত্রীক দীক্ষা নেওয়াতে মহিলা মহলেও সাধনার বেশ সাড়া পড়িল। যাত্রার দলের অধিকাংশ লোকই দীক্ষা গ্রহণান্তর সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীয়া এবং চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রামে একটা নূতন জীবন—নূতন চেতনার সঞ্চার হইল, এবং ক্রমেই তাহা চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করিল। ভগবৎ উপাসনায় ও সেবাপূজায় এমন

নিষ্ঠা—জাতিবর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ভগবানের উপাসনায়, সেবাপূজায়, জপ ও প্রার্থনায় সমান অধিকারী,—ইহা যেন এক অভিনব ব্যাপার। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত, গ্রাম্য লোকেরা সকল দল ও সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবার উদার ধর্ম মতে (যত নাম ও রূপ এক ভগবানেরই) উপাসনা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। লোকমুখে শোনা যাইত—ব্রহ্মচারীবাবা যেন গ্রাম চুক্তি নাম সাধন ও সত্যধর্ম স্থাপন করিয়া চলিয়াছেন।

ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেন—"ভেদালিয়ার মুথা তোলাই আমার কাজ—অর্থাৎ কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত, এবং তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা নিষ্পেষিত অবজ্ঞাত সাধারণ মানুষের প্রাণে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালানর জন্যই আদ্যাশক্তি মা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

মায়ের কার্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য জনৈক ভক্তকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখিতেছেন—"আমতলা গ্রামের দশরথ নমশূদ্রকে পূজার্চনার বিধি দিয়াছিলাম। সে বাড়ীতে মায়ের মূর্তি স্থাপন করিয়া ঘণ্টাবাদ্য সহকারে পূজা করিত বলিয়া এতবড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গ্রামের ব্রাহ্মণগণ তাহাকে কত প্রকারে নির্যাতন করিয়াছেন। আর এখন সে আনন্দের সহিত উচ্চ উচ্চারণ পূর্বক প্রণ-ধ্বনির সহিত পূজাদি করিতেছে; এখন সমাজ নীরব।"

তৎকালে পূর্ববঙ্গে সাধু মহাত্মাগণের দ্বারা সমাজের যে কত উপকার হইয়াছে তাহার প্রসঙ্গে বলেন,—"এই যে অবনী রায়, (দীর্ঘ বার বৎসরকাল তারকব্রহ্ম নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন) তাঁহার দ্বারা এই অঞ্চলের সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকগুলি অনেক আনন্দ উৎসাহ ও একতায় উন্নত হইয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ, (ঠাকুর দয়ানন্দ)—ইনির কীর্তন প্রচার ও আচণ্ডালে সমতা (এক পংক্তিতে ভোজনাদি করা) দেখিয়া নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর

ম্লেচ্ছাচারী শিক্ষিত সমাজ সত্যপথ অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছে। ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুর কীর্তন ও অমায়িকতার প্রভাবে সে অঞ্চলের অন্যান্য সমাজের সঙ্গে বনুয়া বাগ্‌দী অশিক্ষিত সমাজগুলিকে কত রকমে উন্নত করিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। এইরূপ খণ্ড খণ্ড ধর্মসম্প্রদায়দিগের দ্বারা দেশের যত কাজ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা করিতে দাম্ভিক শিক্ষিত সমাজের অনেক যুগ বা জন্ম লাগিবে।··· ইঁহাদেব প্রভাবে গোড়া হিন্দুসমাজের অবিধিযুক্ত গোঁড়ামির প্রভাব খুব দুর্বল হইয়াছে।" ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী ১২০ পৃঃ।

কিছুকাল লক্ষ্মীয়া গ্রামে বাস করিবার পরই বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে ব্রহ্মচারীবাবাকে লইয়া যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং এইভাবে মায়ের আদেশে শিষ্য ও ভক্ত সাধক সাধিকাব সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

লক্ষ্মীয়া হইতে ১৩১৭ সনে তিনি কিশোরগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে নগুয়া গ্রামে সনাতন সাধুব (ভূঁইমালী) বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হন। সনাতনদা আরও দুই এক জন সঙ্গীসহ সে অঞ্চলে কিশোরী-ভজা এক ব্যভিচাবী দলের নেতৃত্ব করিতেন। সনাতনদার চেহারা ছিল উপকথায় বর্ণিত দস্যুদলের সর্দারের মত। সুদীর্ঘ বিরাট কাল দেহ, মাথায় কালো ঝাঁকড়া চুল, প্রায় হাত খানেক বুকের ছাতি। দলের নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত চেহারাই বটে। তাহার বাড়ীতে ব্রহ্মচারীবাবার আগমনে সে যেন একেবারে অন্য মানুষ হইয়া গেল। তাহার পূর্ব কার্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সে ব্রহ্মচারীবাবার পদতলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিল—যেন বন্য কেশরী কি এক যাদুমন্ত্র-প্রভাবে তাহার প্রচণ্ড শ্বাপদ-বিক্রম ভুলিয়া গৃহপালিত মার্জারের ন্যায় প্রভুর পদতলে লুটোপুটি খায়। সনাতনদার এই অদ্ভুত পরিবর্তনে সকলে চমৎকৃত হইয়া গেল। ব্রহ্মচারীবাবা তাহাকে দীক্ষা দান করিলেন; বাড়ীতে শ্রীশ্রীরক্ষাকালীমায়ের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মায়ের পূজায় ব্রতী করাইলেন। দলের অন্যান্যেরাও ক্রমে তাঁহার

নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধন ভজনের রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া সদাচারী হইল। এই সংস্কার সাধনের জন্য প্রায় দুই মাস তাঁহাকে এখানে থাকিতে হইয়াছিল। মায়ের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠার পর সনাতনদার বাড়ীটি "শান্তি-আশ্রমে" রূপান্তরিত হয়।

ব্রহ্মচারীবাবা পরে আরও অনেকবার নগুয়া শান্তি-আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎকালে ব্রহ্মচারীবাবার আগমন উপলক্ষে এখানে প্রতিদিন কিশোরগঞ্জ এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহের বহু শিষ্য ও ভক্তের সমাগম হইত। দিবসের কর্মকোলাহলক্লান্ত শহরের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি দিনান্তে এই শান্তি-আশ্রমে আসিয়া বাবার পাদস্পর্শ করিয়া এবং তাঁহার নিকট ভগবদ্ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া পরম শান্তি লাভ করিতেন।

ঐ সময়ে তদঞ্চলের বহু ভক্ত এই স্থানে দীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। গছিহাটা গ্রামের শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়কে ব্রহ্মচারীবাবা ১৩৪২ সনের আষাঢ় মাসে এই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীরক্ষা-কালী মায়ের সম্মুখে বসিয়া কৃপাপূর্বক দীক্ষিত করেন। তাহার মনে সদ্‌গুরু লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য আবাল্য সাধক নিদান সাধুজী (৺হরেন্দ্র নারায়ণ দত্তরায়) তাহাকে বলেন—"শ্রীমদ্‌ভারত ব্রহ্মচারী একজন সিদ্ধমহাপুরুষ, তিনি একজন সদ্‌গুরু। কালবিলম্ব না করিয়া তুমি তাঁহার কাছে যাও এবং দীক্ষা গ্রহণ কর, এ সুযোগ আর হবে না।" গচিহাটার শ্রীইন্দুভূষণ দত্তরায় (বর্তমানে শ্রীমৎপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, অধ্যক্ষ শ্রীশ্রীভারত আশ্রম নাটাগড়, হুগলী) এবং অরুণাচলের শ্রীমৎদয়ানন্দ স্বামীজীর শিষ্য ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীও এই স্থানেই সর্বপ্রথম ব্রহ্মচারীবাবার দর্শন লাভ করেন। ইন্দুভূষণ পরে ১৩২৬ সনে লক্ষ্মীয়া পাগলনাথ সিদ্ধাশ্রমে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মচারীবাবার কথা ক্রমেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিভিন্ন গ্রামের ভক্তগণ তাঁহাকে নিজ নিজ গ্রামে লইয়া যাওয়ার জন্য

আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি মায়ের ইচ্ছা ও আদেশ জানিয়া—'মায়ের কেলের শিশু ও যন্ত্র' হইয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের গাঢ় অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিলেন। সমাজ-দেহে একটু ভগবৎ চেতনা সঞ্চার ও ভাগবত-জীবন জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে এইভাবে তাঁহার মহান্ তপস্যাপূত তনু-মন-প্রাণ নিঃশেষে বিলাইয়া দেন।

১৩:৮ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে ব্রহ্মচারীবাবা জঙ্গলবাড়ী নিবাসী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুন মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া তথায় শ্রীশ্রীজয়কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি কারকুন মহাশয় যাত্রারদল ছাড়িয়া দিয়া উপাসনা ও মায়ের সেবা পূজাদিতে মনোনিবেশ করিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার উপদেশ মত কঠোরভাবে সাধনা করিতে করিতে তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়ার দর্শন, আদেশ ও ইঙ্গিত লাভ করেন।

১৩১৮ সনের ২৬শে ফাল্গুণ মায়ের আদেশে লক্ষীয়া পাগলনাথ সিদ্ধাশ্রম হইতে ব্রহ্মচারীবাবা নবদ্বীপ যাত্রা করেন। শান্তিদানন্দ, রাধানাথ সরকার ও সূর্য্যকান্ত দাস তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব করাইবার জন্য মন্দিরের সম্মুখে তিনি আড়াই দিবস হত্যায় ছিলেন; তদবস্থায় আদেশ হইল—"আমি যাব" (আবির্ভূত হইব)।

ব্রহ্মচাবীবাবার অন্যতম গুরু শ্রীমৎগোপাল গোস্বামী অপুত্রক ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীবাবাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমার পুত্র নাই, তুমিই আমার পুত্র স্বরূপ। নাদপুত্র ও বিন্দুপুত্র একই। নাদপুত্র অর্থাৎ মন্ত্রশিষ্য এবং বিন্দুপুত্র অর্থাৎ ঔরসজাত পুত্র।" গোপালগোস্বামী ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দেহত্যাগের পূর্বে উপরোক্ত দুই প্রকার পুত্রের ব্যাখ্যা করায়, তাঁহার দেহত্যাগ হইলে তিনি গয়াতে তাঁহার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিবেন সঙ্কল্প করেন। মায়ের আদেশক্রমে নবদ্বীপ হইতে গয়াধামে উপনীত হইলে, মা বলিলেন—

"অন্নাদি পাক করিয়া পঞ্চক্রোশের ভিতর ভোগ দিলে পিণ্ডদান সিদ্ধ হইবে। অতএব গয়াতে বারদিন থাকিয়া মায়ের আদেশ মত অন্ন পাক করিয়া ভোগ দিলেন। এই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ পদে দৈবক্রমে চিম্‌টা পড়িয়া যাওয়ায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গী ভক্তগণসহ সিদ্ধাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। পরম ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ধর সপরিবারে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধাসহকারে ছয়মাস কাল অবিশ্রান্ত সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করেন।

অতঃপর ১৩১৯ সনের অগ্রহায়ণ মাসে বালক সুরেন্দ্রের আগ্রহে তাহার জন্মভূমি নেত্রকোণা উপবিভাগের অন্তর্গত কেন্দুয়া থানার নিকট বৈরাটী গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। ঠিক লক্ষ্মীয়ার ন্যায় বৈরাটী গ্রামেও ব্রহ্মচারীবাবাকে লইয়া খুব সাড়া পড়িল। গ্রামবাসীদের অনেকে সস্ত্রীক দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবার অনুষ্ঠিত ও উপদিষ্ট পথে উপাসনা করিতে লাগিলেন। যাহারা দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন, তাহারা তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে সামর্থ্যানুযায়ী স্বতন্ত্র একখানি ঠাকুরঘর বা আসনঘর তৈয়ারী করিয়া লইলেন। যাহারা অসমর্থ তাহারা নিজেদের বাসগৃহেরই এক কোণে বা পার্শ্বে একটি আসন স্থাপন করিয়া তাহাতে পূজার্চনা ও উপাসনা করিতেন। ব্রহ্মচারীবাবা উপাসনার স্থান সম্বন্ধে বলিতেন, উপসনা করিবে—"মনে, বনে, কোণে।" প্রথমতঃ গ্রামের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যেই তাঁহার কাজ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মচারীবাবা যেদিন যে বাড়ীতে যাইতেন, আগের দিনই তাহা নির্দিষ্ট হইত, আগামীকাল কোন্ বাড়ীতে তাঁহার শুভাগমন ও ভোগ লাগিবে। সেদিন সে-গৃহ বিশেষ পূজা বা আনন্দোৎসবে পরিণত হইত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সদাচার সর্বদা সর্বত্র প্রতিপালিত হইত। তাঁহার অবস্থানক্ষেত্রে একটি পবিত্র শান্ত আবহাওয়া আপনা হইতেই সৃষ্ট হইত। স্ত্রী-পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই মনপ্রাণ সদ্‌ভাবে ও ধর্মভাবে ভরপুর থাকিত। ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গপ্রিয়

শিষ্যগণ, যাহারা আশ্রম-জীবন ও অধ্যাত্ম-জীবন লাভের জন্য সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, তাহাদের মধ্যে যিনি বিশেষ অধিকারী ও নিষ্ঠাপরায়ণ তিনিই ভোগের পাক করিতেন, ভোগ নিবেদন, ভোগারতি এবং গুরুস্তুতি ইত্যাদি সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মচারীবাবা ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া আনন্দের সহিত প্রসাদ পাইতেন। সে যেন এক মহামহোৎসব ; কিন্তু কোন আড়ম্বর নাই, আয়োজনের বাহুল্য নাই। প্রসাদ যাহারা পাইতেন তাহারা সকলেই অনুভব করিতেন, সে প্রসাদ কি সুস্বাদু তৃপ্তিপূর্ণ ও পবিত্র।

এইভাবে বৈরাটী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে গ্রামে গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবার কথা প্রচার হইতে লাগিল—কোন লিখিত পুস্তকদ্বারা নহে, পত্রিকার বিজ্ঞাপন দ্বারা নহে, পরন্তু তাঁহার সুমধুর ব্যবহার, আধ্যাত্মিক প্রভাব, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির অপূর্ব সমন্বয় সাধন-প্রণালী দেখিয়া পঞ্চাশ লক্ষাধিক অধিবাসী অধ্যুষিত বাংলার সর্ব বৃহৎ জেলা ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলের সুদূর পল্লীগ্রামে যেখানে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক পৌছে নাই, এমন কি যেখানে কোন সংবাদপত্রও সুদুর্লভ,—যে সমস্ত গ্রামবাসীর নিকট সাধুসন্ত মহাপুরুষের আগমন কল্পনাতীত ছিল, সেই সকল পল্লীর ঘরে ঘরে স্বয়ং আদ্যাশক্তি জগজ্জননী তাঁহার মূর্খ অশিক্ষিত পতিত সন্তানগণের প্রতি অসীম করুণা পরবশ হইয়াই যেন ব্রহ্মচারীবাবাকে যন্ত্র করিয়া তাঁহার অনন্ত কৃপা-করুণা বিতরণ করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা যখন যে গ্রামে পদার্পণ করিতেন, সেখানেই এক পরম আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইত,—যেন তাহারা এক নব-জীবন, নব-চেতনা ও নূতন আলোকরশ্মির সন্ধান পাইত—যদিও তাহারা জানিতনা সে চেতনা ও জীবন কি? তাহারা শুধু দেখিত ব্রহ্মচারীবাবাকে, তাহাতেই তাহারা নূতন আনন্দে, নবীন প্রেরণায় মাতিয়া উঠিত।

এই বৎসর তিনি বৈরাটী গ্রাম নিবাসী কায়স্থ তালুকদার পত্রনবীশ মহাশয়গণের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদের পূর্বপুরুষের শ্মশান-

ভূমিস্থ শ্রীশ্রীহরগৌরী বটবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই স্থানটিই পরবর্তীকালে বৈরাটী 'গৌরী-আশ্রম' নামে অভিহিত হয়। ইহাই ব্রহ্মচারীবাবার প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় আশ্রম। এই সময়ে শ্রীমৎ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, সহধর্মিণী কুমুদিনী, তাঁহাদের তিনটি ছেলে সুধীর, অধীর ও গোপাল, এবং তিনটি মেয়ে সুমতি, বনবাসী ও নির্ম্মলা এবং ব্রহ্মচারীবাবার জ্যেষ্ঠাভগ্নী উত্তর-সাধিকা নিত্যময়ী—(উপরোক্ত ছেলেমেয়েদের দিদিমা) উক্ত আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাদিগকে উক্ত আশ্রমের সেবাপূজার কার্যে নিযুক্ত করিয়া ব্রহ্মচারী-বাবা আবার লক্ষ্মীয়া পাগলনাথ সিদ্ধাশ্রমে চলিয়া গেলেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ হইতে দক্ষিণ-ভারতে পর্যটনে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উপরোক্ত সিদ্ধাশ্রমে, কিশোরগঞ্জ নগুয়ার সনাতনদার বাড়ীতে, বয়লা গ্রামে, জঙ্গলবাড়ীর ৺যোগেন্দ্রনাবাযণ কারকুন মহাশয়ের বাড়ীতে, এবং বৈরাটী-আশ্রম ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রাম আমতলা, সাজিউরা, কান্দীউরা, আদমপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহে শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে কখনও কখনও যাইতেন। এই সময়ে বৈরাটী হইতে সরলানন্দ, সুশালানন্দ, পাতুয়াইর হইতে অবলানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সংসার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচারীবাবা নির্দিষ্টভাবে কোন আশ্রমে অবস্থান কবিতেন না। উক্ত-ভক্তগণও ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন।

১৩২০ সনের ফাল্গুণ মাসে ব্রহ্মচারীবাবা বৈরাটী গৌরী-আশ্রম হইতে চন্দ্রনাথ-ধাম অভিমুখে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন একমাত্র শান্তিদানন্দ। চন্দ্রনাথ হইতে মায়ের আদেশে নবদ্বীপ ও কলিকাতা কালীঘাট হইয়া রথযাত্রার সময় তাঁহারা পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। তখন মা বলিলেন—"সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইয়া তোর বাবার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে।"

রামেশ্বরে যাইয়া আট দিন প্রার্থনা করিলে—'বাবা' আদেশ করিলেন—"তুই দেশে যা, আমি সর্বদাই তোর কাছে থাকিব, যখন

ডাকিবে তখনই পাইবে।” ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন যে, এই দক্ষিণ-ভারতে যাতায়াতের প্রায় সমস্ত পথই পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রায় আট মাস লাগিয়াছিল। ব্রহ্মচারীবাবা শান্তিদানন্দ সহ একমাত্র মা'র উপর নির্ভর করিয়াই কপর্দকশূন্য অবস্থায় এই সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, খুব ভোরে উঠিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিতেন এবং আট কি দশ মাইল হাঁটিয়া রৌদ্র প্রখর হইবার পূর্বেই কোন জলাশয়ের কাছে কিম্বা কোন বাজার বা বৃক্ষতলে বিশ্রামের এবং ভোগের উপযোগী স্থান খুঁজিয়া লইয়া তথায় ভোগ ও সেবাদি সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতেন। বৈকালে রৌদ্রের উত্তাপ কমিয়া গেলে আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিতেন এবং পাঁচ কি সাত মাইল হাঁটিয়াই রাত্রি যাপনের স্থান খুঁজিয়া লইতেন। এইরূপে প্রতিদিন চৌদ্দ পনর মাইল মাত্র চলিতেন। তিনি বলিতেন 'দীর্ঘপথ পদব্রজে পর্যটনেই বেশী অভীজ্ঞতা লাভ হয় ও অনেকস্থান দেখা হয়। একাকী বা একত্রে দুইজন মাত্র ভ্রমণ করা উচিত।' এই পর্যটন হইতে ফিরিবার সময় শান্তিদানন্দের খুব পেটের অসুখ হয় এবং তিনি খুব দুর্বল হইয়া পড়েন। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন যে, দুইজনের মধ্যে মাত্র একখানি কম্বল ছিল, তাহার অর্দ্ধেক নীচে বিছাইয়া নিজে শুইতেন এবং শান্তিদাকে বুকের উপর রাখিয়া কম্বলের অপরার্দ্ধ উপরে জড়াইয়া লইতেন। দৈবাৎ যদি কোথাও রেল গাড়ীতে উঠিতে হইয়াছে, সঙ্গে পয়সা না থাকায় ষ্টেশন মাষ্টার বা গার্ডকে বলিয়া গাড়ীতে উঠিতেন এবং যথাস্থানে আবার নামিয়া যাইতেন। একদিন কোন গ্রামে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া কয়েক বাড়ী হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন, সকলেই সেদিন ভিক্ষা দিল—ভাত ও তরকারী। ভিক্ষান্ন ও তরকারী নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইবার সময় দেখিলেন যে তাহাতে টুকরা টুকরা মুরগীর মাংস রহিয়াছে। ভিক্ষান্ন নিবেদন করিয়া মা'র প্রসাদ পাইলেন। প্রসাদে খাদ্যবুদ্ধি না থাকায় তিনি সংস্কারমুক্ত প্রসন্নমনে

তাহা গ্রহণ করিলেন, আর বলিলেন—গ্রামখানি হয়ত মুসলমানদের হইবে।' প্রসাদ গ্রহণ ও মন্ত্রগ্রহণকে ব্রহ্মচারীবাবা তুল্যমূল্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রসাদ গ্রহণ ও মন্ত্র গ্রহণ এক রকম। যেমন প্রসাদ দেখিয়া শ্রদ্ধা হইলেই বিচার না করিয়া অর্থাৎ কোন দেবতার প্রসাদ, খাব কি না, এই বিচার না করিয়া গ্রহণ করিবে, কারণ সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক, দেবদেবী তাঁহারই নামরূপ। মন্ত্র গ্রহণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ: এই যে দেশে প্রচারকগণ দেখিতেছ, তাঁহারা সকলেই এক ঐশীশক্তির প্রেরণায় কাজ করিতেছেন। প্রাণের টান পড়িলেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

একবার উড়িষ্যা প্রদেশের কোন গ্রামের পথে চলিবার কালে সামান্য কিছু চাউল ও কয়েকটি পয়সা মাত্র ভিক্ষা মিলিয়াছিল। সারাদিন অনাহার, সন্ধ্যাবেলায় একটি মাটির হাঁড়ি খরিদ করিয়া এক দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ীর পাশে অন্নাদি পাক করিয়া ভোগ নিবেদনান্তে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন যে, গ্রামটি এত দরিদ্রের যে রান্নার পোড়া হাঁড়িটি দিবার জন্য অনেকেই তাঁহকে অনুরোধ করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারীবাবা শান্তিদানন্দ সহ সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট প্রসাদসহ হাঁড়িটি গৃহস্বামীকে দিয়াদিলেন। উপস্থিত সকলকেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ বিতরণ করিয়া হাঁড়িটি গৃহস্থ নিজে রাখিল। পর্যটন সমাপ্ত করিয়া ১৩২১ সনের মধ্যভাগে তিনি বৈরাটী গৌরী-আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৩২২ সনের মাঘ মাসে ব্রহ্মচারীবাবা সর্বপ্রথম কাঁঠালতলী গ্রামের স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করেন এবং কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেন। বনগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্রমহলে তখন খুব সাড়া পড়িয়া যায় এবং অনেক ছাত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। সেই সময়ে ক্ষিতীশদত্ত, পুলিনবিহারী সরকার, উমেশদাস (ধীরানন্দ), অতুল দে (শিক্ষক), মুরারিমোহন দে,

রজনীকান্ত সরকার (শিক্ষক), শশীমোহন দে প্রভৃতি এবং অনেক স্ত্রীলোকভক্তও দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহারপর ব্রহ্মচারীবাবা বৈরাটী গৌরী-আশ্রমে ফিরিয়া যান এবং তথায় কিছু দিন অবস্থানের পর ১৩২৩ সনের প্রথমভাগে লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন। এই সময় এখানে শ্রাবণ মাসে কেদার সরকার (বনগ্রাম), মোহিনী চৌধুরী (বানিয়া গ্রাম) সতীশ দে (মসূয়া) সুরেশ পাল (অষ্টবর্গ) প্রভৃতি ভক্তগণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়েও আশ্রমে দৈনন্দিন সেবা পূজার নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল না। প্রায়ই গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী, পরম ভক্ত ৺কৃষ্ণচন্দ্র ধর মহাশয়ের বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইত। ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ সহ সেখানে প্রসাদ পাইতেন। ঐ বৎসর কৃষ্ণচন্দ্র ধর মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা সম্পন্ন করিয়া তিনি বৈরাটী গমন করিলেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করতঃ তদঞ্চলের ভক্তগণকে ভগবদুপাসনায় সাহায্য করিলেন। ১৩২৪ সনের মহাবিষুব সংক্রান্তিদিনে বৈরাটীর পরমভক্ত সুশীলানন্দের বাড়ীতে যোগানন্দ (যতীন্দ্র, করগাঁও) ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই সময় সুশীলানন্দের বাড়ীতে শান্তিদানন্দ, রাজকিশোরদা (জঙ্গলবাড়ী) ভজনদা (আঠারবাড়ী) প্রভৃতি ভক্ত ও শিষ্যগণ ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে ছিলেন। ১৩২৫ সনের প্রথম ভাগেই তিনি শিষ্যগণ সহ আবার লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন। সংসার-ত্যাগী যুবক শিষ্যগণের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শান্তিদানন্দ, সুশীলানন্দ, অবলানন্দ, সরলানন্দ, মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি সংসারত্যাগী শিষ্যগণ ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে সিদ্ধাশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

লক্ষীয়া পাগলনাথ দেবালয় স্থানটি ব্রহ্মপুত্র নদের খাঁড়ির উপর অবস্থিত, তাহার নীচেই একটি ভীষণ শশ্মান। যদিও চারিদিকেই লোকালয়, তথাপি প্রাকৃতিক ভাবেই স্থানটি লোকালয় হইতে স্বতন্ত্র, এবং কিছুদূরে জঙ্গলপূর্ণ একটি নির্জন স্থানে একটি বহু প্রাচীন অশ্বত্থ

বৃক্ষের তলায় অবস্থিত। এই অশ্বত্থ বৃক্ষটিই পাগলনাথ-শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। প্রাকৃতিক ভাবেই এই স্থানটি গভীর নির্জন ও একান্ত সাধনার স্থান। প্রায় আট বৎসর পূর্বে ব্রহ্মচারীবাবা স্বীয় জন্মভূমি ও সিদ্ধভূমি চিরতরে ত্যাগ করিয়া মায়ের আদেশে এখানেই সর্বপ্রথম আসেন, এবং পাগলনাথ-রূপী মহাদেবের আদেশ পান—"তুই এখানে থাক," তাহা পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। যদিও ইহা পূর্ব হইতেই আশ্রম বলিয়া অভিহিত হইতেছিল, প্রকৃতপক্ষে ১৩২৫ সন হইতেই ইহা প্রকৃত 'সিদ্ধাশ্রম'—তপোবনে পরিণত হইল। সর্বত্যাগী কঠোরতপা ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার অর্থ, পাকা ঘর-বাড়ী, দালান কোঠা তো নয়ই, এমন কি কোনও কাঁচা ঘর দরজা ও নয়। সামান্য কয়েটি তপস্যাকুটীর—বাঁশের খুঁটি, ছনের ছাউনি, দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৬ হাত ও ৪ হাত হইবে। শরীর ও মাথা গুঁজিবার মত ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর মাত্র। আশ্রমবাসী শিষ্যগণ বাবার আদেশক্রমে আশ্রমের ইতস্ততঃ ঝোপ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে নিজেরাই এইরূপ কতকগুলি কুটীর নির্মাণ করিয়া কঠোর সাধন ভজনে নিবিষ্ট হইলেন। আহারের কোনই স্থায়ী ব্যবস্থা নাই, নির্দিষ্ট মাসিক চাঁদা বা কোন আয়ের পথ নাই—ভিক্ষা মাত্র সম্বল। পূর্ববঙ্গে, বিশেষতঃ এতদ্দেশে এরূপ আশ্রম ইহাই সর্বপ্রথম। ব্রহ্মচারীবাবা লক্ষ্মীয়া এবং তাহার দুই তিন মাইলের মধ্যবর্তী গ্রাম সমূহে আশ্রমবাসী ভিক্ষুগণ দ্বারা প্রচার করিলেন যে, আশ্রমের একজন ভিক্ষু প্রত্যহ মাত্র পাঁচ বাড়ী ভিক্ষা করিবে—মুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্তে তাহাকে অন্তত একজন লোকের সেবা হইতে পারে তদনুযায়ী চাল, ডাল, তরিকারী, তৈল, লবণ, হলুদ ইত্যাদি সবই যেন দেওয়া হয়, কারণ আশ্রমের অন্য কোন আয় নাই, ভিক্ষায় যাহা মিলিবে তাহা দ্বারাই আশ্রমের সেবা পূজা চলিবে, এবং এইরূপ ভিক্ষা একজন গৃহস্বামীকে মাসে মাত্র একদিনই দিতে হইবে।" ঋষিতুল্য ব্রহ্মচারীবাবার তদঞ্চলে খুবই প্রভাব ছিল এবং লক্ষ্মীয়া অঞ্চলের অধিবাসিগণও অধিকাংশই তখন বেশ সচ্ছল

অবস্থাপন্ন ছিলেন। আশ্রমবাসী ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইলে তাঁহারা অতি শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যথেষ্ট পরিমাণ ভিক্ষা দিতেন, এবং পাঁচ বাড়ী ভিক্ষা দ্বারা পাঁচ সাত জনের সেবা অনায়াসেই চলিত। লক্ষ্মীয়া, বরাটিয়া, নিশ্চিন্তপুর, আইঙ্গাদি, কুমারপুর, মির্জাপুর প্রভৃতি গ্রামের বিশেষ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের দুই এক বাড়ী হইতেই যে ভিক্ষা দিতেন, তাহা ভিক্ষার ঝুলিতে কাঁধে করিয়া আনা কষ্টকর হইত; তাহাতে প্রায় ২০।২২ জনে প্রসাদ পাইতে পারিত। এইপ্রকার ভিক্ষা ব্রহ্মচারিবাবাই সর্বপ্রথম ঐ অঞ্চলে প্রচলন করেন, তাহাতেই আশ্রমের সেবা চলিত। উৎসবাদির সময় কুটীরগুলি ভক্তরা নিজেরাই মেরামত বা সংস্কার করিয়া লইতেন। চারিদিকে জঙ্গল থাকায় জ্বালানীকাঠের অভাব হইত না। তপস্বী যুবক ব্রহ্মচারীদের পক্ষে একটি বাঁশের ধারা, শ্মশান হইতে সংগৃহীত কন্থা, কম্বল এবং পরিধানের জন্য সামান্য কৌপীন বহির্বাসই ছিল যথেষ্ট—জামা, জুতা, খরম, ছাতা, তৈল, সাবানের বালাই ছিলনা। একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ছিল, রাত্রিতে আরতি হওয়া পর্যন্ত জ্বলিত। বলা বাহুল্য চব্বিশ ঘণ্টায় একবার মাত্রই প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মধ্যাহ্নের প্রসাদ কোনদিন বাড়িলে জলদিয়া রাখা হইত, তাহাই রাত্রে গ্রহণ করা হইত। রাত্রিতে সেবার ব্যবস্থা ছিলনা—সঞ্চয়ের ও নিয়ম ছিলনা। অতিরিক্ত মুষ্টি ভিক্ষালব্ধ চাল বিক্রয় করিয়া যুবক ব্রহ্মচারিগণ আবশ্যক শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পড়িতেন। তাহাতে একটি ছোটখাট লাইব্রেরী হইয়াছিল। আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীদের দৈনন্দিন কার্য ছিল, ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া আসন প্রাণায়াম ও ধ্যানান্তে স্নানাদি করিয়া কেহ ঠাকুর পূজা করিত, কেহ আশ্রম প্রাঙ্গণ ঝাঁটদিত, কেহ ভিক্ষায় যাইত, কেহ ফুল তুলিত, কেহ বা লাকড়ি সংগ্রহ করিত। ভিক্ষা হইতে আসিলে, কেহ চাল ডাল বাছিয়া দিত, কেহ ভোগের পাক করিত এবং কেহ বা ভোগের পাকে সাহায্য করিত। ভোগপাক সম্পন্ন হইলে ভোগ

নিবেদন করিয়া আশ্রমবাসী এবং উপস্থিত ভক্তগণ ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গুরুস্তুতি পাঠ করিতেন ও গড়াগড়ি দিতেন। ভোগ নিবেদন হইয়া গেলে তারপর সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ পাইতেন। ব্রহ্মচারীবাবাও একত্রই বসিতেন এবং তিনিও একই প্রসাদ পাইতেন। তাঁহার জন্য পৃথক বা বিশেষ কিছু ব্যবস্থা কখনও ছিল না এবং তিনি তাহা একেবারেই পছন্দ করিতেন না। ব্রহ্মচারীবাবার এবং শিষ্য ও ভক্তগণের খাওয়া থাকারও একই সমান ব্যবস্থা ছিল।

লক্ষীয়া গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপদেশে মুমুরদিয়ার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশীয় ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় কৈশাসচন্দ্র দত্তরায় মহাশয়ের ধর্মপ্রাণা সহধর্মিণী তাঁহাদের কুলবিগ্রহ শালগ্রাম এবং একটি বৃহদাকার শিবলিঙ্গ ব্রহ্মচারীবাবাকে দান করেন। কাঁঠালতলী নিবাসী ব্রহ্মচারীবাবার অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় ঐ বিগ্রহদ্বয় মুমুরদিয়া হইতে লক্ষীয়া পাগলনাথের দেবালয়ে আনয়ন করিলে, ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শিবচতুর্দশী নিশীথে ব্রহ্মচারীবাবা 'শ্রীশ্রীসুদর্শন' নামে শালগ্রাম এবং "শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দশিব" নামে সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বৎসরই রামানন্দ (রমনীমোহন গুহ, কবিরাজ, শেখরনগর বিক্রমপুর, ঢাকা) দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই শিবচতুর্দশী উৎসব সমাপনান্তে মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতিকে সিদ্ধাশ্রমের সেবা পূজায় নিযুক্ত করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা বৈরাটী গৌরী-আশ্রমে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩২৬ সনের ৮ই আশ্বিন ময়মনসিংহে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা হয় এবং তাহাতে বহুলোকের ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হয়। ধান্যাদি ফসল বহুলাংশে নষ্ট হওয়ার ফলে তদঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সুচনা হয়। এই সময়ে ব্রহ্মচারীবাবা মায়ের আদেশ পাইলেন, শুভ দীপান্বিতা তিথিতে (১৩২৬ সন) তাঁহার সিদ্ধিপ্রদায়িনী শ্রীশ্রীভারতেশ্বরী মহাদেবীর মৃন্ময়ীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত

করিতে হইবে। বাবার আদেশে চারিদিকে শিষ্যগণের মধ্যে এই শুভ-সংবাদ প্রচার করা হইল।

এই সময় পর্যন্ত গৌরী-আশ্রমেও বিশেষ কোন ঘরদরজা ছিল না। ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন যে, মা বলিয়াছেন—"রুস্তু আসিয়া (একজন শক্তিশালী মুসলমান পয়গম্বর) আশ্রম সংস্কার করিবেন।" কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল কান্দিউরা হাইস্কুলের মহেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, নগেন্দ্রচন্দ্র ধর, উপেন্দ্রচন্দ্র সরকার প্রভৃতি ছাত্র শিষ্যেরা এবং আশ্রমবাসী ও গ্রামবাসী শিষ্য ও ভক্তগণ সমবেতভাবে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মাটিকাটা হইতে আরম্ভ করিয়া, মণ্ডপ, ভোগের ঘর, অস্থায়ী কুটীর প্রভৃতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্মাণ করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন যে,—"মহাপুরুষ রুস্তুর শক্তি কর্মিগণের মধ্য দিয়া কাজ করিয়াছিল, সেইজন্য এত পরিশ্রমের কাজ এত অল্প সময়ের মধ্যে ও সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল।" যথাসময়ে ব্রহ্মচারীবাবা সুন্দাইল নিবাসী স্বর্গীয় কালাচাঁদ আচার্য দ্বারা মায়ের মৃন্ময়ীমূর্তি তৈয়ারী করাইলেন। মূর্তির মুখখানি এবং শরীরের গঠন ইত্যাদি যেমন যেমন সেই জ্যোতির্ময়ী মাকে দর্শন করিয়াছিলেন, ঠিক সেইমত আচার্যকে খুঁটিনাটি সব বলিয়া বলিয়া সঙ্গে থাকিয়া বাবা করাইয়া লইলেন। বাস্তবিক কালাচাঁদ আচার্যের নির্মিত মৃন্ময়ী মূর্তির মুখমণ্ডলে কি প্রশান্ত সৌম্যভাব, মৃদুমৃদু হাসি—কি অপরূপ অনন্দময়ী মাতৃমূর্তি! এক সের আতপ চাউল, এক পয়সার ধূপ ও তৈলের জন্য একটি পয়সা সঙ্গে করিয়া দীপান্বিতা তিথিতে বৈরাটি গৌরী-আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মায়ের পূজার্চনা ও প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস থাকিয়া পূজায় যোগদানের জন্য শিষ্যগণের প্রত্যেকেই জানাইলেন।

পূজার ও প্রতিষ্ঠার দিন সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী গৌরী-আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যাকালে মায়ের পূজা ও ভোগের যথারীতি আয়োজন হইল। প্রায় দেড় প্রহর রাত্রি অতীত হইলে

ব্রহ্মচারীবাবা স্বয়ং পূজায় বসিলেন এবং তাঁহারই নির্দেশক্রমে উপস্থিত শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী প্রত্যেকে এক একটি ধূপ ও দীপ জ্বালিয়া পূজার ঘরের চতুষ্পার্শ্বের আঙ্গিনায় উপবেশন করিয়া সকলে ধ্যানস্থ হইলেন। এই সময়ে আশ্রমে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজমান ছিল। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলে গভীর নিশীথে ব্রহ্মচারীবাবা মায়ের আবির্ভাবের জন্য সুগভীর প্রণব ধ্বনিতে মাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণও তখন ব্রহ্মচারীবাবার ধ্বনির সহিত ধ্বনি মিলাইয়া প্রণবধ্বনি আরম্ভ করিলেন। সেই মহাধ্বনি গভীর রাত্রির নীরবতা ভেদ করিয়া অনন্ত আকাশে বিলীন হইতে লাগিল। কিছু সময় অতিবাহিত হইলে প্রণবধ্বনি থামিয়া গেল, আবার নীরবতা ফিরিয়া আসিল। এমন সময় শান্তিদানন্দ নিজ আসন ত্যাগ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে লাগিলেন,—'মায়ের আবির্ভাবের জন্য আমাদের অন্তরের ডাক মায়ের কাছে পৌঁছান চাই, এবং অন্ততঃ একবিন্দু অশ্রুজলেও মায়ের চরণ সিক্ত করা চাই।' মায়ের আবির্ভাবের আকুল আগ্রহে অমনি সকলে মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গভীর নিশীথে সে 'মা মা' রবের উচ্চ কোলাহলে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামবাসিগণ আশ্রমে কোন কিছু ঘটিয়াছে আশঙ্কায় ঐ দিকে ছুটিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। আগন্তুক বহু লোকের ভিড় হওয়াতে সকলকেই নিজ নিজ আসন ছাড়িয়া উঠিতে হইল। ব্রহ্মচারীবাবা তখনও মায়ের প্রতিমার সম্মুখে সমাধিস্থ ছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'মা আসিয়াছেন রে।' তিনি স্বহস্তে উপস্থিত সকলকে চরণামৃত ও নির্মাল্য প্রদান করিলেন। প্রায় দুই মণ আতপ চাউলের নৈবেদ্য, দুই মণ দুগ্ধ এবং ফলমূল মিষ্ট দ্রব্যাদির ভোগ নিবেদন করা হইয়াছিল। লোক সমাগম এত হইয়া পড়িল যে, প্রত্যেকে সামান্য মাত্র প্রসাদ পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তৎপর দিন মধ্যাহ্নে আনুমানিক দশ মণ চাউলের অন্নভোগ লাগিয়াছিল এবং প্রায়

সহস্রাধিক লোক উদর পূর্ণ করিয়া প্রসাদ পাইয়া ছিলেন। এইভাবে ১৩২৬ সনে প্রথম দীপান্বিতা উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

বৈরাটী গৌরী-আশ্রমে দিপান্বিতা উৎসব সমাপনান্তে ব্রহ্মচারী-বাবা কয়েকজন ভক্ত সমভিব্যাহারে বিভিন্ন গ্রামের গৃহস্থ শিষ্যগণের অনুরোধে তাহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে ভ্রমণ করিতে করিতে লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমে শিবচতুর্দশীর কিছুদিন পূর্বে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে কয়েকজন গৃহস্থভক্ত তাহাদের আট হইতে বার বৎসর বয়স্ক কুড়ি পঁচিশটি বালককে ব্রহ্মচর্য আশ্রমোচিত শিক্ষাব জন্য ব্রহ্মচারীবাবার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। তিনি উক্ত বালকদিগকে পাইয়া ব্রহ্মচর্য আশ্রমোচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সিদ্ধাশ্রমে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। খামার-গাঁওয়ের সত্যেন্দ্র রায়, করগাঁও হইতে যোগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র এবং পরে কাওরাইদের মুরারিদার ছেলে সত্যেন্দ্র আসিয়া আশ্রমের বিদ্যালয়ে ভর্তি হইল। ছেলেদের ভরণ পোষণ অতি সাধারণভাবে আশ্রম হইতেই করা হইত।

যথাসময়ে ১৩২৬ সনের শিবচতুর্দশী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা শান্তিদানন্দ, মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ, যোগানন্দ, অবলানন্দ, সবলানন্দ, ও রামানন্দ, প্রভৃতি সংসার ত্যাগী শিষ্যগণের উপর আশ্রম এবং বিদ্যালয়েব ভার অর্পণ করিয়া ১৩২৭ সনের আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর পর গৌরীআশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর আর তিনি কখনও লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমে পদার্পণ করেন নাই।

ব্রহ্মচারীবাবা উৎসবের সময় ছাড়া কোন আশ্রমে বেশীদিন বাস করিতে পারিতেন না; শিষ্য ও ভক্তগণের আগ্রহ এবং অনুরোধে কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা উপবিভাগের গ্রামে গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তিনি যখন যে গ্রামে যাইতেন, স্ত্রী পুরুষ দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইত, এবং প্রত্যহ যেখানে তিনি সেবা করিতেন, ভক্ত ও শিষ্যগণের সমাগমে সে স্থানটি

একটি মহাতীর্থে পরিণত হইত। অনেক সময় দেখা গিয়াছে অসচ্ছল শিষ্যের আগ্রহে তাহার বাড়ীতে ব্রহ্মচারীবাবা ভক্তগণ সহ উপস্থিত হইলেও মহোৎসবের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। এইভাবে পূর্ববঙ্গের এতদঞ্চলে ব্রহ্মচারীবাবার কঠোর তপস্যা ও আধ্যাত্মিক শক্তি-প্রভাবে সর্বসাধারণের মধ্যে একটি অনুপম ভাগবৎ চেতনা এবং উদাব অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রচারিত হইয়াছিল।

এই সময় শান্তিদানন্দ অধ্যাত্ম বিষয়ক মায়াবাদে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ায় ব্রহ্মচারীবাবার উপদিষ্ট সাধনমার্গের চরমযোগ আত্ম-সমর্পণের মাহাত্ম্য বা উপযোগিতা স্বীকাব কবিয়া লইতে পাবলেন না; পরন্তু আহারাদি বিষয়ে অনাবশ্যক কঠোরতা পালন করিয়া এই মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদনেব বৃথা চেষ্টা করিলেন। এদিকে দিবারাত্র অতিবিক্ত পরিশ্রম করাব ফলে ব্রহ্মচারীবাবাব স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া ভক্তগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হন এবং কিছুকাল বিশ্রামের জন্য স্থানান্তবে লইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। গৃহী ভক্তগণেব একান্ত অনুবোধে ব্রহ্মচাবীবাবা লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রম হইতে ১৩২৭ সনে কাঁঠালতলী উপেন্দ্রকিশোব দত্তবায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিলেন। গৃহী শিষ্যগণেব মধ্যে উপেন্দ্রবাবু ছিলেন একজন আদর্শ ভক্ত। ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি ছিল তাঁহার অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস— তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারীবাবাতে সম্পূর্ণ সমর্পিতপ্রাণ। বাবা যে কয়দিন তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেন, সে কয়দিন যেন তাহা নিত্য মহোৎসবে পরিণত হইত।

কোন সময় প্রসঙ্গক্রমে বাবা বলিয়াছিলেন—"উপেন্দ্র আমার সাক্ষী রহিল।" ব্রহ্মচারীবাবার এই বাণীর তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারি উপেন্দ্রদাদার জীবনধারা বিশ্লেষণ করিলে। তিনি ব্রহ্মচারী-বাবার কৃপায় আত্মসমর্পণ-যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন শুধু নিজ জীবনে নহে—স্ত্রী-পুত্রাদিসহ সমগ্র

পরিবারের জীবন-স্তরে। এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয় উপেন্দ্রদাদার স্ত্রী শ্রীমতী পূর্ণশশী দত্তরায়কে লিখিত বাবার পত্রে।

উপেন্দ্রদাদার শেষ জীবনে সাংসারিক কিছুটা অসচ্ছলতা দেখা দিলে ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার স্ত্রীকে লিখিতেছেন—"বর্তমানে যে সকল অভাব অনটন আসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে অধীর হইও না। সর্বদাই মায়ের নিকট প্রার্থনা করিও যে—মা, তোমার সেবা পূজার উপায় কর, যাহাতে চিরকাল তোমার সেবা করিয়া জীবন সফল করিতে পারি।" আরও লিখিলেন—"অভাব বোধ হয় মনের সুখাভিলাষে, ইহাকেই বাসনা বলে। বাসনা নাশ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ চির শান্তি লাভ করিতে পারে না।

ভোগরাগাদি সেবার কার্য এবং প্রত্যহ সাংসারিক অন্যান্য যে সকল কার্য নিত্য করিতে হয়, তাহার জন্যও প্রার্থনা করিয়া মায়ের আদেশ লাভ করিতে তিনি উপদেশ দিতেন। ব্রহ্মচারীবাবার কৃপা-দৃষ্টিপাতের ফলে এই পরিবারটি এমনভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, কোন অভাবকেই আর তাহারা অভাব বলিয়া বোধ না করিয়া মায়ের কৃপার অভাব মনে করিয়া আরও দৃঢ়তার সহিত প্রার্থনাদি করিতেন। এইভাবে সমগ্র পরিবারটি একটি আদর্শ ঈশ্বরার্পিত পরিবাররূপে পরিণত হইয়াছিল। "উপেন্দ্র আমার সাক্ষী রহিল"—বাবার এই বাক্যের এখানেই যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয়।

ব্রহ্মচারীবাবার আগমনে সে সময়ে কাঁঠালতলী এবং তৎপার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ধর্মভাবের এক নব জাগরণ দেখা দেয়। গ্রামে গ্রামে নাম সংকীর্তন, পাঠ এবং ধর্মালোচনার বিপুল সাড়া জাগিয়া উঠে। গচিহাটা, বনগ্রাম, মুমুরদিয়া, মসূয়া, কায়স্থপল্লী, সহস্রাম, বেড়াডি, ধূলদিয়া, পুরুড়া, করগাঁও, নিকলী প্রভৃতি গ্রাম সমূহের শত শত ব্যক্তি ব্রহ্মচারীবাবার দর্শন, স্পর্শন ও সাধন প্রভাবে ধর্মালোচনা এবং সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া যেন এক নব জীবনের আস্বাদ লাভ করেন।

কর্ম্মযোগ ও ভক্তির সমন্বয় সাধক এই সিদ্ধ মহাপুরুষের পুণ্যময় সান্নিধ্যে আসিয়া শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য গচিহাটার ৺হরেন্দ্রনারায়ণ দত্তরায় (নিদানসাধুজী), মহাত্মা ময়ুর মুকুট বাবার শিষ্য ৺নিশীভূষণ দত্তরায়, যোগজীবন গোস্বামীজীর শিষ্য ৺বিধুভূষণ দত্তরায়, দয়ানন্দ স্বামীজীর শিষ্য কাঁঠালতলীর ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত ছয়না নিবাসী ৺দেবেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মুমুরদিয়ার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ তালুকদার ৺প্রাণদাশঙ্কর দত্তরায় প্রমুখ তদঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তৎকালে এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে বিভোর হইতেন। প্রাণদাবাবু প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মভাবাপন্ন থাকিলেও পরে বাবার অশেষ কৃপালাভ করেন, এবং নিজ বাড়ীতে বাবার আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য সেবা পূজা করিতেন। গচিহাটার শ্রীইন্দুভূষণ (ব্রহ্মচারী) ইতিপূর্বেই ব্রহ্মচারীবাবার দর্শনলাভ করেন। একদা তিনি উক্ত গ্রামের নিশাবাবুর গুরুদেব ময়ূরমুকুটবাবার আসনের সম্মুখে বসিয়া প্রার্থনা করিবার কালে এক সূক্ষ্ম বাণী শুনিতে পাইলেন—"ভারত ব্রহ্মচারী এ-যুগের মহামহিম পুরুষ, তোমাকে অন্য কোথাও যাইতে হইবে না।" ইন্দুভূষণ পূর্বে কিছুদিন শ্রীমৎ নিগমানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে ছিলেন। এই বাণী শ্রবণ করিয়া ১৩২৬ সনের ভাদ্র মাসে তিনি লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে ঠাকুর তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। গচিহাটার ৺ভূপেন্দ্রচন্দ্র দত্তরায় অপ্রত্যাশিতরূপে বাবার কৃপা লাভ করেন। তিনি একদা বৈরাটী আশ্রমের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, বাবা তাহাকে কৃপা পূর্বক ডাকিয়া আনিয়া দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করেন। গচিহাটার শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়কে ইতিপূর্বেই ব্রহ্মচারীবাবা কৃপাপূর্বক দীক্ষিত করিয়া কৃতার্থ করেন। শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী এক সময় সঙ্কটাপন্ন অসুস্থ অবস্থায় দীক্ষা গ্রহণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগ্রত হইলে তাহার অনুরোধে শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা তাহার কানে এই মহামন্ত্র প্রদান করেন।

বনগ্রামের বহুভক্ত ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে বিভিন্ন সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিত্য সেবা পূজা ও সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন। এত দীর্ঘকাল পরে সকলের নাম পাওয়া আর সম্ভব নহে। যাঁহাদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হইল সে-সমস্ত এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে:—৺প্রিয়নাথ রায় মহাশয়ের স্ত্রী ৺সুশীলাসুন্দরী রায় ও তৎপুত্র ৺উপেন্দ্রনাথ রায়, ৺যদুনাথ রায় মহাশয়ের স্ত্রী ও বড় মেয়ে, ৺দ্বারিকানাথ নট্ট, শ্রীপরেশচন্দ্র চৌধুরী (বর্তমানে কলিকাতা) ৺পূর্ণচন্দ্র দে ও স্ত্রী, ঐ পুত্র শ্রীপরেশচন্দ্র দে (বর্তমানে সোদপুর বাড়ী), ৺আদিনাথ দের স্ত্রী, ৺শেখরনাথ দের স্ত্রী এবং ৺দীনেশচন্দ্র দে। শ্রীভেজেন্দ্রনাথ রায় (ব্রহ্মচারীবাবা এবং শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত)। বিশিষ্ট কায়স্থ তালুকদার ৺যদুনাথ রায় মহাশয় ব্রহ্মচারীবাবার কৃপালাভ করিবার পর কয়েক বৎসর নিজ বাটীতে আপন পৌরোহিত্যে শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতিতে যথোচিত সমারোহে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করেন। তৎকালে রায় মহাশয়ের এবম্বিধ পূজা পদ্ধতি কাহারও কাহারও সমালোচনার বিষয়ীভূত হইলেও, অনেক স্থলেই এক নূতন আদর্শের ইঙ্গিত দিতে সমর্থ হইয়াছিল। উক্ত গ্রামের ৺সুশীলাসুন্দরী রায় বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত আজীবন সাধন ভজন ও ঠাকুরের সেবার্চনা করিয়া কাটাইয়াছেন। পুত্র বিপ্লবীকর্মী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায় দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এবং উৎসবাদি অনুষ্ঠানের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সকলের সঙ্গে আনন্দের অংশভাগী হইতেন।

গাচিহাটার নিকটবর্তী সহস্রাম, ধুলদিয়া, বেড়াডি প্রভৃতি গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবার অনেক শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। সহস্রামের ৺মহেশচন্দ্র সরকার মহাশয় বাবার নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ছিলেন; বনগ্রাম স্কুলে শিক্ষকতা কার্যের জন্য তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ঢুলদিয়া ও বেড়াতি গ্রামের যে

সমস্ত ভক্ত শিষ্যগণের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হইল, সে সকল এস্থলে উল্লেখ করা হইতেছে:—৺বিষ্ণুরাম মাল, (ইনি ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষাকালে মালনী আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন), ৺হরচন্দ্র নমদাস (বাইন), ৺দ্বারিকা বাইন, ৺গয়ানাথ বাইন, ৺রাখালচন্দ্র সূত্রধর, শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা, শ্রীগোপালচন্দ্র সাহা, শ্রীবৈষ্ণবচন্দ্র সাহা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাহা, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র সাহা, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সাহা, ৺যোগেশচন্দ্র সাহা, শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র সাহা, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সাহা, শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র সাহা। ঢুলদিয়ার ৺মথুরচন্দ্র সাহা একজন ভক্ত ছিলেন, মৃদঙ্গবাদনে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ধুলাদিয়া, বেড়াডি প্রভৃতি গ্রামের বহু ব্যক্তি সেই সময় এই পতিত পাবন মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া নানা-প্রকার সামাজিক কুশাসন ও ধর্মের গ্লানিকর দুর্নীতি হইতে মুক্ত হন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হন।

ব্রহ্মচারীবাবার ধুলাদিয়ায় শুভাগমন বার্তা শুনিয়া নিকটস্থ ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং শ্রীপতি আচার্য প্রমুখ ভক্তগণের নেতৃত্বে এক বিরাট কীর্তনের দল গঠন করিয়া নাম-সংকীর্তন সহযোগে বাবাকে মহানন্দে তাহাদের স্বগ্রামে লইয়া যান। পার্শ্ব-পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসিগণও এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে পূর্ববঙ্গে হিন্দুস্থান-পাকিস্থানের স্বপ্ন মানুষ দেখে নাই—হিন্দু-মুসলমান ছিল ভাই ভাই। ধর্ম, রাজনীতি কিম্বা সমাজনীতি কোন ব্যাপারেই এক ঠাঁই মিলিত হইতে দ্বিধাগ্রস্ত হইত না কেহই। মুসলমানের পীর, দরগা, মসজিদ্ এবং হিন্দুর সাধু সন্ত বা দেবমন্দিরকে উভয় সম্প্রদায়ই অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে জানিত। ব্রহ্মচারীবাবার প্রশান্ত হৃদয়ে যে কোন প্রকার সম্প্রদায়িকতার গণ্ডি থাকিতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। এজন্য তাঁহার মুসলমান ভক্তও ছিলেন অনেক—যাহারা সরলভাবে আপন আপন কথা তাঁহার কাছে নিঃসঙ্কোচে নিবেদন করিতেন, এবং বাবার আদেশ ও উপদেশে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতেন।

ব্রহ্মচারীবাবা নিকলী গমন করিলে গ্রামবাসিগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শ করেন। শ্রীমৎরামানন্দজীর শিষ্য তথাকার ৺সখীচরণ সাহা বাবার একজন পরম ভক্ত ছিলেন। ৺মুরারি-মোহন সাহা, ৺মথুরচন্দ্র সাহা, ৺সুরেশচন্দ্র সাহা, ৺মনোমোহন সাহা, ৺শরৎচন্দ্র নাথ, ৺নিবারণচন্দ্র নাথ, শ্রীপতি আচার্য্য প্রমুখ বহু ভক্ত সে-সময়ে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন।

ভক্তগণের অনুরোধে এবং মায়ের আদেশেই ব্রহ্মচারীবাবা সময় সময় এইরূপ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার এই পল্লীপরিক্রমার মধ্যে এক বিশেষ ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় গ্রামবাসিগণ সর্বদাই লক্ষ্য করিতে পারিতেন। তৎকালে বহু পল্লীগ্রামে নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও দুর্নীতি এবং ধর্মের নামে ব্যভিচারাদি অবলীলাক্রমে চলিত। ঠাকুরের পুণ্য-স্পর্শে বহু গ্রাম হইতে এই সমস্ত পাপাচার চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া ধর্মের সনাতন আদর্শ এবং পল্লী-উন্নয়ন, সমাজ-সেবা জাতীয়-সংগঠন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুন প্রবর্তন ঘটে।

ভক্ত ও শিষ্যগণের ঐকান্তিক আগ্রহজনিত এইরূপ ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হওয়ার পর ১৩২৭ সনের মাঝামাঝি তিনি বৈরাটী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শান্তিদানন্দ ইতিপূর্বেই কাঁঠালতলী গ্রামে আসিয়া ঠাকুরের সহিত মিলিত হন। ঐ সনের দীপান্বিতা তিথিতে গৌরী-আশ্রমে শ্রীশ্রীভারতেশ্বরী মহামায়ার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব, কলেবর পরিবর্তন ও পূজার্চ্চনা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। শান্তিদানন্দ আশ্রমের কোন উৎসবেই অন্তরের সহিত যোগ দিতে পারিলেন না। ক্রমে আশ্রমের সংসারত্যাগী যুবকবৃন্দ শান্তিদানন্দের মায়াবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইল। ফলে সিদ্ধাশ্রমের ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় ও অন্যান্য কার্যে শিথিলতা আসিল। বৈরাটী গ্রামেরও অনেকে শান্তিদানন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইল। এই নব গঠিত মায়াবাদ মূলক অদ্বৈতবাদী দলের মতে কর্ম জ্ঞানলাভের পরিপন্থী

বলিয়া কথিত হইত। ইহাতে আশ্রমের অন্য কাজ তো দূরের কথা, নিত্য সেবা পূজা, ভোগ আরতি প্রভৃতি কাজে পর্যন্ত অমনোযোগ দেখা দিল।

১৩২৭ সনের শেষভাগে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং দেশে তাঁত ও চড়কা প্রচলনের এক হিড়িক চলিতে থাকে। তদঞ্চলের নেতৃবৃন্দ তের চৌদ্দ জন স্বেচ্ছাসেবককে বয়ন-কার্য শিক্ষার জন্য বৈরাটী গ্রাম নিবাসী ৺মতিরাম নাথের নিকট পাঠাইয়া দেন। অন্য জায়গায় সুবিধা না থাকায় স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় গৌরী-আশ্রমেই প্রসাদ পাইতে থাকে।

আশ্রমের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রহ্মচারীবাবা যখন বুঝিলেন যে শান্তিদানন্দ, সরলানন্দ প্রভৃতি যুবকবৃন্দ তাঁহার উপদিষ্ট পথে চলিতে সক্ষম হইতেছে না, তখন তাহাদিগকে পর্যটনে যাইতে আদেশ দিলেন। শান্তিদানন্দও তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী পর্যটনে যাইতে বাধ্য হইলেন। শান্তিদানন্দ সরলানন্দকে সঙ্গে লইয়া গৌরী-আশ্রম হইতে কামাখ্যা অভিমুখে রওনা হইলেন। ব্রহ্মচারী-বাবার লিখিত আদেশ ও উপদেশ অনুসারে ক্রমে মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ, যোগানন্দ, শঙ্করানন্দ, বিরাজানন্দ প্রভৃতিও সিদ্ধাশ্রম হইতে পর্যটনে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবায় পূর্বে সকলেই ব্রহ্মচারীরবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করতঃ ১৩২৭ সনের চৈত্র মাসে পর্যটনে বাহির হইলেন। এই বিদায়ের দৃশ্য তৎকালে বিশেষ বিষাদ-করুণ হইয়াছিল। সুকণ্ঠ গায়ক শান্তিদানন্দ বিদায়ের প্রাক্কালে একটি স্বরচিত সঙ্গীত গাহিলেন :—

অপরাধী বলে চরণে ঠেলে
যেয়োনা ফেলে এ কাঙ্গালে।
জ্ঞানময় গুরু কৃপা কল্পতরু
দয়ালের শিরোরতন ভূতলে॥

প্রেম অবতার জানি তুমি দেব,
দুঃখেরি জীবন আর কারে দিব,
কা'রেবা শুধাব, কা'রেবা বলিব,
স্নেহ ঢেলে আর কে নিবে কোলে ॥
......ইত্যাদি।

ব্রহ্মচারীবাবার হৃদয় ছিল একাধারে বজ্রাদপি কঠোর এবং পুষ্পের চেয়েও কোমল। মায়ের আদেশে শিষ্যদের কল্যাণার্থেই তাঁহাকে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইল। এইসব পোষাপাখীর মত যুবক ব্রহ্মচারিগণকে নিঃসম্বল অবস্থায় কঠোর পর্যটনে পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারীবাবা প্রায়ই নির্জনে একাকী অবস্থান করিতেন। আশ্রমবাসিগণ বলিয়াছিলেন যে, এইসময় ব্রহ্মচারীবাবা প্রায়ই এই গানটি গাহিতেন—"আমার প্রাণ পাখী গিয়াছে উড়িয়া"। জগন্মাতার আদেশেই তিনি এত কঠোর হইতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ কোন মঙ্গলোদ্দেশ্যে মায়ের আদেশ বলিয়াই সকলে তদনুযায়ী কাজ করিতেও বাধ্য হইয়াছিল। এই পর্যটনে ব্যক্তিগতভাবে যোগানন্দের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন লাভে খুবই উপকার হইয়াছিল। অন্যান্য পর্যটকগণও তাঁহাদের দীর্ঘ ভ্রমণকালের মধ্যে বিভিন্নস্থানে অনেক মহাত্মার এবং বাবার অশেষ কৃপা লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার বিস্তৃত জীবন-চরিতে সে সমস্ত কোন সময় উল্লেখিত হইবে আশা করি।

ব্রহ্মচারীবাবা বয়ন-বিদ্যা শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবকদের সুবিধার জন্য বৈরাটী গৌরী-আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেদার সরকার (কুমুদানন্দ) ও সুশীলানন্দকে সিদ্ধাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া আশ্রমের তত্ত্বাবধান ও শ্রীমান্ যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র প্রভৃতির লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা ১৩২৮ সনে মায়ের আদেশে বৈরাটী গ্রামে বস্ত্রবয়ন শিক্ষা প্রদানে বিশেষ মনোযোগ করিলেন। এই শিক্ষাদান কার্যে ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেস কমিটি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া

আড়াই শত টাকা সাহায্য প্রদান করেন। কিছুকাল পরে কংগ্রেস কমিটির সহায়তায় নেত্রকোণা সহরেও তাঁতের কাজ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপে দুই বৎসরে ন্যূনাধিক চারিশত ছাত্রকে আশ্রম হইতে আহার্য ও সুতা খরচ দিয়া বিনা বেতনে তাঁত-বয়ন শিক্ষা প্রদান করিতে আট হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়াছিল। ত্রিশ চল্লিশখানি তাঁত এবং হাসামপুর কেন্দ্র হইতে প্রায় এক হাজার টাকা ব্যয়ে পাঁচশত চরকা তৈয়ারী করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের সদর মহকুমা হইতে আশ্রমবাসী ভিক্ষুগণ দ্বারা ভিক্ষালব্ধ অর্থে এই বিরাট কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

১৩২৮ সনের মধ্যভাগে ব্রহ্মচারীবাবা নেত্রকোণা সহরে কংগ্রেস কমিটির অহ্বানে বয়নকার্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সুশীলানন্দ এবং শ্রীমান্ হরেন্দ্র ও রাজেন্দ্রকে শিক্ষকরূপে পাঠান হয়।

ক্রমে সিদ্ধাশ্রমের ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের ছেলেদিগকেও নেত্রকোণা সহরে পাঠাইয়া দেন। গচিহাটার পূর্ণেন্দুভূষণের ভ্রাতা ৺মণিভূষণ দত্তরায়ও তখন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। সেখানে জনৈক কাব্যতীর্থ পণ্ডিত ও কেদার সরকার (কুমুদানন্দ) তাহাদের শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত হন। নেত্রকোণা জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৺উমেশচন্দ্র ভদ্র মহাশয় এই বিষয়ে খুব উৎসাহী ও সাহায্যকারী ছিলেন। উমেশবাবু বাবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান, এবং তাঁহার প্রিয় কার্যে সাহায্য করিয়া নিজে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। ছাত্রদের তত্ত্বাবধান ও সেবা পূজার সাহায্যের জন্য ব্রহ্মচারীবাবার আদেশ ও উপদেশে সুধীরানন্দ এবং হেমদা তথায় গমন করেন। ইহারা সর্বপ্রথম নেত্রকোণা সহরে দৈনিক পাঁচ বাসায় ভিক্ষা এবং পরে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহেও এই ভিক্ষার প্রচলন করিয়া ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আহারের ব্যবস্থা করেন।

এই সময়ে স্বর্গীয় অজপানন্দ নেত্রকোণার বয়ন-বিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য ব্রহ্মচারীবাবার অনুমতিক্রমে যোগদান করেন। ব্রহ্মচারীবাবা এই সময় নেত্রকোণার অন্তর্গত কালিয়ারা গ্রামের ৺ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন জানিয়া নেত্রকোণা কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট কর্মী ও স্থানীয় খ্যাতনামা উকিল ৺রমেশচন্দ্র রায়, ৺নগেন্দ্রচন্দ্র দে প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় গমন করতঃ ব্রহ্মচারীবাবাকে নেত্রকোণা সহরে আনিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। বহুদিন পূর্বে ব্রহ্মচারীবাবা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে—'নেত্রকোণা প্রচারের দ্বার।' নগেন্দ্রবাবুদের অনুরোধে তিনি নেত্রকোণা সহরে আসিয়া নগেন্দ্রবাবুর বাসা-বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ অনতিবিলম্বেই সহরময় ছড়াইয়া পড়িল এবং আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে তাঁহার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় নগেন্দ্রবাবুর বাসায় উপনীত হইতে লাগিলেন। সেই সময় বয়ন-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানাভাব ঘটিলে, ৺যোগেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে নেত্রকোণার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় চিত্রমোহন সাহারায় মগরা নদীর তীরবর্তী তাঁহার পুরাতন বাড়ীটি এই সৎকার্যের জন্য দান করিতে সম্মত হন।

১৩২৯ সনের প্রথম ভাগে নেত্রকোণা সহরের দক্ষিণে একমাইল দূরে মগরা নদীর তীরে মালনী গ্রামে স্বর্গীয় চিত্রমোহন সাহা রায়ের পতিত বাড়ীতে সহরের বয়ন-বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়। চিত্রবাবুর বিশেষ প্রার্থনায় ব্রহ্মচারীবাবা এখানে শুভ পদার্পণ করেন, এবং তাহার এই পতিত বাড়ীটি দেবোত্তর প্রদান করিলে ব্রহ্মচারীবাবা এইস্থানে চিত্রবাবুর নামে—**"চিত্রধাম আশ্রম"** প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি এখানে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তৎকালে নেত্রকোণার নিকটবর্তী হাসামপুর, লক্ষ্মীগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের শিষ্য ও ভক্তগণের অনুরোধে তাহাদের বাড়ীতেও গিয়াছিলেন।

নেত্রকোণার নিকটবর্তী গঙ্গানগর, শ্রীপুর, হাসামপুর, বাইশদ্বার, লক্ষ্মীগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম সমূহের স্ত্রী পুরুষ অনেকেই ব্রহ্মচারীবাবার মন্ত্র-শিষ্য অথবা ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। এই সমস্ত গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবা বহুবার শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। আশ্রমের বিশিষ্ট কর্মী ও সাধক হেমদার বাড়ী গঙ্গানগর গ্রামে। বাল্যকালেই হেমদা ব্রহ্মচারীবাবার দিব্য সঙ্গ প্রভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বাড়ীতেই সাধনা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মচারীবাবা বহুবার তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, এবং ঐ গ্রামের অনেকে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবে দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করেন। গঙ্গানগরের ৺অমর ডাক্তার বাবার বিশেষ ভক্ত-শিষ্য। এতদঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে ব্রহ্মচারীবাবার উপদেশানুসারে আশ্রমোচিত আসন স্থাপিত ও সদাচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদর্শ প্রতিপালনে হাসামপুরের সরকার পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় নকুলচন্দ্র সরকার মহাশয় ও সুরেশ সরকার মহাশয়ের বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে প্রায় সকলেই ব্রহ্মচারীবাবার মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। তাহাদের বাড়ীতে নিত্য নিয়মিত সেবা পূজা ও ভোগ আরতি এবং আশ্রমোচিত নিয়ম প্রতিপালিত হইত। নকুলবাবুর বাড়ীতে ব্রহ্মচারীবাবা বেদ প্রতিষ্ঠা করেন। ৺অজপানন্দ এখানে নিয়মিত বেদাধ্যয়ন করিতেন। তাহারা গৃহীভক্ত হইলেও আদর্শ গার্হস্থ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকা সকলেই আশ্রমোচিত সদাচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে হাসামপুর তাঁতের কেন্দ্র সুরেশদার বাড়ীতে ছিল। লক্ষ্মীগঞ্জ কাছারির নায়েব ৺মহেন্দ্রচন্দ্র সরকার ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁহার পরিবারের সকলেই ব্রহ্মচারীবাবার মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। দেশের কাজে এবং ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শোচিত পল্লীসংগঠন কার্যে তাহাদের খুবই আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। নায়েব মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী লীলাবতী সরকার ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ

করিয়া বাল্যকাল হইতেই সেবাপূজাদি খুব নিষ্ঠার সহিত করিত। ব্রহ্মচারীবাবাও লীলাবতীকে সাধনায় যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহিত করিতেন। তিনি এই কাছারি বাড়ীতে কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছেন।

লীলাবতীর জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা শ্রীসুধীররঞ্জন সরকারও ঐ সময় ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষালাভ করেন। সুধীরবাবু দেশ বিভাগের পর কলিকাতা চলিয়া আসেন এবং বিরাটী বাড়ী করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতেছেন। তাহার স্ত্রী স্বর্গীয়া যুথিকা সরকার ঠাকুরের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন এবং এই ক্ষেত্রের সাধন লাভ করিয়া বাড়ীতে আসন প্রতিষ্ঠা করতঃ নিয়মিত সাধন ভজন ও পূজানুষ্ঠানাদি করিতেন। সুধীরবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীসুধন্যরঞ্জন সরকারও ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত, বর্তমানে বারাসতে বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন।

ব্রহ্মচারীবাবা নেত্রকোণা চিত্রধাম-আশ্রমে অবস্থানকালে হাসামপুরের স্ত্রী পুরুষ বালক যুবা সকল শিষ্যগণের আত্যন্তিক আগ্রহে এই গ্রামটিকে একটি আর্যোচিত আদর্শ পল্লীরূপে সংগঠন করিবার জন্য অনেকবার তিনি তথায় যাতায়াত করিয়াছেন। তাহাদের সাহায্যার্থে এক সময় কিছুদিনের জন্য যোগানন্দ ও কুমুদানন্দকে ওখানে রাখিয়াছিলেন।

এইভাবে ব্রহ্মচারীবাবা নেত্রকোণা উপবিভাগের পূর্বাঞ্চলে বহু গ্রামে পদব্রজে ও নৌকাযোগে পরিভ্রমণ করেন। খালিয়াজুরী গ্রামের ডাক্তার ৺হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ৺শচীন্দ্রচন্দ্র রায়, ৺মনোমোহনদা (মোক্ষদানন্দ), ৺রজনীদা (বিরজানন্দ) প্রভৃতি শিষ্যগণের বাড়ীতে তিনি গমন করিয়াছিলেন। এইভাবে পূর্ব ময়মনসিংহের সর্বত্র তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল।

১৩২৬ সন হইতে পাঁচ ছয় বৎসর পর্যন্ত তাঁহাকে এইসব অঞ্চলের নানা গ্রামে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। যখন যে গ্রামে যাইতেন সেই

ামে এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে বিশেষ সাড়া পড়িত। লোকে লিত, 'গ্রাম চুক্তি'—অর্থাৎ গ্রামের স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা প্রায় কলেই তাঁহার দিব্য প্রভাব ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া মন্ত্র হণ করিত। সকলেই প্রাণে যেন একটি অনির্বচনীয় নবজীবনের তনা অনুভব করিত। ব্রহ্মচারীবাবা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে, স্ত্রী রুষ বালক বালিকা নির্বিশেষে, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি সকলকেই ার্য আদর্শে বৈদিক ও তান্ত্রিক মতে দীক্ষা দান করিতেন। তিনি হু শিষ্যকে উপনয়ন সংস্কার প্রদান পূর্বক দীক্ষিত করিয়াছেন। াহার কাছে কোনরূপ বর্ণভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বৈষম্য ছিল না। তনি ছিলেন পতিতের, অনুন্নতের, অস্পৃশ্যের পতিত-পাবন, ধমতারণ, মহাপ্রেমিক দীনবন্ধু, করুণার আধার! বিশেষ করিয়া ীলোকদিগের তিনি ছিলেন পরম আপনার জন। স্ত্রী শিষ্যগণ হ্মচারীবাবার নিকট নিজেদের মনের কথা বলিতে পারিয়া হাঁপ াড়িত। এমন কি স্বামীকে পর্যন্ত যে কথা বলিতে পারিতনা, ঃসঙ্কোচে তাহা ব্রহ্মচারীবাবার কাছে বলিয়া শান্তি পাইত। হ্মচারীবাবা তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন যে, দুই একটি সন্তান ইলে পরে যেন তাহারা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধভাবে আর না থাকে; ভাই ান হিসাবে থাকে। সংসারের যাবতীয় কার্য খুঁটিনাটি সমস্ত কাজকর্ম যন ভাগবানের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়, মা'তে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ পূর্বক দাচারী সংযমী হইয়া নিষ্কামভাবে মা'র জন্য ঘর সংসার করিতে ভ্যস্থা হয়। ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেন যে, মেয়েরা উন্নত না হইলে, য়েদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিকাশে সাহায্য া করিলে এই অধঃপতিত জাতি ও সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও ভ্যুত্থান অসম্ভব।

কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা উপবিভাগে ব্রহ্মচারীবাবার প্রায় দশ হস্র মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে চারি পাঁচ জন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সর্বদাই থাকিতেন। তাঁহাদের ও গ্রামবাসীদের সাহায্যে

ভোগ ও সেবাপূজা অতি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন হইত। সেবাপূজা, ভোগ আরতি ও প্রসাদ বিতরণে কোন হট্টগোল বা আড়ম্বর ছিল না। অতি সাধারণভাবে সকল কার্য ও সেবাপূজা সম্পন্ন হইত। ভোগের জন্য সাধারণ চাউলের অন্ন, একটি ডাল, একটি তরকারী বা লব্‌ড়া ও সুক্ত যথেষ্ট। আহুত অনাহুত রবাহুত শত দুইশত ভক্ত, কোন সময় বা আরও বেশী সংখ্যক ভক্ত প্রসাদ পাইতেন। সে কি আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ ভাব, অথচ সকলের শান্ত দিব্য মিলন, যেন এক অনির্বচনীয় উর্দ্ধ-চেতনা ও দেব-জীবনের সমাবেশ হইত। যাহার বাড়ীতে যখন ব্রহ্মচারীবাবা অবস্থান করিতেন, সেই ভাগ্যবান ভক্ত নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তথাকথিত শিক্ষায় ব্রহ্মচারীবাবা শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি কোন বক্তৃতা করিতেন না, কথাও খুব কমই বলিতেন, স্বল্প ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার মধ্যে আমরা ভাবাবেগ দেখি নাই। তিনি ছিলেন কঠোরতপা যোগী, আর্যঋষি সুলভ শান্তস্বভাব সম্পন্ন, মাধুর্যপূর্ণ, মহিমান্বিত, করুণার প্রতিমূর্তি। তাঁহার এই দেবোপম সঙ্গ এবং কৃপা পাইবার জন্য স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অত্যন্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভক্তগণের মধ্যে কখন কে তাঁহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া যাইবেন, সেই আগ্রহে সর্বদা আগ্রহান্বিত থাকিতেন। ব্রহ্মচারীববাকে লইয়া যাইবার জন্য গৃহী শিষ্যদের মধ্যে সর্বদা রীতিমত একটি মানসিক প্রতিযোগিতা চলিত, কে কাহার আগে সে সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিবেন। এইভাবে অত্যধিক পরিশ্রমে এবং আপামর সর্বসাধারণের সহিত সংমিশ্রণে তাঁহার শরীর ক্রমেই দুর্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িল। তিনি পদব্রজে চলিতে আর সমর্থ ছিলেন না, পাল্কীতেও উঠিতেন না। তাই ডুলি বা সোয়ারী করিয়া এবং বর্ষাকালে নৌকাযোগে ভক্তগণের বাড়ীতে যাইতেন। পারতপক্ষে ব্রহ্মচারীবাবা কাহাকেও নিরাশ করিতেন না, যতদূর সম্ভব সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। ভক্তের

অন্তরের ডাক তাঁহার করুণা-বিগলিত হৃদয়কে নিয়তই স্পর্শ করিত। এ প্রসঙ্গে একদিনের ঘটনা উল্লেখ করি।

গচিহাটার শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়ের মাতা স্বর্গীয়া সুখময়ী দত্তরায় একজন ধর্মপরায়ণা একনিষ্ঠা সাধিকা ছিলেন। পুত্রের নিকট তাহার গুরুদেবের কথা শুনিয়া প্রায়ই বলিতেন—"তোর ঠাকুরকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হয়, একবার তাঁহাকে দেখা না।" কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবাকে তাহাদের বাড়ীতে আনিবার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারায় মায়ের মনোবাসনা পূর্ণ করা পূর্ণেন্দুভূষণের পক্ষে বহুদিন যাবৎ সম্ভবপর হইতেছিল না। ব্রহ্মচারীবাবা ১৩২৭ সনের আষাঢ় মাসে লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রম হইতে বৈরাটী গৌরী-আশ্রমে যাওয়ার কালে পথে কাঁঠালতলী, বনগ্রাম ও সহস্রামের ভক্তগণের বাড়ীতে এক দুইদিন অবস্থান করতঃ, একদিন বৈকালে শিষ্য ও ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া গচিহাটা ষ্টেশনে আসিলেন—তথা হইতে সকলে ট্রেন ধরিবেন ইহাই ইচ্ছা। কিন্তু ষ্টেশনের প্লাট্‌ফরমের নিকটবর্তী হইতে না হইতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। বাবা ষ্টেশনের বিশ্রাম কক্ষের বেঞ্চিতে যাইয়া বসিলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূর্ণেন্দুভূষণ ইতিপূর্বে কাঁঠালতলী গ্রাম হইতেই এই কয়দিন ঠাকুরের সঙ্গ করিয়া চলিয়াছেন। তিনিও সে সময় ষ্টেশনে বাবার পার্শ্বেই দণ্ডায়মান। এমন সময় ব্রহ্মচারীবাবা হঠাৎ দাঁড়াইলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—'চল্ তোদের বাড়ীতে যাব।'

অন্তর্যামী ঠাকুর কি সুন্দর একটি ঘটনার সমাবেশ করিয়া মায়ের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ করিতে যাইতেছেন, ইহা চিন্তা করিয়া পূর্ণেন্দুভূষণের শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ষ্টেশন হইতে তাহাদের বাড়ী কোণাকোণি মাত্র মিনিট তিনেকের পথ। সড়কের পথে ঘুরিয়া না যাইয়া সেই সোজা পথে ভক্তগণসহ ঠাকুরকে নিয়া বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলে, এরূপ অভাবনীয়রূপে ঠাকুর

বাড়ীতে আসিয়াছেন দেখিয়া মাতা সুখময়ী মহানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরকে কোথায় বসাইবেন, কী-ভাবে অভ্যর্থনা করিবেন সে-জন্য যেন কিছুটা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঘরের মাঝখানে ছিল একটি ছোট্ট তক্তপোষ, তাহাতে ছিল একটি সামান্য বিছানা। তিনি তাহার উপর তাড়াতাড়ি একটি ধোয়া চাদর পাতিতে যাইতেছিলেন। ঠাকুর সে সুযোগ না দিয়া ততক্ষণে স্মিতহাস্যে ইহার উপরই বসিয়া পড়িলেন। সুখময়ীর প্রাণের সুখ যেন আজ রাখিবার ঠাঁই নাই, গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া আনন্দাশ্রুতে অভ্যর্থনা জানাইলেন, ঠাকুর শিরে তাঁহার অভয় হস্তের স্পর্শে আশীর্বাদ করিলেন। আজ আনন্দ-বিহ্বল সুখময়ীর প্রাণ বুঝিবা গাহিয়া উঠিল—"আজি মোর ভাঙ্গা-ঘরে আসিলে সুন্দর, ওগো অনেক দিনের পর……।"

রাত্রে প্রসাদ গ্রহণের পর ঐ তক্তপোষের উপর ঠাকুরের শোয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাতা সুখময়ী পাশেই মাটিতে পাটি পাতিয়া তাহাতে বসিলেন। প্রায় সারারাত্র উভয়ে ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। পূর্ণেন্দুভূষণ মায়ের পাশেই শুইয়া সব শুনিতেছিলেন। সুখময়ী সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিয়া ছিলেন; প্রাণে নানা জিজ্ঞাসা জাগিত। সুখময়ী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা, মা নাকি আপনার সাথে কথা বলেন শুনেছি,—সে কি রকম?" উত্তরে ঠাকুর সহাস্যে বলেন—"হ্যাঁ, যেমন আপনি আমার সাথে কথা বলছেন, মা-ও আমার সাথে তেমনি কথা বলে থাকেন।" তারপর বাক্যাদেশ বা ভগবদাদেশ কি রকমে পাইয়া থাকেন জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলেন—"যেমন আমরা ঘরে বসে আছি, ঘরের বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে কেহ কিছু বললে যেমন স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়, ব্যক্যাদেশও আমি তেমনি স্পষ্ট শুনতে পাই।" ব্রহ্মচারীবাবার জীবনের এরূপ কাহিনী তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণের স্মৃতির পাতায় হয়ত শতসহস্র জমাছিল, যে-গুলি সংগৃহীত হইলে ব্রহ্মচারীবাবার জীবন-

দর্শন অনুধ্যানের সহায়ক হইতে পরিত; কিন্তু দুর্ভাগ্য, এখন আর তাহার আশাকরা যায়না—পূর্ববঙ্গের উপর দিয়া গত প্রায় তিন দশক রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও সামরিক দুর্যোগের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে সমস্তই নির্মূল। এখন শুধু নতুন সৃষ্টির আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

বোরগাঁওবাসী রাউত ও বিশ্বাস পরিবারের অনেকেই ব্রহ্মচারী-বাবার নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তথাকার ৺বীরেন্দ্রনাথ রাউত, ৺নগেন্দ্রনাথ রাউত, ৺হরিপদ বিশ্বাস, শ্রীগিরিবালা রাউত, শ্রীসুরবালা রাউত, প্রভৃতি শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের আগ্রহে বাবা একবার নৌকাযোগে উক্ত গ্রামে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা বৈরাটী-আশ্রমে যে ছোট কুটীরটিতে থাকিতেন, তাহার চালা ছিল নীচু। কুটীরে প্রবেশ করিতে বীরেন্দ্রদার মাথা প্রায়ই চালায় ঠেকিত। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া পরিহাসচ্ছলে নাকি বলিতেন—"বেটা, তোদের মাথাটা সহজে নয়না (নত হয় না), মাথা নুয়ানর (নত করার) অভ্যাস করাইতেই চালাটা নীচু করাইয়াছি।" কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ—আমাদের মাথা সহজে ভগবৎ চরণে নত হইতে চায় না। আমাদের প্রার্থনা হোক—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার 'পরে।"

১৩৩১ সনের বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীযার দুই একদিন পূর্বে ব্রহ্মচারীবাবা গৌরী-আশ্রম হইতে আমতলা নিবাসী দশরথদার বাড়ীতে যাইয়া অক্ষয় তৃতীয়ায় শ্রীশ্রীভারতেশ্বরী মায়ের পূজার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করেন। অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্বে কারীকর মায়ের মূর্তি নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইতেছে না দেখিয়া দশরথদা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, অক্ষয় তৃতীয়া চলিয়া যাইতেছে, মায়ের মূর্তি এখনো নির্মিত হয় নাই, পূজার কি হইবে?" দশরথদাকে আশ্বস্ত করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন—"মা আমাকে বলিয়াছেন, তুই যে তিথিতেই আমার পূজা করিবে সেই তিথিই অক্ষয়তিথি হইবে।" ব্রহ্মচারীবাবা আরও বলিলেন যে,—

"শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ বিধানগুলি ঋষিরাই প্রবর্তন করিয়াছেন।" দশরথদার বাড়ীতে মায়ের পূজা চতুর্থীতে সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন—"ইহা অক্ষয় চতুর্থী হইল।" অতঃপর তিনি মালনী চিত্রধাম আশ্রমে গমন করেন এবং দিন কতক তথায় অবস্থান করেন।

১৩৩১ সনের বৈশাখেই ব্রহ্মচারীবাবা চিত্রধাম আশ্রম হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। মায়ের আদেশক্রমে সঙ্গে গেলেন ভাগিনেয়ী কুমুদিনী, ভাগিনেয়ী-জামাতা গোবিন্দদা ও ভাগিনেয়ীর কন্যা কুমারী সুমতিবালা। ধীরানন্দ বাবার অসম্মতি সত্ত্বেও নিজ খরচে তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। তাঁহারা নেত্রকোণা হইতে ট্রেনে মুশুলী ষ্টেশনে নামিয়া নৌকায় সিংরৈল যামিনীদার বাড়ীতে যাইয়া দুইদিন ছিলেন। তারপর আবার নৌকায় ব্রহ্মচারীবাবার জন্মভূমি ও সিদ্ধভূমি জগদল গ্রামে পেঁাছিয়া স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সময় যোগানন্দ জগদলে আসিয়া ব্রহ্মচারী-বাবার সহিত মিলিত হন। জগদল হইতে তাঁহারা সকলে হুসেনপুর ও তথা হইতে নৌকায় গফরগাঁও ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেনে কাওরাইদ পেঁাছেন এবং ব্রহ্মচারীবাবার প্রিয়ভক্ত মুরারিমোহনদার বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ১৩৩১ সনের ২৪শে শ্রাবণ কাওরাইদ হইতে ট্রেনে পথে কাশীধামে দুইদিন ও প্রয়াগে একদিন থাকিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনের বেলবনে পেঁাছানর দিন কয়েকের মধ্যেই ধীরানন্দ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। ধীরানন্দ পরে বলিয়াছেন, বৃন্দাবনে লক্ষ্মীমায়ের অঙ্গনে তাহার কোন অপরাধ হয়। ব্রহ্মচারী-বাবা তাহাকে অসুস্থ অবস্থায়ই অতি কষ্টে দেশে লইয়া আসেন এবং তাহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন যে "বেলবনের ব্রহ্মদৈত্যের হাত হইতে ধীরানন্দ রক্ষা পায় নাই। যাহা হোক, মায়ের বিশেষ কৃপায় সে প্রাণে বাঁচিল।"

ব্রহ্মচারীবাবা বৃন্দাবনধামের অন্তর্গত বেলবনে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আঠার দিন হত্যায় থাকিয়া আকুলভাবে

প্রার্থনাদি করিলেন। অতঃপর অহেতুকী কৃপাময়ী শ্রীশ্রীমা-মহালক্ষ্মী তাঁহাকে বলিলেন, **"ভারতের—তথা সমস্ত জগতের মঙ্গলার্থ প্রকাশিত হইব।"** তৎপর আদেশক্রমে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মায়ের ধাতু-মূর্তি এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রস্তরমূর্তি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতঃ বেলবনের মহালক্ষ্মীমায়ের মন্দির সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকৃষ্ণ যুগলমূর্তি লইয়া ব্রহ্মচারীবাবা বৃন্দাবন হইতে আশ্বিন মাসে নেত্রকোণা চিত্রধাম আশ্রমে উপনীত হইলেন। তদনন্তর শারদীয়া পূজার সময় শ্রীশ্রীদশভুজা দুর্গার মৃণ্ময়ীমূর্তি এবং শুভ লক্ষ্মীপূর্ণিমা তিথিতে উপরোক্ত শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী-কৃষ্ণ যুগলমূর্তি তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই সময় হইতে অজপানন্দ ব্রহ্মচারীবাবার শরীর-রক্ষীর মত রহিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন যে, মহালক্ষ্মী মা আবির্ভাবকালে তাঁহাকে অনেক সর্ত করাইয়াছেন। সে-সব সর্ত রক্ষিত না হইলে, যে কোন সময় মা অন্তর্হিতা হইয়া যাইবেন। সর্তগুলি মোটামুটি এই,—ব্রহ্মচারীবাবার শরীর কেহই স্পর্শ করিতে পারিবে না—বিশেষ করিয়া মাদকদ্রব্য সেবনকারী ও অসত্যবাদী তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহার দেহের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া যাইবে। কুমারী মেয়ে দ্বারা মহালক্ষ্মীমায়ের পূজার্চনা ও ভোগরাগ ইত্যাদি করাইতে হইবে,—তাই কুমারী সুমতিবালাই ব্রহ্মচারীবাবার নির্দেশ মত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকৃষ্ণের সেবিকা ছিলেন। নিরামিষ ভোগ হইবে—নানা প্রকার উপাদান ও উপাদেয় দ্রব্য সম্ভারে। বিশেষরূপে নিষিদ্ধ ছিল—আশ্রমে কেহই আমাক খাইতে পারিবে না।

শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীকৃষ্ণ যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠার পর বাবা কয়েক মাস নেত্রকোণার চিত্রধাম-আশ্রমে অবস্থান করেন। এই বৎসরের (১৩৩১) শেষভাগে নেত্রকোণা সহরে জেলা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কিছু জানাইবেন বলিয়া—ব্রহ্মচারীবাবা কুমুদানন্দ দ্বারা **"সত্যযুগাঙ্কুর"** এবং যোগানন্দ দ্বারা

"কংগ্রেস ও পল্লীসংস্কারে আমাদের কথা" পুস্তিকাদ্বয় লিখান। অধিবেশনের পূর্বেই তাহা মুদ্রিত হয় এবং ব্রহ্মচারীবাবার আদেশে অজপানন্দ অধিবেশনে পুস্তিকাদ্বয় বিতরণ করেন।

বৃন্দাবনেই ব্রহ্মচারীবাবার উদরাময় রোগ দেখা দেয়, ইহা আর থামিল না। মাঝে মাঝে জ্বর ও কফে আক্রান্ত হইয়া শারীরিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইত, আবার মাঝে মাঝে একটু সুস্থ থাকিতেন। আশ্রমে যথোচিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা চলিতেছিল না। তাহার প্রধান কারণ আর্থিক সাহায্য আশ্রমে কোনদিনই আসিত না, একমাত্র চাউল ইত্যাদি ভিক্ষার উপরই আশ্রমের ব্যয় মুখ্যতঃ নির্ভর করিত। আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠানে এতদঞ্চলের সর্বসাধারণ অকাতরে আর্থিক সাহায্য দানে কোনকালেই বিশেষ অভ্যস্থ নহে। এমন কি শিষ্যভক্তগণও তেমনভাবে গুরুদেবের আশ্রমে সাহায্য করিতে অভ্যস্থ ছিলেন না। ব্রহ্মচারীবাবার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলির মত দরিদ্র আশ্রম আর কোথাও দেখা যায় না। তিনি নিজে এমনই মা'তে সমর্পিত-চিত্ত এবং এত কঠোরতপা যে, এইরূপ কঠোর অবস্থাতেও নির্বিকার ও উদাসীন থাকিতেন; অথচ সর্বদা সহাস্তবদন, হয়ত আশ্রমে সারাদিন ভোগই লাগে নাই। তিনি কখনও মুখে কাহাকেও এই অবস্থার কথা বলিতেন না। মানুষী চেতনা কতটুকু জাগ্রত হইলে তবে এই শ্রেণীর মহাপুরুষের লোকব্যবহার ধরাযায়, বুঝাযায়, তাহা সর্বসাধারণ কি বুঝিবে? এইভাবে তিলে তিলে তাঁহার এই তপস্যাপূত দেহ এতদ্দেশে বিসর্জন দিয়াছেন। তিনি জানিতেন, শ্রীমার মহাপ্রকাশ হইলে পর দেশের জনসাধরণ সমস্তই জানিবে ও বুঝিবে।

পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, নেত্রকোণার নিকটবর্তী হাসামপুরের সরকার পরিবার সমূহ ব্রহ্মচারীবাবার বিশেষ ভক্ত এবং তাহারা আশ্রমোচিত আদর্শে চলিতে চেষ্টা করিতেন। ইতিমধ্যে তাহারা বাবার উপদেশে উপনয়ন সংস্কারন্তে উপবীত ধারণ পূর্বক দ্বিজাচার

গ্রহণ করেন। বাড়ীতে নিত্যনৈমিত্তিক ঠাকুর পূজা, ভোগাদি নিবেদন ইত্যাদি নিজেরাই করেন। তাহাদের বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে বাৎসরিক দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। পুরোহিত সে পূজা সম্পাদন করিতেন। ব্রহ্মচারীবাবার আদেশ ও উপদেশে স্থির হয়, এবার তাঁহাদের বাড়ীর বার্ষিক দুর্গাপূজা পুরোহিতের দ্বারা না করাইয়া নিজেরাই সম্পাদন করিবেন, ব্রহ্মচারীবাবা পূজার কয়েকদিন পূর্বে শুভ পদার্পণ করিয়া উপস্থিত থাকিবেন। তজ্জন্য মাসাধিকাল পূর্ব হইতে অজপানন্দ ও নকুলবাবু প্রভৃতি পূজাবিধি লিখিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। নেত্রকোণা আশ্রমেও দুর্গাপূজা হইবে। ব্রহ্মচারীবাবা হেমদা ও পিসিমার উপর আশ্রমের পূজার ভার দিয়া ষষ্ঠিদিন সন্ধ্যায় নকুলবাবুর সঙ্গে নৌকায় হাসামপুরে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর কর্তা নকুলবাবু স্বয়ং পূজক, অজপানন্দ তন্ত্রধারক, সুরেশদা মায়ের পূজার সাহায্যকারী, —বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সাহায্যে ও উৎসাহে পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী-বাবার উপস্থিতিতে ১৩৩২ সনের আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা মহাসমারোহে মহানন্দে সম্পন্ন হইল। হাসামপুরের সরকার মহাশয়গণ প্রচলিত প্রথানুসারে পুরোহিত দিয়া পূজাকার্য না করাইয়া নিজেরা পূজা করিয়াছেন—ইহাতে চারিদিকের সমাজে বিপুল সাড়া পড়িল এবং সমালোচনাও আরম্ভ হইল। এইভাবে ব্রহ্মচারীবাবার কঠোর তপস্যা ও আধ্যাত্মিক প্রভাব চতুর্দিকে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

হাসামপুরের পূজাকার্য সমাপনান্তে ব্রহ্মচারীবাবা চিত্রধাম-আশ্রমে ফিরিয়া আসেন এবং হেমদা প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন—"এতদিনে হাসামপুরে আমার ধর্মটা পাতিয়া আসিলাম।"

এবার দুর্গাপূজার সময় ব্রহ্মচারীবাবা কাওরাইদ নিবাসী মুরারি-মোহনদার বাড়ীতে যাইবেন, ইতিপূর্বে এইরূপ কথা হইয়াছিলেন এবং তথায় দুর্গা মূর্তিও নির্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা তথায় উপস্থিত না হওয়াতে পূজা হয় নাই। চিত্রধাম-আশ্রমে লক্ষ্মীপূর্ণিমা উৎসব সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার প্রিয় ভক্ত মুরারিমোহনের

বাড়ীতে গেলেন। গোবিন্দদা ও কুমারী সুমতিবালা সঙ্গে গিয়াছিলেন, এবং হেমদা পরে তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীদুর্গামূর্তি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীরূপে পূজিতা হইলেন। এই পূজা উপলক্ষ্যে উপেন্দ্রচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রমোহন দত্ত, নকুলচন্দ্র সরকার, যামিনীকান্ত কররর্মা এবং প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক দিগেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাওরাইদ মুরারিমোহনের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। মুরারিদার বাড়িতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে ব্রহ্মচারীবাবা এবং তাঁহার বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শিষ্যগণের উপস্থিতিতে খুব আনন্দোৎসব হয়। "ভারত সমাজ গঠন প্রতিষ্ঠানের" ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন এখানেই সম্পন্ন হয়। পূজা ও উৎসব সমাপনান্তে মুরারিমোহনদা ব্রহ্মচারীবাবার শারীরিক দুর্বলতা দৃষ্টে তাহার বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করায় ব্রহ্মচারীবাবা প্রিয় ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমার পূর্ব পর্যন্ত কাওরাইদ অবস্থান করেন। এই সময় বনগ্রামের কবিরাজ রামচন্দ্র দে ব্রহ্মচারীবাবার চিকিৎসা করিতেন। ঢাকায় তাহার ঔষধালয় ছিল। ভক্ত কবিরাজ মহাশয় সপ্তাহে একদিন ঢাকা হইতে কাওরাইদ আসিয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে দেখিয়া যাইতেন। মুরারিমোহন ও তাহার স্ত্রী কুসুমকুমারীর প্রাণপণ সেবাযত্নে ব্রহ্মচারীবাবা অনেকখানি নিরাময় হইয়াছিলেন। এই সময় মোক্ষদানন্দ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পর কাশ্মীর হইতে আসিয়া কাওরাইদে ব্রহ্মচারীবাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে ও আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্যে যোগদান করেন।

১৩৩২ সনের দোল পূর্ণিমার পূর্বেই ব্রহ্মচারীবাবা কাওরাইদ হইতে নেত্রকোণা চিত্রধাম আশ্রমে উপস্থিত হন। দোলযাত্রা সম্পন্ন করিয়া ভক্তগণকে আহ্বান করতঃ আশ্রম, পত্রিকা ও মাতৃভাণ্ডার পরিচালনার জন্য "ভারত সমাজ-গঠন প্রতিষ্ঠান" নামক সমিতি আহ্বান করিলেন, এবং সমিতির হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করতঃ ব্রহ্মচারীবাবা উপদেষ্টা রহিলেন। সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্ত কর্মিগণ পরমোৎসাহে "মাতৃভাণ্ডার"

ও "সোনার-ভারত" নামক মাসিক পত্রিকা পরিচালনা এবং সমাজ-সংস্কারের কার্যে মনোনিবেশ করিলেও ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার পর কিছুকালের মধ্যেই কর্মে শৈথিল্য দেখা দেয়। ১৩৩৩ সনের বৈশাখ মাসে অজপানন্দের সম্পাদনায় "সোনার-ভারত" মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস প্রকাশিত হইলে ঐ সনের ভাদ্র মাসে ব্রহ্মচারীবাবার তিরোধানের পর "মহাপ্রয়াণ সংখ্যা" এবং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয় ইহার শেষ সংখ্যা।

ব্রহ্মচারীবাবা ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র চেতনার আমূল সংস্কার সাধনের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ভাবাদর্শ পাথেয় করিয়া শ্রীশ্রীভারত-সাধন-সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়ের সম্পাদনায় ১৩৬৮ সনের ১২ই শ্রাবণ ব্রহ্মচারীবাবার ৮৮তম আবির্ভাব দিবসে কলিকাতায় "সোনার ভারত"-এর পুনরাবির্ভাব হয়। কিন্তু এ জাতীয় পত্র-পত্রিকা প্রকাশে যেরূপ অর্থসঙ্গতি, ধৈর্য, নিষ্ঠা, নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা ও সহকর্মিগণের আত্যন্তিক সহযোগিতা প্রয়োজন, এস্থলে তাহার নিতান্ত অভাব হেতু পুনরাবির্ভূত 'সোনার ভারত' দীর্ঘজীবী হইতে পারে নাই। ১৩৭৯ সনের বৈশাখে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াই ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

ব্রহ্মচারীবাবার সন্ন্যাসী শিষ্যগণের উপর ছিল মায়াবাদের প্রভাব, এবং গৃহী-শিষ্য ও ভক্তগণের মধ্যে ছিল সামাজিক কুসংস্কারের প্রভাব। পরস্পর এই বিরোধীভাব থাকায় গৃহীভক্ত ও সন্ন্যাসীশিষ্যগণের মধ্যে আন্তরিক মিলন বা মতের সমন্বয় এবং কার্যে সামঞ্জস্য প্রায়ই রক্ষিত হইত না। এমন কি আশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্মে ও ব্রহ্মচারীবাবার সেবা শুশ্রূষায় ভীষণ অমনোযোগ দেখা দিল। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন—**"আমার স্থূল দেহটি তোমাদের একটি সম্পত্তি, ইহাতে হয়ত তোমরা মন দেও না। তোমাদিগকে আমার জানান উচিত যে, শুশ্রূষা ও সেবার অভাবে তোমাদের এই সম্পত্তিটি নষ্ট হইতে চলিয়াছে।"** এই কথার পর অবস্থাপন্ন

গৃহী ভক্তদের মধ্যে দুই একজন ব্রহ্মচারীবাবাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া একান্তে সেবা শুশ্রূষা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা আশ্রম ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। সিংরৈল নিবাসী ৺সুরেন্দ্রমোহন দত্ত আশ্রমে একটী গাভী কিনিয়া দিয়াছিলেন ব্রহ্মচারীবাবার সেবার দুধের জন্য। ৺নকুলচন্দ্র সরকার প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত বাড়ী হইতে কিছু কিছু চাউল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবাকে ঘিরিয়া নিত্য আশ্রমে এত লোক সমাগম হইত যে, আশ্রমের স্থায়ী কোন আয় বা সাহায্যের ব্যবস্থা না থাকায় দৈনন্দিন সেবা পূজা ও অতিথি অভ্যাগতদের সেবার ব্যবস্থা কোন প্রকারে হইত। ব্রহ্মচারীবাবার নিজের সেবার হয়ত যথেষ্টই ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু আশ্রমের স্থায়ী সেবকগণ এবং অভ্যাগত আগন্তুকদের সেবার ব্যবস্থা না থাকায় তিনি নিজের সেবা শুশ্রূষায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেন, কারণ তিনি নিজের সেবার জন্য কখনও স্বতন্ত্র বা বিশেষ ব্যবস্থা মোটেই পছন্দ করিতেন না। এখন যদিও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন তথাপি আশ্রমবাসীদের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা না হওয়ায় তিনি নিজের সেবার বিশেষ ব্যবস্থায় মোটেই পরিতৃপ্ত হইলেন না এবং স্বস্তিও বোধ করিলেন না। এই সময়ে আশ্রমের গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তগণের মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হইতে লাগিল। মোক্ষদানন্দ, যোগানন্দ ও ধীরানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ এসব ভাব-বৈষম্য দেখিয়া—"ভারত-সমাজ-গঠন প্রতিষ্ঠান" ও "সোণার-ভারত" পত্রিকা পরিচালনা প্রভৃতি আরব্ধ কার্যগুলি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে বলিয়া আবার পর্যটনে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারীবাবা উভয় পক্ষের মিলনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিগণের একান্ত অনমনীয় মনোভাববশতঃ ব্রহ্মচারীবাবার উপদেশের মর্ম এবং তাঁহার দিব্য ভাগবত কার্যের মহান্ লক্ষ্য তাহারা বুঝিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারীবাবা অতঃপর নীরব রহিলেন।

সন্ন্যাসিগণের এই প্রকার ঔদ্ধত্য ও কর্মবিমুখতার জন্য আশ্রমে অনেক বার অনেক কাজ আরম্ভ হইয়াও বেশী দিন চলিতে পারে নাই। গুরুবাক্যে নিষ্ঠার অভাব বশত তাহারা কর্মযোগের গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারায়, এবং নিজেদের কর্মবিমুখতা ও অজ্ঞানতার ধারায় চলার মজ্জাগত অভ্যাস হেতু সমাজ-সেবা ও নানা জনকল্যাণকর কার্য আরম্ভ করিয়া পুনঃ পুনঃ সে সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অসীম স্থৈর্য ও ধৈর্যশীল ব্রহ্মচারীবাবা বহুবার সন্ন্যাসীদের এই প্রকার উদ্ধত আচরণ ও বিরুদ্ধ-ভাব সহ্য করিয়াছেন, কখনও কাহাকেও কিছুই বলেন নাই। তিনি ছিলেন মায়ের কোলের শিশু—আনন্দের মূর্ত প্রতীক, সচ্চিদানন্দ। তাঁহার মুখে কখনও রুষ্টভাষা উচ্চারিত হইত না; সন্ন্যাসিগণের এরূপ আচরণে শুধু বলিলেন—"কলির প্রভাব খুবই বেশী।"

ঝুলন উৎসবের সময় পুনরায় সমিতির সভ্যগণকে ডাকিয়া ভারত-সমাজ-গঠন প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা পরিচালনা ও আশ্রমের অন্যান্য কার্যাদি সম্বন্ধে আবশ্যক উপদেশ প্রদান করিলেন। সকলেই মনে করিলেন, বাবার শরীর কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ, বিশ্রাম গ্রহণের জন্যই হয়ত এই ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু তিনি যে এত শীঘ্র চিরবিশ্রামের ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা কাহারও মনে আসিল না। কাঁঠালতলীর উপেন্দ্রদাদা ছিলেন বাবার একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য। বাবার কথা শুনিয়া তাঁহার মনে কেমন একটু খটকা লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা, তুমি কি এখন চলিয়া যাইবে?' উত্তরে বাবা একটু হাসিয়া বলিলেন—'মা বলেন, এই ভাদ্র মাসটা পার হইলে নাকি আরও অনেক দিন থাকিতে হইবে।' উপেন্দ্রদাদা আশ্বস্ত হইলেন, বুঝিলেন বাবা এখনই দেহরক্ষা করিবেন না, আরও দীর্ঘদিন থাকিবেন। অতঃপর প্রয়োজনীয় উপদেশ গ্রহণ করিয়া ভক্তগণের অনেকেই গৃহে ফিরিলেন।

ঝুলন উৎসবের আর ৪।৫ দিন মাত্র বাকি। বাবা বলিলেন—"তোমরা এই 'শেষ-মেশ' ঝুলন উৎসবটি ভাল করিয়া কর।" এত অল্প সময়ের মধ্যে 'ভাল করিয়া' অর্থাৎ একটা বড় রকমের উৎসব করা কিভাবে সম্ভব হইবে, কেহ কেহ ইহা আলোচনা করিতে লাগিলেন। বাবা বলিলেন—"তোরা মায়ের কাছে খুব প্রার্থনা করিতে থাক্‌, সব হইবে।" বাবার আদেশে সকলে কাজে লাগিয়া গেলেন। বাবা অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় বসিয়া উপদেশ দিতেলাগিলেন। দেখা গেল মায়ের কৃপায় উৎসবের দ্রব্যাদি সব কিছুই অনায়াসে সংগৃহীত হইয়া যাইতেছে। বেশ সাড়ম্বরে মহানন্দে ঝুলন উৎসব সম্পাদিত হইয়া গেল। বাবার দেহাবস্থায় ইহাই শেষ ঝুলন উৎসব। ব্রহ্মচারী-বাবার 'শেষ-মেশ' কথার তাৎপর্য কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইল না। তিনি প্রতিবেশী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ী হইতে পঞ্জিকা আনাইয়া একটি দিন দেখিলেন। শ্রীঅম্বিকাচরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি দুই একজন শিষ্য বাবা কিসের দিন দেখিতেছেন, উৎসুক দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিলেন, দেখিলেন, বাবা যেন রাধাষ্টমী দিনটি দেখিতেছেন। অম্বিকা চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা এবার রাধাষ্টমীতে কিছু হইবে কি?" বাবা একটুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিলেন—"হাঁ রে, ঐ দিনটিতে আমি ভাল হইয়া যাইব।" বৃন্দাবন হইতে আসিয়া অবধি বাবা অসুস্থ ছিলেন। ঐ দিনটিতে বাবা সুস্থ হইয়া উঠিবেন জানিয়া সকলেরই আনন্দ হইল।

ব্রহ্মচারীবাবা যে এখন তাঁহার লৌকিক দেহখানি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এরূপ ইঙ্গিত বিভিন্ন সময়ে তাঁহার নানা কথায় প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু শিষ্যগণ তাহা বুঝিয়াও যেন বুঝিতেছিলেন না। দেহত্যাগ করা যে তাঁহার ইচ্ছাধীন, একদা প্রসঙ্গক্রমে অন্যত্র তিনি জোরের সহিতই তাহা বলিয়াছেন। এ স্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন মায়ের কাজ এবং মায়ের কাজে

সহায়তা করাই তাঁহারও কাজ, ইহা তিনি জানিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি তৎকালীন একমাত্র শক্তিশালী স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন ও প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতেন, উপরন্তু তাহাদের কোন কোন ভুল ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহা সংশোধনের জন্যও বিনীতভাবে সময় সময় আবশ্যক মত উপদেশ দিতেন। তিনি সন্ন্যাসী, এ-সব বিষয়ে কেন কথা বলেন, এ-সব কাজ বা চিন্তা কেন করেন, সাধারণ অজ্ঞ মানুষের মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। এরূপ ধারণা নিরসনের জন্য তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৩২৯, ১৫ই বৈশাখ, নেত্রকোনার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী উকিল শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দে মহাশয়কে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। তাহাতে কংগ্রেসের কাজকর্মের নানাত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিদৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং সে-গুলির যথাসাধ্য সংশোধন পূর্বক দেশের কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতে অনুরোধ জানান হয়। তবে এ-সব কাজ তাঁহার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা কর্মিগণের যাহাতে না জন্মে সে জন্য দৃঢ়তার সহিত লিখিলেন,—"আমি সন্ন্যাসী, আমার ভোগবিলাস, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারেনা। বিশেষতঃ এই স্বরাজের জন্য বা স্বাধীনতার জন্য আমার কোন ঠেকা নাই, কারণ আমি সর্বদাই স্বাধীন—আমি কাহারও অধিকারে থাকি না। যেমন ইচ্ছা করিয়া এ জগতে আসিয়াছি, তেমনই ইচ্ছা করিয়া চলিয়া যাইতে পারিব। দেহের সুখ দুঃখ আমাকে আটকাইতে পারিবে না।" দেহত্যাগের প্রায় সাড়ে চার বৎসর আগে তিনি ইহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

১৩৩৩ সনের ভাদ্র মাস। ক্রমে তাঁহার সেই পূর্ব নির্দিষ্ট দিনটি আসিল—২৮শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, রাধাষ্টমী তিথি। আশ্রমবাসী যে কয়েকজন ভক্ত আছেন, তাহারা সকলেই ভিক্ষা বা অন্যান্য কাজে বাহিরে গিয়াছেন। শুশ্রূষাকারিণী আছেন সুমতিবালা, আর দৈবক্রমে

আসিলেন বিষ্ণুরামদা। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, ভাদ্রের খরোজ্জ্ব দিনমনি পশ্চিমদিগন্তের সান্ধ্য আকাশ ক্ষণিকের জন্য আরক্তিম করিয় ধীরে ধীরে ম্লান হইতে লাগিল। মা বুঝি তাঁহার কোলের ছেলে জন্য কোল পাতিয়া বসিলেন! সপ্তমীর তিথি অতিক্রান্ত হইয়া অষ্টমী মহালগ্ন সমুপস্থিত। বাবার প্রশান্ত বদন-মণ্ডল আজ আনন্দে উদ্বেল এ যেন মায়ের কোলের শিশু ধূলাখেলা সাঙ্গ করিয়া এবার মায়ে কোলে ফিরিয়া যাওয়ার আনন্দ! তিনি উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি বিস্ফারি করিয়া একবার কি যেন দেখিয়া লইলেন। উঠিয়া বসিলেন, মাথা বালিশটি দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে রাখিয়া আবার আস্তে আস্তে শয় করিলেন। কয়েকটি মুহূর্ত পরেই সুস্পষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে তিনবার উচ্চা রিত হইল—নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ! শান্ত মুখমণ্ডলের উপ ক্লান্ত আঁখিযুগল ধীরে ধীরে নিমীলিত হইল—ভারতের মহাযোগ মহাসমাধি মগ্ন হইলেন!

নিঃস্পন্দ সোনারকান্তি যোগ-দেহ, স্তিমিত আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন যুগল, সৌম্য প্রশান্ত বদনমণ্ডল. শ্রীঅঙ্গে উদ্ভাসিত ত্রিদিবের স্নি জ্যোতিরাশি! মুহূর্তে এই সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল নেত্রকোনা শহর ও নিকটবর্তী নানাস্থানের লোক দলে দলে আশ্রম প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল। দূরবর্তী ভক্তগণ লোক মারফ বা তারবার্তায় সংবাদ পাইয়া পরদিন আশ্রমে আসিয়া উপস্থি হইলেন—অশ্রুবিগলিত লোচনে এই মহাসমাধিমগ্ন শ্রীঅঙ্গ শেষবারে মত দর্শন করিয়া জীবন কৃতার্থ করিলেন।

ভারত-সূর্যের অস্তগমনে তাঁহার শত সহস্র ভক্ত, শিষ্য ও অনুরক্ত গণের হৃদয়ে শোকের যে বিষাদ-করুণ ছায়া নামিয়া আসিল— পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবার দি করুণা সিঞ্চনে সকলের অন্তর হইতে সে বিষাদ-মলিন ছায় অপনোদিত হউক—আমরা যেন সেই শাশ্বত শান্তির আস্বাদ লা করিয়া ধন্য হই। প্রার্থনা করি—

"হে চির প্রকাশ, তুমি এসো নিরন্তর,
আবির্ভূত হও এসে সবার ভিতর।"

—(০)—

দেহরক্ষার পর ঃ

ব্রহ্মচারীবাবা দেহরক্ষা করিলে সমবেত ভক্তমণ্ডলী আর এক সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। কেহ বলিলেন, এই শ্রীঅঙ্গ আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হউক, অন্য এক দলের অভিমত আশ্রম সংলগ্ন মগড়া নদীর তীরে দাহ করিয়া তথায় তাঁহার পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত মঠ প্রতিষ্ঠা করা সঙ্গত হইবে। পরস্পর দীর্ঘ সময় আলোচনা করিয়াও 'সমাধি' কিম্বা 'দাহ' কোন সিদ্ধান্তই স্থির হইতেছেনা। যাহারা সমাধি দেওয়ার পক্ষে, তাহারা এই শ্রীঅঙ্গে অগ্নিসংযোগের প্রস্তাব সহ্য করিতে পারিতেছেন না। অপর পক্ষ, সন্ন্যাসীর দেহ দাহ করা যাহাদের অভিমত, তাহাদের মধ্যে দুই একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মচারীবাবার পরমগুরু শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার দেহ-সৎকারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ যাবৎ এইরূপ আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় সকলকে বিস্মিত করিয়া এক অভূতপূব ঘটনা ঘটিল। বাবা যে ঘরে থাকিতেন, তাহার সিঁড়িতে বসিয়াছিল কালীয়ারা গ্রামের ৺ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটি ছেলে। সে হঠাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে সজোরে অস্পষ্ট শব্দ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বালকের চিৎকার শুনিয়া সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষিত হইল। বালকটিকে অনেকক্ষণ শুশ্রূষা করার পর তাহার জ্ঞান হইলে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল কি হইয়াছিল তাহার, এরূপ বিকট চিৎকারেরই বা কারণ কি, ইত্যাদি। একটু সুস্থ হইয়া ছেলেটি ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—সে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ দেখিতে পাইল বাবার মুখ হইতে একটা চোখ-ঝলসানো তীব্র জ্যোতি, 'স'-'স' শব্দে বাহির হইয়া আকাশে মিলাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া সে খুব ভয় পাইয়াছে।

বালকটি অজ্ঞান হইয়া পড়িবার পূর্বে যে অস্পষ্ট শব্দ করিয়াছিল তাহার মধ্যে 'স-অ-অ'-রূপ একটি শব্দ অনেকে শুনিয়াছিল। এখন বালকের কথায় আর কোন সন্দেহ রহিল না। সকলেই বুঝিলেন, "সমাধি" দেওয়াই বাবার ইঙ্গিত। এ সম্বন্ধে চিত্রধাম আশ্রমের বর্তমান সেবায়েৎ শ্রীঅম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার পূর্ব রাত্রে তিনিও 'সমাধি' এইরূপ একটি বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন। সমাধি দেওয়ার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং চন্দন দ্বারা বাবার শ্রীঅঙ্গে ও বাক্সটির গায়ে প্রণব অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্রানুযায়ী বিধিমত ব্রহ্মচারীবাবার লৌকিক দেহখানি মালিনী চিত্রধাম আশ্রমে সমাহিত করা হইল।

পরবর্তীকালে ব্রহ্মচারীবাবার সমাধিক্ষেত্র চিত্রধাম আশ্রমে যে সুদৃশ্য মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বাবার দেহরক্ষারপ্রায় ২৫ বৎসর পর তাঁহার অন্যতম শিষ্য অক্লান্ত-কর্মা মধুরানন্দ ব্রহ্মচারীর গুরুনিষ্ঠার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। সমাধি মন্দিরের মনোরম চিত্রখানি এই পুস্তকের অন্যত্র ছাপা হইল। তা'ছাড়া ব্রহ্মচারীবাবা প্রতিষ্ঠিত পূর্ববঙ্গের আরও তিনটি আশ্রমের চিত্রও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

—•—

কল্যাণবাণী : অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক

[স্মারক গ্রন্থের পুরোভাগে শ্রীমদ্‌ভারত ব্রহ্মচারীবাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইল। কিন্তু ইহা তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনী হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। সিদ্ধ মহাত্মাগণের জীবনী অনুধ্যান ও লিখন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিজাত লেখনী হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। ব্রহ্মচারীবাবা ছিলেন জীবন্মুক্ত পুরুষ, সর্বদা চৈতন্যাবস্থায়, অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্বাবস্থায় থাকিয়া জগতে বিচরণ করিতেন— দেহে থাকিয়াও দেহাতীত অবস্থায় মায়ের আদেশে কর্ম যজ্ঞে লিপ্ত থাকিতেন। একমাত্র তদনুরূপ মহাত্মাগণই ইঁহাদের চিনিতে পারেন এবং তাঁহাদের কথা বলিবার অধিকারী।

ব্রহ্মচারীবাবা নানা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার শিষ্য, ভক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তিগণের নিকট যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখিয়াছেন, মুমুক্ষু তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ সে সমস্তের ভিতর দিয়া তাঁহাকে কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এতদুদ্দেশ্যে ব্রহ্মচারীবাবার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্প্রতি "ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী' নামক যে পত্র-সঙ্কলন গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার উপদেশের সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল। মহাপুরুষগণের বাণীই তাঁহাদের জীবনী, তাঁহাদেরে চিনিতে জানিতে হইলে তাঁহাদের বাণীরই অনুধ্যান আবশ্যক।]

শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ দত্তরায়—গচিহাটা

লিখিয়াছ, আমি বলিয়া থাকি "আমি তাঁর হয়ে গেছি।" ইহার অর্থ—'আমি বুঝিয়াছি যে, মায়ের কোলের শিশু আমি, অনন্তকাল কোলে আছি ও থাকিব। আমার জন্ম নাই, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই নাই; আছে কেবল অনুভূতি। মায়ের বিচিত্র লীলা দর্পণের ন্যায় আমাতে প্রতিভাত হয়, অতএব আমি আনন্দ-স্বরূপ, অর্থাৎ আমার কর্তৃত্বাদি গুণ না থাকায় মা আমাকে নির্লিপ্ত, অকর্তা, দ্রষ্টা ইত্যাদি

বলিয়া থাকেন। এই যে তোমরা ভ্রান্তি বশতঃ দেখিতেছ—যেমন আমি হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই, কতকিছু করি, এ সকল আমি করিনা, করেন আমার মা। মা আমার জন্য কতকিছু করেন, তা আর কত লিখিব। মা শুধু আমার আবেগে (আনন্দাবেগে) মা বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাকে ভাবিতে ভাবিতে একেবারে 'আমি' (অহং) হয়ে গেছে।……আমি মায়ের বড় বাৎসল্যের ধন। এই যে শব্দ স্পর্শাদি বিষয় পঞ্চক, কেবল আমার জন্য। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিও আমার জন্য। সৃষ্টি লয়াদি ক্রিয়া আমার জন্য, হাসি কান্নাও আমার জন্য, জন্ম-মৃত্যু আমার জন্য, সুখ দুঃখ আমার জন্য।

শুধু আমার জন্যই নিদ্রারূপের মা, ক্ষুধারূপে মা, তৃষ্ণারূপে মা, ভ্রান্তিরূপে মা, পুষ্টিরূপে মা, ক্ষমারূপে মা, দয়ারূপে মা। আবার আকাশরূপে মা, বাতাসরূপে মা, তেজোরূপে মা, জলরূপে মা। এমনকি কেবল আমার জন্যই মা আমার একেবারে মাটি হয়ে গেছে। এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহাও আমার জন্য। জগৎটা আমার খেলা। যেমন শিশু থাকিলেই লোলাকাঠি, বাঁশি ইত্যাদি খেলনার দরকার হয়, আমি আছি তাই জগৎটাও দরকার। আমার মা আছেন, তাই আমি আছি। আমার মা না থাকিলে আর আমি থাকিতাম না। আমাকে লইয়া মা বাবার নিকট গেলে, আমার আবেগে (আনন্দাবেগে) মায়ের আর অস্তিত্ব থাকে না, আমারও অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থাকে তোমরা নির্বিকল্প বা জড়সমাধি বলিয়া থাক। অতএব তোমাদিগকে বলিয়া থাকি তুমি 'সেই', অর্থাৎ তুমি অকর্তা দ্রষ্টা, শিশুমাত্র।

আরও লিখিয়াছ, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধাদেবী সদ্‌গুরু কিনা, এবার সদ্‌গুরু কে-কে আসিয়াছেন এবং শ্রীভগবান্ এবার কোন্ দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন? এই তত্ত্ব মা আমাকে বলিতেছেন না। এসব বিষয় শ্রীমতী শান্তিসুধা-

দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলে আমার বিশ্বাস তিনি বলিতে সমর্থা হইতে পারিতেন।

আবার লিখিযাছ—আমি সদ্‌গুরু কিনা? ইহা আমি কি লিখিব? আমি শিশু কিনা, তাই নিজেকে ওজন কবিতে পারি না। অতএব নিরুপায় হইয়া আমার মা-বাবারই পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম। ১৩৩০।২।৯, গৌরী-আশ্রম।

শ্রীমান্ শান্তিদানন্দ—সিদ্ধাশ্রম, লক্ষ্মীয়া

(লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমের বেদ-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও সন্ন্যাসিগণের প্রতি) বর্তমান সময়ে এমন কোন টোল বা ইস্কুল নাই বা থাকিবেনা যে, লেখাপড়ার কাজ ভাল চলিতেছে বা চলিবে। আমি পূর্বেও বলিয়া আসিয়াছি, এই দৃষ্টেও তাহাদের এইভাবে থাকা আমার মতে অতি উত্তম।

আমার জন্মের পূর্ব হইতেই আমার গর্ভধারিণীকে স্বপ্নাদেশ বা দৈববাণীর দ্বারা উপদেশ দিয়া ও উপাসনা ও প্রার্থনাদি করাইয়া আনিয়াছেন যে, তুমি এইভাবে চল আর চন্দ্ররূপের উপাসনা কর—'আমি আসিব।' আমি জন্ম লইযাছি পরও গর্ভধারিণীর কার্যকলাপ দেখিতে দেখিতে একটু বড় হইলাম। গুরুকৃপা লাভ করিলাম পর, বাবা শ্রীকৃষ্ণরূপে আমাকে আদেশ ও উপদেশ দিয়া একটু জ্ঞান দিলেন এবং মাকে আনিয়া আমাকে মায়ের কোলে দিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং জানাইলেন—"আমরা আসিয়াছি জগতের মঙ্গল বিধান করিতে।"... .....

জগৎটা মায়ের প্রতিমা। প্রাপ্তবস্তু মায়ের দেওয়া। সন্তোষ মায়ের কৃপা, অসন্তোষ অকৃপা। শান্তি মায়ের অভয় কোল—অশান্তি মায়ের অসির তাড়না। আশীর্বাদ করি তোমরা মায়ের কোলে থাকিয়া মায়ের বৈভবরূপ স্তন পান করিয়া আনন্দ-স্বরূপ হও।—গৌরী আশ্রম।

শ্রীমান্ ভুপেন্দ্রকুমার দত্তরায়—গচিহাটা

লিখিয়াছ,—তোমাদের গ্রামে শ্রীমতী শান্তিসুধাদেবী আসিয়াছেন,

এবং ছেলেমেয়েরা মন্ত্রগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। জানিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। মন্ত্রগ্রহণ সম্বন্ধে প্রাণের টান পড়িলে মন্ত্রগ্রহণ করাইব। মন্ত্রগ্রহণ ও প্রসাদ গ্রহণ একরকম। যেমন প্রসাদ দেখিয়া শ্রদ্ধা হইলেই বিচার না করিয়া অর্থাৎ কোন্ দেবতার প্রসাদ খাইব কিনা এই বিচার না করিয়া গ্রহণ করিবে, কারণ সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক; দেবদেবী তাঁহারই নাম রূপ। তদ্রূপ এই যে দেশে প্রচারকগণ দেখিতেছ, তাঁহারা সকলেই এক ঐশী-শক্তির প্রেরণায় কাজ করিতেছেন। চিত্রধাম, ১৩৩০।৭।২

শ্রীমান্ যোগানন্দ—হৃষীকেশ

৺কাশীধামে যে আদেশ পাইয়াছ, ইহা শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর রূপে বাবারই আদেশ। আর স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ তাহাও ঠিক। ... বুঝিতে হইবে—"গন্তব্যস্থলে যাওয়ার সোজা পথই পাইয়াছ, কেন তুমি হতাশ হইয়া পথহারা লোকের মত অশান্তি ভোগ করিতেছ?"

আর হৃষীকেশের স্বপ্নাদেশের অর্থ এই—"জ্ঞানরূপ ছেলে তোমার কোলে। তাহাকে নিয়া যেখানে যাও, তাহার সুখ শান্তি হইবেই, দুঃখ কেবল তোমারই। তাই জানাইয়াছেন যে, জ্ঞান-রূপ বালক হইয়া, অর্থাৎ কর্তা না সাজিয়া (বালক কোলে না লইয়া) মায়ের কোলে বসিয়া তাঁহার ভালবাসা পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আবদার কর।'

তুমি মায়ের কোলে আছ কিনা, এমন ভ্রম হইলে বুঝিতে হইবে—যে নির্গুণ পরতত্ত্বে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইতেছে এবং যাহা হইতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইতেছে, তিনিই ব্রহ্মযোনি—আমাদের মা। শুধু আমাদের কেন, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেরই মা—...যদি বুঝিতে ভ্রম হয়, তবে স্থানে স্থানে মৎস্বরূপ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের নিকট জানিয়া লইলেও ভাল। ১৩২৮/২১/২ গৌরীআশ্রম।

শ্রীমান্ মোক্ষদানন্দ,—হৃষীকেশ

লিখিয়াছ যে—"আমি এত তীর্থ ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু এ পর্যন্ত মনের মত সঙ্গ মিলিল না।"......

আমি বিস্মিত হইলাম যে, পর্যটনে বাহির হইয়া প্রায় সারা ভারত ভ্রমণ করিয়াও তোমার প্রকৃত সঙ্গ মিলিল না। ইহা তোমার ভুল। কারণ এই যে পুণ্যভূমি ভারত, যাহার তুলনা দিতে এ মরজগতে অন্য কোন স্থান নাই, এবং যে ভূমিতে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপ কোটী কোটী সিদ্ধ মহাপুরুষ ও কত কত অবতারাদি পূর্ণাংশ কলারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাদের সাধনার স্থান লীলাভূমি অনন্ত ক্ষেত্রপীঠে পরিণত হইয়াছে, অদ্য পর্যন্তও তাঁহারা অমরত্ব দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থূলে সূক্ষ্মে বিচরণ করিতেছেন। তবুও তুমি বলিতেছ কিনা যে, তোমার সৎসঙ্গ মিলিল না!

মায়ের আদেশে আমাকে যে সমুদয় তীর্থে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক স্থানেই তীর্থ দেবতার অভয়বাণী পাইয়া আসিয়াছি। আমার সাধনাবস্থাতেও কত দেবদেবী, কত সিদ্ধ-মহাপুরুষ এবং অবতারাদি আবির্ভূত হইয়া আমাকে বর-অভয় প্রদানে অনুরক্ত করতঃ সাধনায় অগ্রসর করাইয়াছেন। তাই লিখি, দ্বৈত-বুদ্ধি বিরহিত হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি নানারূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া দেন।

আর লিখিয়াছ—"আমার যখন সংস্কারগত মলিন বাসনার অভ্যুদয় হয়, তখন স্মৃতিজ্ঞান একেবারেই থাকে না, আর যখন শাস্ত্র আলোচনা করি, তখন মলিন বাসনা থাকে না।"

ইহার কারণ এই যে, কেবল অর্দ্ধ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চাহিলে বা অর্দ্ধ-তত্ত্বজ্ঞান জানিলে এই প্রকার ভ্রান্তি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে জানিতে হইবে মানবের আত্মজ্ঞান লাভ করিবার আবশ্যকতা কি? কেবল দেহাত্মবোধে কর্তৃত্বাদি অহঙ্কার বশতঃ যে কামনা বাসনা, ইহাই জানিবার জন্য আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। জীব আত্ম-স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে নির্লিপ্ততা অকর্তৃত্ব আপনা হইতেই আসে। তাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

এই আত্মজ্ঞান লাভ কেবল আত্মসত্বাকে জানা বুঝায় না,

আত্মশক্তিকেও জানিতে হয়। অর্থাৎ কেবল চৈতন্য-সত্তাকে জানিলে চলিবেনা, চৈতন্য-শক্তিকেও স্থূলে সূক্ষ্মে জানিতে হইবে। আরও বিশেষ-রূপে বলিতে হইলে—আত্মা নির্লিপ্ত, অকর্তা; আত্মশক্তি—কর্তা ভোক্তারূপে সৃষ্টিলয়াদি কার্য সম্পাদন করিতেছে। ইহা বিশেষরূপে জানিতে হইবে। এই বিশেষরূপে জানাকেই পূর্ণজ্ঞান বলে।

……বেদান্ত আলোচনা বরাবরই করিতে হয় না, তাহার মর্ম অবগত হইয়া কেবলা প্রকৃতির লীলা শ্রবণ ও কীর্তনাদি করিতে সতত যত্নবান হও। আর তোমার স্থূল দেহের ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মা ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান শক্তি প্রকাশে যাহা করিতেছেন, ত্রিশক্তির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সর্বদা এই সকল দর্শন করিতে ভুলিও না। যত বিষয় বৃত্তি দেখ, সে-সব তোমার নয়, তোমার প্রকৃতির। ইহা নিশ্চয় জানিবা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতিকে কর্তা জ্ঞান করিবে ততক্ষণের জন্য তুমি অকর্তা থাকিবে।

আবার লিখিয়াছ—"জগৎ বাহিরে হয় নাই, ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত।" তোমাকে কে বলিল যে, ব্রহ্মের ভিতর বাহির সম্ভবে? ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। তবে সাংখ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্লেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য 'প্রকৃতি' 'পুরুষ' বিভাগ করিয়াছেন; সক্রিয় অবস্থাকে প্রকৃতি ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে পুরুষ বলিয়াছেন। ১৩৩০, ৩রা চৈত্র—গৌরা-আশ্রম।

শ্রীমান্ সরলানন্দ—সিদ্ধাশ্রম, লক্ষ্মৌয়া

আধি ব্যাধি পূর্ব কর্ম ফলেই হইয়া থাকে। ইহাতে এত অস্থির না হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা করিবা। এ-সব আপদ বিপদে অধীর হইয়া কোন লাভ নাই বরং ব্যাঘাতই। মনে রাখিও কেবল বাড়ীঘর থাকিলেই যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইয়া থাকে তাহা নহে। যদি তাহাই হইত, তবে বুদ্ধ ইত্যাদি মহাপুরুষগণ রাজত্বাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেন না। তাই লিখি একমাত্র ভগবৎ কৃপা ভিন্ন জীবের আর অন্য উপায় নাই। ধীর স্থির ভাবে উপাসনা করিতে

থাক। ক্রমে পূর্ব দুষ্কৃতি নষ্ট হইয়া অচিরেই শান্তি লাভ করিতে পারিবা।···১৩২৮।১৬।৭—গৌরী-আশ্রম।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য—লক্ষ্মীপুর

আপনার রোগ সম্বন্ধে মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিয়াছেন—ইহা ভবরোগ। শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলাম তবে দুঃখের বিষয় এই, আপনারা সিদ্ধ-মহাপুরুষের বংশধর, এই রোগ না সারিয়া যে সংসারিক কার্য ব্যতিব্যস্ত থাকিতেছেন, ইহা জগতের অশিক্ষারই কারণ।

পূর্বকালে নিয়ম ছিল যে প্রথমে ঈশ্বর লাভ বা চিত্ত-শুদ্ধি করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে। এইজন্য উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করার বিধি।······আগে ঈশ্বর লাভ বা জ্ঞান লাভ করিয়া পরে ঈশ্বরেচ্ছায় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে, কিম্বা সমাজ পরিচালনা (সমাজের নেতৃত্ব) করিবে।

শাস্ত্রে ইহাও আছে যে, ঈশ্বর লাভের পূর্বেই যদি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করা যায়, তবে একটি দুইটি সন্তান হইলে পর পুনরায় বানপ্রস্থ আশ্রমের ভিতর কিম্বা সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর লাভ করিবে, ইহা কিন্তু গৌণবিধি। মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। ঈশ্বর লাভ না হইলে নর-লীলার অধিকারী হওয়া যায় না। পূর্বকালে ঋষিগণ জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিতেন বলিয়াই সমাজ উন্নত হইত। এমন কি রাজেন্দ্রগণের মধ্যেও মহারাজ জনক, অম্বরীষ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বর লাভের পর রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কথা এই যে, সংসারের বিষয়-বিভীষিকা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের দর্শন বাক্য পাওয়ার জন্য বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ১৩২৮।১৯।৯, বুধপাশা।

সিদ্ধাশ্রমের সন্ন্যাসিগণের নিকট—

তোমাদের চিঠি পাইলাম। এই যে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য নিয়া

বিচার, 'আমি সেই' আর 'আমি তাঁহার' ইহাতে সাধক অহং-তত্ত্বে থাকিয়া বুঝিবে যে আমি 'অহং-তত্ত্ব' না, আমি সেই 'পরতত্ত্ব' অথবা আমি সেই 'পরতত্ত্বের'। ইহাতে উভয় বাক্যেরই এক সিদ্ধান্ত লক্ষিত হয়। কারণ আমি তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া যেমন 'তাঁহার' বলিতেছি, তদ্রূপ পৃথকত্ব হেতুই 'আমি সেই' বলিতেছি। 'আমি তাঁহার' বলিতে যেমন স্বগত-ভেদ দৃষ্ট হয়, 'আমি সেই' অর্থেও পৃথক থাকার দরুণ স্বগত-ভেদ দৃষ্ট হয়। অতএব উভয় প্রকারেই 'আমি' 'তিনি' থাকায় অপূর্ণত্ব দোষ হেতু দ্বৈতভাবই প্রতিপন্ন হয়। অদ্বৈতভাব মহতত্ত্বাবস্থায়, এই অবস্থায় 'আমি' 'তিনি' থাকে না। ইহাকে সুধিগণ শুদ্ধ-সত্ত্ব ভাব বলেন, তৎপরাবস্থায় ত কিছুই থাকে না।

সাধক অহংতত্ত্বে থাকিয়া 'আমি সেই' বা 'আমি তাঁহার' যে ভাবেই ভাবুক না কেন, ঐকান্তিক চিত্তে একজ্ঞানে ভাবিতে ভাবিতে যে অদ্বৈতা-বস্থা আসে, তাহা অচিন্ত্য অবিচার্য্য। ..... 'আমি সেই' এই বাক্যেও ভ্রম জন্মিতে পারে 'আমি তাঁহার' এই বাক্যেও ভ্রম জন্মিতে পারে। যিনি ঠিক ঠিক ভাবে একত্বে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে মতভেদ হইবে না।

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্র রায়—নেত্রকোনা

তোমরা সকলেই রীতিমত উপাসনা করিবা। প্রাতে সূর্যোদয়ের পূর্বেই উপাসনার কাজ শেষ করিয়া যাহার তাহার কাজে প্রবৃত্ত হইবা। মধ্যাহ্নে সাধারণভাবে করিবা, সন্ধ্যার সময় ও শুইবার সময় জপ, প্রাণায়াম, মধ্যে মধ্যে পাঁচ হাজার—দশ হাজার জপ ধ্যান প্রার্থনা করিবা।... অতিরিক্ত বাক্যব্যয় করিতে পারিবে না। কেহ কটূক্তি করিলে অতি নম্রভাবে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লইবে। সকলকেই আপন জানিয়া ভালবাসা দিবে। যাহাতে উচ্চভাব নষ্ট না হয় তজ্জন্য সর্বদা চেষ্টা করিবে। অহমিকাই যে নীচপ্রকৃতি তাহা ভাবিয়া নিরহঙ্কারে অপরের নিকট হইতে উচ্চভাব গ্রহণ করিবে। ১৩২ ।২৬৩, গৌরী-আশ্রম।

শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী—তারাচাপুর

লিখিয়াছ—জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ কি? প্রতিমা পূজার উদ্দেশ্য কি? কিরূপে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিবেন?

(১) জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদরূপ সন্দেহ নিবৃত্তিই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। ব্রহ্ম-চৈতন্যই ঘটস্থ অবস্থায় পরমাত্মা। এই পরমাত্মার আত্ম-স্বরূপ ভুলিয়া দেহাত্মবোধ হইলে তাহাকে জীবাত্মা বলে।

(২) বাহিরের প্রতি পদার্থ চিৎ-সত্তা বা চৈতন্যরূপিণী মায়ের বিকাশ জানিয়া উপাস্যরূপে অবলম্বন বা উপাসনা করাকে প্রতীক-প্রতিমা পূজা বলে। ইহাতে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়। চৈতন্য বা ব্রহ্মোপলব্ধিই পূজার হেতু বা উদ্দেশ্য।

(৩) আমার সাধনাবস্থায় কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিবার জন্য মায়ের কাছে আবদার করিয়াছিলাম। মা বলিয়াছিলেন—"এইভাবে উপাসনা করতে থাক্, কুণ্ডলিনী আপনা হইতেই জাগিবে।" তাই লিখি, ক্রিয়া করিতে থাক, কুণ্ডলিনী আপনিই জাগিবেন। ১৩২৯।১৩।৪

গৌরীআশ্রম।

শ্রীমান্ মোক্ষদানন্দ—কাশ্মীর

তত্ত্বমস্যাদি বিচার মানুষেই করিয়াছে। ইহা তত্ত্ববিদ্ ঋষিগণেরই বাক্য। যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। সাধক নির্গুণতত্ত্বে পৌঁছিয়া আবার যখন অহংতত্ত্বে আসিয়াছেন, তখনই বুঝিয়াছেন—"আমি সেই" বা "আমি তাঁহার।" সেই নির্গুণ পরতত্ত্বে না পৌঁছিয়া বলা শ্রুতির অনুমোদন মাত্র, অর্থাৎ শুনা কথা।

শাস্ত্র জানিবার তাৎপর্য এই যে, গুরু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যান্য ঋষিগণও বলেন কিনা। আর জ্ঞান কর্ম ভক্তি—ইহারাও পরস্পর সমান; ইহাতে গৌণ মুখ্য নাই।

......চিত্তশুদ্ধির জন্য যেমন যোগশাস্ত্রমতে অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তি-মার্গের তেমনি অষ্টপাশ ছেদন, এতদুভয়ের ফল কিন্তু একই। মুখ্য উদ্দেশ্য মন স্থির করা।

.........শাস্ত্রালোচনা সাধনার পৃষ্ঠপোষক রাখিয়া স্থির ভাবে ক্রিয়া করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে পৌছবে. ইহাই প্রণালী। ক্রমে সমাধি লাভে পরতত্ত্বে পৌছিয়া স্থিতিলাভ করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়।

গৌরী আশ্রম, ১৩.৯।২৮।৭

শ্রীমান্ শ্রীনাথ চন্দ—লালমা

ব্রহ্মচর্যই ঈশ্বর লাভের একমাত্র সহায়। ব্রহ্মচর্য অর্থে ব্রহ্মে বিচরণ, অর্থাৎ মনকে বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্জগতে স্থাপন বা শূন্যগত করা।

শূন্যগত হইলেই কামনা বাসনা বিদূরিত হয় ও শ্রীভগবানের কৃপালাভের অধিকারী হওয়া যায়।

.........পূর্বে ঋষিরাও কঠোরতা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতেন, তাই তপস্যা করিতে অনেক দিন লাগিত। আমার পরমগুরু শ্রীশ্রীমৎলোকনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ও ফলমূল খাওয়া অভ্যাস করিয়া পরে দুইমাস মাসাহ করিয়াছেন। আর আমার জীব-টাও ছোটবেলা হইতেই কেবল এইরূপ কঠোরতার ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। এই কঠোরতার পূর্বে প্রাণায়ামাদি দ্বারা বায়ু ধারণ অভ্যাস করিতে হয়। ১৩২৯।২৮।৭ গৌরী আশ্রম।

শ্রীমান্ মহেশচন্দ্র সরকার—ধুবড়ী

আমি জানি, একবার যিনি মায়ের কৃপার আভাস অনুভব করিতে পারেন কিংবা আভাস পাইয়াছেন. তাহার আর পতন নাই, অর্থাৎ মা সন্তানকে কোলে লইয়া আছাড় দেন না ; ইহা নিশ্চয় জানিয়া শান্ত থাকিও। বিশেষতঃ ইহা মনে রাখিও যে আমি মায়ের প্রেরিত, তোমাদের জন্যই। মা অবলম্বন ব্যতীত নিজে কিছুই করেন না, আমিও কিছুই করিনা। তাঁহার ইঙ্গিতেই সব হয়। ১৩২৯।১০।৮ চিত্রধাম আশ্রম।

শ্রীমান্ শচীন্দ্র চন্দ্র রায়—লক্ষ্মীগঞ্জ

—মহর্ষিগণের উপদিষ্ট কর্মকাণ্ডের যথাযথ সদর্থ গ্রহণ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হওতঃ মনেন্দ্রিয় জনিত ক্ষণিক সুখ বাসনা পরিত্যাগে ব্রহ্মানন্দ বা বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া জগতে বিচরণ কর, ইহাই আমার ইচ্ছা বা উপদেশ।

…বিদেহ-মুক্তি কি জান? স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন দেহের অতীত (আজ্ঞাচক্রে) থাকিয়া জগদ্‌ব্রহ্মের লীলা দর্শন করা। এই অবস্থায় থাকিলেই দেখিতে পাইবে কেহ কিছু করে না। প্রকৃতি-পুরুষের সান্নিধ্য হেতু সৃষ্টিলয়াদি কার্য সুসম্পন্ন হইতেছে। তাই দেহ থাকিয়াও দেহাতীত অবস্থা।—চিত্রবাম, ১৩২৯।১৭।৮

জনৈক ভক্ত বা শিষ্যকে লিখিত—

মানুষ যতদিন মুক্ত বা স্বাধীন না হইতে পারে ততদিনই দুঃখ যন্ত্রণা অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। দেহ ধারণ করিলে 'আমি দেহ' এই ভ্রান্তি বোধ জন্মে। দেহ মন-বুদ্ধি-চিত্ত; আমি—সৎ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকার, নিরহংকার, সুতরাং কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি গুণ না থাকা হেতু আমি অকর্তা, দ্রষ্টা স্বরূপ থাকায় দেহাদি ক্ষণিক জড় পদার্থের সংযোগ বিয়োগ রূপ গড়া-ভাঙ্গা খেলা জানিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়া জগতে বিচরণ কর। ইহাকেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলে।…ধ্যান-ধারণা-সমাধি মন স্থিরের প্রধান উপায়।

আমিও একাত্মজ্ঞান লাভের জন্য অর্থাৎ একাত্মজ্ঞান হওয়ায় উভয় আশ্রমের লোকদিগের প্রতি দশ বৎসর পর্যন্ত দৃষ্টিপাতও করি নাই। এমন কি গর্ভধারিণী মাতৃদেবীকে ন্যূনাধিক ১২ বৎসর পর্যন্ত বনবাসে রাখিলাম। যদি আমার দেহাত্মবোধ থাকিত তবে তাহা পারিতাম না। এই দ্রষ্টৃত্ব হেতু আমি তোমাদের হাজার হাজার লোকের আদরণীয় হইয়াছি। আমার নিজের দেহবোধ থাকিলে অম্লান চিত্তে আনন্দে

সব দুঃখ বরণ করিয়া লইতে পারিতাম না। ১৩২৯।১১।৯, চিত্রধাম আশ্রম।

শ্রীমান্ কুমুদানন্দ—নেত্রকোণা

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছেলেদিগকে বলিও একটু কঠোরতার ভিতর দিয়া ব্রহ্মচর্যাবস্থায় চলিলে সংযম সাধন করা হয়। এই সংযমই যোগের বা ব্রহ্মচর্যশিক্ষার প্রধান অঙ্গ। আর সংযমের মধ্যে আহার সংযমই প্রধান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমৎ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"আহার টুটিলে টুটে ইন্দ্রিয় বিক্রম"। আমিও বুঝিয়াছি, ইহাতে মন খুব শক্ত-বলীয়ান হয়। তোমাদের দেশটা কিন্তু নিতান্ত অসংযমী—তাই দেশটা মারা পড়িতে বসিয়াছে।··· পাকা সংসারীই হও আর সন্ন্যাসীই হও, সংযম মানবের চিরসাথী। সংযমী পুরুষ যখন যেভাবে যেস্থানেই থাকুননা কেন ; তাহার "স্বদেশ ভুবনত্রয়"। ১৩২৯।১৪।৯, গৌরীআশ্রম।

শ্রীমান্ কুমুদচন্দ্র শীল—নান্দাইল

মাতৃমূর্ত্তিকে সাপিনী বাঘিনী বলা একেবারে অজ্ঞানতা মাত্র। সাপ বাঘ কিন্তু তোমার মনে। মন শব্দ স্পর্শাদি বিষয় পঞ্চকের দ্বারা বাহিরের নানা পদার্থে শ্রীভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য দর্শন করিলে দেহাত্মবোধে ভোগস্পৃহা জাগিয়া ক্ষণিক সুখাভিলাষে কর্ত্তা ভোক্তা হইয়া নানা অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহাই মায়া।·· কামনাই কামিনী। ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিতে করিতে উপাসনা প্রভাবে দেহাত্ম-বোধ নষ্টহইয়া আত্মবোধে স্থিতিলাভ করিলে বাহিরের মনোহারী পদার্থ সকল খেলার খেলনা জানিয়া বস্তুর অনিত্যতা দৃষ্টে গড়া ভাঙ্গাতেও বিচলিত হয় না।

অতএব লিখি ঠিক্‌ঠিক্ ভাবে উপাসনার উপায়গুলি অবলম্বন কর। শ্রীভগবানের শ্রীপদে কর্মাকর্ম অর্পণ করিতে শিখ। ···· মনে রাখিও তুমি দেহ মন চিত্ত বুদ্ধি অহংকারাদি কিছুই নও। তুমি কিছুই কর না। তিনিই সব করিতেছেন, তুমি অকর্তা দ্রষ্টা মাত্র, অর্থাৎ লীলাদর্শনেই তোমার আনন্দ। ১৩২৯।১৮।৯, রাণাগাঁও।

শ্রীমান্ অশ্বিনী কুমার ধর

… …..তুমি জানিতে চাহিয়াছ—(১) উপলব্ধি ও লাভ এতদুভয়ে প্রভেদ কি ? (২) হ্লাদিনী শক্তি লাভ হয় কিরূপে ? (৩) হ্লাদিন্যাভিমানী হওয়া যায় কিরূপে ?

ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন বা বাক্যাদেশ পাওয়াকে লাভ এবং ঐশী শক্তির প্রেরণা অনুভব করাকে উপলব্ধি বলা যায়।

যে শক্তির প্রভাবে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করা যায় তাহাকে হ্লাদিনী শক্তি বলে। দ্রষ্টাই অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাই হ্লাদিন্যাভিমানী (অভিমানী স্বরূপ) অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে দ্রষ্টাকে হ্লাদিন্যাভিমানী বলা যায়। ১৩২৯।১৮।১০, গাভী।

শ্রীমতী লীলাবতী সরকার—লক্ষ্মীগঞ্জ কাছারী

…স্মরণ রাখিও আমি সর্বদাই তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্খী। নিয়মিত জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম ও পূজাদি করিতে ভুলিওনা। উপাসনার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় সাংসারিক কাজ করিও। দেখিও হেলায় খেলায় সময় কাটাইও না। দরকারী কথা ব্যতীত বাহুল্য বিষয়ে বাক্যব্যয় করিও না। ইহাতে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে ও উপাসনায় বিঘ্ন ঘটায়। পিতামাতার উপদেশ অম্লানচিত্তে গ্রহণ করিও।

সাংসারিক কাজ করিতে হরদম (প্রতি শ্বাসে) মনে মনে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও যে, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার পাপ তাপ দূর কর, আমাকে নির্মলা ভক্তি দাও, আমাকে গ্রহণ কর।" এই প্রার্থনা মন্ত্রবৎ স্মরণ রাখিও, দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা নাম না লইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। যদি বল যে, ঘুমাইবার সময় কিরূপে নাম লইব ? ইহার তাৎপর্য এই যে, জাগ্রতাবস্থায় সর্বদা নাম লইতে পারিলে, নিদ্রিতাবস্থায়, স্বপ্নেও দেখা যাইবে। ইহাতেই এক দণ্ডও বৃথা যাইবে না। ….. মানুষ যারা, তারা ঘুমাইব ইচ্ছা করিয়া ঘুমায় না। ঘুমাইবার ইচ্ছা বেহুঁশের

অর্থাৎ তমোগুণী লোকের। দেখিও যাহারা তমোগুণী তাহারা ঘুম ভালবাসে, বাহুল্য বিষয়ে হাস্য কৌতুকে সময় কাটাইয়া ফেলে। ইহাতে মন চঞ্চল হয় এবং কামনা বাসনার বশবর্তী হইয়া শোক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ১৩৩০।১৬।৫, গৌরী আশ্রম।

শ্রীমান্ শঙ্করচন্দ্র সরকার—সুনই

লিখিয়াছ—জ্ঞান ও ভক্তিতে প্রভেদ কি?

প্রভেদ কিছুই নয়। জ্ঞান শব্দে প্রবুদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চয় জানা। ভক্তি শব্দে নিশ্চয় জানিয়া মানিয়া লওয়া অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন হওয়া।

আত্মা—চৈতন্য, অকর্তা, দ্রষ্টা, সাক্ষী মাত্র। আর প্রকৃতি (চৈতন্য-শক্তি) কর্তা-ভোক্তাদিরূপে সৃষ্টিলয়াদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। এই উভয়রূপ জানাকে জ্ঞান, এবং প্রকৃতিকে কর্তা স্বীকার করিয়া মানিয়া লওয়াকে ভক্তি বলে। এই আত্মা ও আত্মশক্তি অভিন্ন হেতু জ্ঞান ও ভক্তি অভিন্ন।

জিজ্ঞাসা করিয়াছ—দৈব ও পুরুষকার এতদুভয়ে প্রভেদ কি? বর্তমানের কর্মপ্রেরণাকে পুরুষকার এবং অতীতের পুরুষকারকে বর্তমানে দৈব বলা হয়। এই কর্মপ্রেরণা বা মূর্তাবস্থাকেই অবস্থা-ভেদে দৈব, পুরুষকার, নিয়তি, প্রকৃতি ইত্যাদি নানা উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

তুমি লিখিয়াছ—ব্রহ্মের বিকাশই জগৎ। আবার প্রশ্ন করিয়াছ, নির্বিকার ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইলেন কেন? ইহাতে বুঝা যায় যে নির্বিকার ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত হইলেন কেন?

জগৎটা ব্রহ্মের বিকার নয়, বিকাশ অর্থাৎ লীলা। যাহা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিপরীত তাহাই বিকার। জগৎ শব্দে গতিশীল, সৃষ্টিলয়াদি ক্রিয়াশীল অর্থাৎ অবস্থান্তর দেখা যায় বলিয়া জগৎ, ইহা ব্রহ্মের স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতির প্রকাশ। ভ্রান্তি বশতঃ

নিজকে (আত্মাকে) ভোক্তা ভাবিয়া কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ কবিব, করিব না এইরূপ ইচ্ছা অনিচ্ছা হইলে তাহাকে বিকার বলে। ব্রহ্ম বা আত্মার নির্লিপ্ততা হেতু ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই, সংকল্প-বিকল্প নাই। ১৩৩০।২।৭—চিত্রধাম।

শ্রীশিবেন্দ্র চন্দ্র রায়—দশহাল

তোমার প্রশ্ন এই যে—মানুষ মৃত্যুর পর এবং পরজন্মের পূর্বে নিজেকে কিরূপ আকার বিশিষ্ট মনে করে?

অসিদ্ধ অতত্ত্বজ্ঞ বদ্ধ মানুষের স্থূল দেহ নাশেব পর এবং পর-জন্ম ধাবণেব পূর্বে নিজেকে বহির্বায়ু হইতে পৃথক একখণ্ড বায়ুবৎ মনে করিয়া থাকে, এবং প্রকৃতি অনুযায়ী ইচ্ছামত জ্যোতির্ঘন হইয়া বহু রূপ ধারণ করিতে পারে, এবং নিয়মিত কাল অন্তে বাসনা অনুযায়ী আবাব জন্ম গ্রহণ—অর্থাৎ আবার স্থূলদেহ ধারণ করিয়া থাকে। আর সিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ মুক্ত মানুষগণের মধ্যে মৃত্যুব পর কেহ মুক্তির বিধান অনুসারে যথাসম্ভব অবস্থিতি বা বিচরণ করিতে পারেন, এবং তিনি জানেন যে, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহের অতীত তিনি, প্রাণবায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ তাঁহার অবলম্বন মাত্র। কিন্তু বাসনার লেশ থাকিলেও নির্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে পারেন না।

এই তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবৎ কৃপায় নির্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া দ্রষ্টা অবস্থায় লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন; তখন ভগবৎ ইচ্ছা এবং তাঁহাদের ইচ্ছা অভিন্ন। এই ভাগ্যবান্ পুরুষগণের জন্মমৃত্যু নাই। দরকার বশতঃ নানারকমেই জগতে বিচরণ করিতে পারেন। তাঁহাদের গতিও গোলোক হইতে ভূলোক পর্যন্ত। ১৩৩০।২২।৯—গৌরীআশ্রম।

জনৈক ভক্তের নিকট—

লিখিয়াছ—জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদ কি? অথবা পরমাত্মা ও জীবাত্মায় প্রভেদ কি? বন্ধন ও মুক্তি কি?

জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদরূপ সন্দেহ নিবৃত্তিই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। তোমারই বন্ধন তোমারই মুক্তি। তুমি স্থূলে আসিয়া সূক্ষ্মতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা তোমার মনে নাই। অভিমন্যুর মত এই দেহরূপ ব্যূহে প্রবেশ শিখিয়াছ, বাহির হইবার কৌশল জান না। তাই তোমার দুর্বোধ্য কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপু সংগ্রামে তোমাকে জর্জরিত করিতেছে। তুমি নিজেকে সামলাইতে পার না, এই সুখ দুঃখের তাড়নায় অস্থির, তাই তোমার বন্ধন। একটা চৈতন্য অবস্থা অর্থাৎ সুষুপ্তি বা নিদ্রার পর যে চৈতন্য হইল, এই চৈতন্যেরই ভাব। এই চৈতন্য আর মহদ্‌ভাব অর্থাৎ এই যে 'আমি তুমি' বিরহিত যে ভাব, সেই পর্যন্ত কারণ-দেহ। জীবন্মুক্ত মনীষিগণ এই কারণ-দেহে থাকিয়া পার্থিব বিষয় ভোগ করিতে পারেন বলিয়া, অথবা ইহার অতীত অবস্থায় গতি আছে বলিয়া বন্ধন নাই।

এই যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে স্থূলদেহ, ইহাতে তুমি হংস বাহনে আছ। তুমি তোমার অহংকারকে (অহংতত্ত্বকে) আশ্রয় করিয়া মনের সাহায্যে নানা ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাক, ইহাই তোমার সূক্ষ্মদেহ। তারপর এই কারণ-দেহ জানিতে হইলে স্থিরচিত্তভাবে বুঝিতে হয় অহংতত্ত্বের স্বরূপ 'আমি'-জ্ঞান, এই আমিকে বুঝিতে হইলে 'আমি' জ্ঞান দূর হইয়া একটা স্থিরভাব আসে, এই স্থিরভাবে "আমি তুমি" থাকে না, একটা ভাব থাকে মাত্র—ইহাকেই মহদ্‌বস্থা বা মহদ্‌ভাবও বলা যায়। এইজন্য ইহাকে মহত্তত্ত্ব বলে। তাহার পর আরও স্থির হইতে পারিলে ভাবও থাকে না—কিন্তু এই স্থিরাবস্থা নিদ্রাতেও হয়, ইহা তোমার আমার অজ্ঞাতসারে হইয়া যায়। এই যে স্থির হয়, কেবল অহংতত্ত্বে ডুবিয়া থাকে, ইহাকে সুষুপ্তি বা সুনিদ্রা বলে। অহং-তত্ত্বে ডুবিয়া থাকে বিধায় প্রাণবায়ু অবলম্বনে আছে—স্থির হয় না, কারণ নিদ্রিতাবস্থায় সূক্ষ্ম-দেহ ছাড়াইতে পারেনা, তাই অজপা বন্ধ হয় না। উপাসনা প্রভাবে জ্ঞাতসারে মন স্থির করিলে, সূক্ষ্মদেহে অতীত হইলে, অজপা বন্ধ হইয়া যায় এবং কারণ-দেহের অবস্থা অবগত

হওয়া যায়। মোটকথা এই সময়ে চৈতন্য থাকে বলিয়া চৈতন্য-সমাধি বলে। তারপর তুরীয় বা তুরীয়াতীত অবস্থা, ইহা বলিবার নয়।

এককে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া কেহ পঞ্চকোষ বলে, যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। অন্নের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় তাহাই অন্নময় কোষ। প্রাণের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সাহায্যে আছ বলিয়া, অর্থাৎ যতক্ষণ থাক—অর্থাৎ প্রাণবায়ুই প্রাণময় কোষ। প্রাণবায়ুর অতীত অর্থাৎ প্রাণবায়ু হইতে পৃথক হইয়া মনের আশ্রয়ে বিচরণ করিতে পারে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় প্রাণবায়ু থাকিলেও, তুমি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পার, ইহাই মনোময় কোষ। এই অহংতত্ত্ব অতিক্রম করিবার সময় জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রার মত ভুল হয় বা ভ্রম অবস্থার পর জ্ঞান হয় অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাবস্থা হয়। পূর্বোক্তোবস্থায় আমি জ্ঞান বিরহিত ভাব হয়, ইহাকেই কারণ-দেহের অন্তর্গত জ্ঞানময় কোষ বা চিন্ময়াবস্থা বলে। অর্থাৎ খাঁটি চৈতন্য অবস্থা।…এই জ্ঞানময় কোষের পর বিজ্ঞানময় কোষ—এই তোমার মুক্তির সোপান। উপাসনা প্রভাবে তোমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার নাম মুক্তি। ১৩২৯।১৪।৪,—গৌরী-আশ্রম।

জনৈক ভক্তের নিকট—

শ্রীশ্রীতারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ ব্যাপারে যোগ দিতে লিখিয়াছ। আমিও বুঝিতেছি যে, সত্যধর্ম রক্ষা করিতে হইবেই এবং তদনুযায়ী সত্যাগ্রহেও প্রাণপণে যোগ দেওয়া একান্ত কর্তব্য। ময়মনসিংহ কংগ্রেস হইতেও একখানা চিঠি আসিয়াছিল। কিন্তু এখনও মা আমাকে যোগদিতে বলিতেছেন না বিধায়, তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় আছি। মায়ের ইচ্ছা ব্যতীত আমি নিজে কিছুই করিতে পারি না।

কোন চিন্তা করিও না, ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে কলি নিগ্রহ হইবে। বিশেষতঃ ধর্মমন্দিরগুলি আমাদের আদর্শ স্থল—মানুষ তৈয়ার করিবার কারখানা। এগুলির সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত সমাজের উন্নতির আশা নাই। ১৩৩১।১২।৩

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—লক্ষ্মীয়া

[পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীবাবা যোগানন্দকে যে চিঠি দেন তাহাতে তাহাকে সাধনায় নিবিষ্ট করাইবার জন্য আবশ্যকমত উপদেশ প্রদান করিয়া লিখিয়াছিলেন—"যদি বুঝিতে ভ্রম হয়, তবে স্থানে স্থানে মৎস্বরূপ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের নিকট জানিয়া লইলেও ভাল।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় ত্রিকালজ্ঞ শব্দের প্রতিবাদ করায় তাঁহাকে এই পত্র লিখিত হইয়াছিল।]

কোন ব্যক্তিবিশেষকে সত্যবিষয়ে আদেশ বা উপদেশ দিবার প্রয়োজন হইলে তাহার উন্নতিকল্পে, সত্যকথায় কাযে অনুরক্ত করিবার জন্য যে নিশ্চয়াত্মিকা বাক্য আসিবে তাহা কর্ত্তৃত্বাভিমান-জনক বাক্য হইলেও ইহাকে অহংকার বলা যায় না; কেননা উহা সত্য বাক্য—তাহারই মঙ্গলার্থে। ইহা সৎস্বভাবা প্রকৃতির ধর্ম। আর অসত্য, অকারণে এবং যথাযথ প্রকাশ করিলে ইহাকে অহংকার বলে, অথচ ইহাই অসাধুতা। স্থল বিশেষে, কার্যভেদে সত্য গোপন করিলেও অসাধুতা প্রকাশ পায়। তবে ইহা অন্যের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হইলে ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে বলিয়া, অহংকার ভাবিয়া লওয়া উচিত হইবে না। ১৩।৯, কাওরাইদ।

শ্রীমান্ মোক্ষদানন্দ—হৃষীকেশ।

শুনিতে পাইলাম যতীন্দ্র (যোগানন্দ) নাকি সিদ্ধিলাভের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে।……ঈশ্বর কি সিদ্ধি করা যায়? তাঁহার কৃপার দ্বারাই সিদ্ধি হয়। গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানে, তাঁহার আদেশই ঈশ্বরের আদেশজ্ঞানে পালন করিলেই ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয়। তোমরা মনে রাখিও—"যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বরী তাঁরও বাবা আমি।" কারণ আমার আদেশ পালনই তোমাদের সাধন, অর্থাৎ তোমরা যাহারা আমার নিকট আসিয়াছ, তাহাদের সিদ্ধি আমার হাতে। যা'হোক, আমার কথায়ও হবেনা, তোমাদের ভাবও চাই। কারণ গুরুতে অভক্তি অবিশ্বাস আসিয়া অনেক সাধক লাঞ্ছনা ভোগ করে। আমাকে

তোমরা স্বতন্ত্র ভাব, আর না ভাব, আমার বাক্য ভগবৎ বাক্য।
১৩২৭।৭ মাঘ, গৌরী-আশ্রম।

কয়েকখানি পত্রের শ্রেষ্ঠাংশ—

জগতের মূল কারণ আনন্দ। ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত সকলেই কেবল আনন্দই চায়, তবে ভ্রান্তি বশতঃ একাত্মজ্ঞান অর্থাৎ এক আত্মারই যে বিকাশ এই জ্ঞান না থাকায় দেহাভিমানী হইয়া ক্ষণস্থায়ী ধ্বংসশীল দেহাদি জড় পদার্থে নিত্যতা বোধে অর্থাৎ আত্মার নির্গুণত্বে বা নিরাকারত্বে ভ্রান্তি জন্মিলে কর্তা, ভোক্তাদি ভ্রান্তি বোধ করিলে অকর্তা দ্রষ্টা জ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় ক্ষণস্থায়ী দেহাদি জড় পদার্থে চিরশান্তি লাভের আশায় উপভোগ করিতে যাইয়া ইহার বিনাশে ততোধিক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

"এই যে দাম্পত্য-প্রেম ইহা দেহলক্ষ্যে নয়, শুধু আত্মালক্ষ্যে, কারণ মৃতদেহে মানুষের ভালবাসা থাকে না। যৎক্ষণ দেহে আত্মার বিকাশ রূপ প্রাণশক্তি বর্তমান থাকে ততক্ষণ তাহার সহিত ভালবাসা বা সম্বন্ধ। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সেই সুখ-স্বরূপ আত্মার বিমলানন্দই ইহার মূল কারণ। এই আনন্দভোগের মূল স্থান হৃদয় হইতে নেত্র পর্যন্ত এবং হৃদয়েই ইহার সম্পূর্ণ বিকাশ। সুখ হইলেও বুকে লাগে দুঃখ হইলেও বুকে অনুভব হয়।"

"কেবল জড়ের উপাসনাকেই দ্বৈতজ্ঞান বলে, অর্থাৎ যজ্ঞ ব্রত ও পূজাদি দ্বারা স্বর্গাদি সুখ লাভের কামনায় দেবতাদির যে অর্চনা হয় ইহাই দ্বৈতবাদ।

আর ঈশ্বর অথবা আত্মজ্ঞান লাভের আশায় চিত্তশুদ্ধি বা পাশছেদন অথবা ত্রিতাপ জ্বালা দূর করণার্থ ঈশ্বর, ব্রহ্ম অথবা আত্মার উপাসনাকে অদ্বৈতবাদ বলে। অথবা যে উপায়ে জরা-মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সৃষ্টি লীলার অধিকারী হওয়া যায় বা যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে।

দ্বৈতবাদী বলেন যে, জগৎ নিত্য স্বর্গাদিও নিত্য এবং দেবতার উপাসনা দ্বারা অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়।

অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ অনিত্য স্বর্গাদিও অনিত্য অর্থাৎ পরিবর্তনশীল—ইহা জড়। স্বর্গলাভাদি সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং অদ্বিতীয় চৈতন্যই নিত্য ও অপরিবর্তনশীল। জড় চৈতন্যেরই বিকাশ মাত্র, যেমন আমি তুমি বোধ মিথ্যা, তেমন জগৎ বোধও মিথ্যা।

আমি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অনাত্মা বা দ্বৈতবোধ শব্দটি ভ্রান্তি মাত্র, অর্থাৎ অজ্ঞানের বাক্য। কারণ জ্ঞানীগণ জানেন যে সর্বভূতেই আত্মা বিরাজমান। ঋষিগণের দেবার্চনার বিধি করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সূক্ষ্মদেহীগণ মানবকে সৎপথে চলিবার জন্য সাহায্য করিবেন। যেমন আমরা সৎ হওয়ার জন্য গুরু বা সৎলোকের অর্চনা বা সঙ্গ করি, আর অসৎপ্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষকেও আদর করিয়া থাকি। এই সূক্ষ্মদেহীদের মধ্যে দেবতা ও উপদেবতা আছেন, অর্চনাতে ইহারা সন্তুষ্ট হইয়া এই পথে অর্থাৎ সৎ হইবার পথে সাহায্য করেন।

আর এই যে "ধনং দেহি পুত্রং দেহি" বলিয়া অর্চনা ইহা অজ্ঞানের স্বভাব, কারণ ধনজনাদি লাভ কর্মের ফল, অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে সদ্‌ভাবে চলিলে জীবিকা নির্বাহার্থে যাহার যতটুকু দরকার তাহার তাহা আসিবেই।'

'তুমি সেই' (আত্মা) তাই অকর্তা। তোমার প্রকৃতি দুই প্রকার অর্থাৎ দুইটি অপরা (জৈব বা জীবভাব) ও পরা আত্ম-প্রকৃতি বা আত্মভাব। জৈব ভাব দেহগত অর্থাৎ এই দেহের জন্য শোক দুঃখাদি বোধ, ইহা অহংতত্ত্বে (আমি দেহ বোধে) আমি করি বোধে হয়।

ইহার (জীব ভাবের) অর্থাৎ আমি দেহ এইভাব হইলেই এই দেহগত সুখের জন্য কাম, ক্রোধাদি ছয়টি আর নিন্দা ঘৃণাদি বৃত্তি আটটি দ্বারা আত্মভাব আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ইহার কারণ আত্মাতে জড় বোধ অর্থাৎ আমি মনেন্দ্রিয় এই বোধ, যতক্ষণ তোমার জ্ঞান থাকিবে যে 'আমি চৈতন্য' অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ ততক্ষণ উপলব্ধি

হইবে যে, আমি দর্শন করি না, অর্থাৎ ব্যুত্থানে বহির্জগতে কি হইতেছে তাহা আমাতে প্রতিভাত হয় (ছায়া পড়ে, তাহা আমি ঈক্ষণ করি) তাই আমি সাক্ষী বা দ্রষ্টা।

আমি কর্তা নহি, দাস নহি, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার আকাশাদি পঞ্চভূত, শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, ইহার কিছুই আমি নহি। আমি সর্ব প্রকাশক। আমি করিনা এমন কি আমি অনুভবও করিনা, আমার অনুভব হয় অর্থাৎ আমাতে প্রতিভাত হয়। তাই আমি নির্গুণ নির্বিকার জ্ঞান স্বরূপ।

আমার পরাপ্রকৃতি শান্ত (সদা সন্তুষ্ট), তাই উগ্রতা নাই। সদা সন্তুষ্ট তাই মাধুর্যভাবে হেয় বোধ নাই। প্রতীক প্রতিমূর্তিতে (জড়ে) আমি সর্বব্যাপী, তাই সর্বভূতে চৈতন্য প্রতিভাত হয়। আমি চরাচর ব্যাপী, তাই প্রকৃতি আমাকে (আত্মাকে) ভক্তি করে। আমি কিছু করি না। আমার ভাব (প্রকৃতি) সৎ, তাই ব্যুত্থানেও ক্ষমাদি গুণ থাকাতে জগৎটাকে পদার্থ দ্বারা অর্চনাদি করিতেও সন্তোষ থাকে।

দয়া দাক্ষিণ্য, ভক্তি বাৎসল্যাদি ভাবই প্রকৃতভাব, তাই ইহাকে পরাপ্রকৃতি বলে অর্থাৎ পরাপ্রকৃতি নিত্য অবিনাশী।

অশ্রদ্ধা অভক্তি নিন্দা ঘৃণা ও হিংসাদি ভাবসমূহকে অপরা-প্রকৃতি বলে, কারণ ইহা ধ্বংসশীল, অনিত্য, অসৎ।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দত্ত—সিংরৈল

তাঁহার (দিগ্‌দাইরের শ্রীযুক্ত রমণীবাবুর) এই কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে পারিব না যে, বাংলার সাধুদিগের দ্বারা দেশের খুব ক্ষতি হইয়াছে। বরং বাংলার বহু স্থানে হিন্দু সমাজের অন্য প্রদেশের ন্যায় ধর্মান্তর গ্রহণ করা কম হইতেছে।

এই যে অবনী রায় (অবনী সাধু), তিনির যেমনই হউক, তাঁহা দ্বারা এই অঞ্চলের সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকগুলি অনেক আনন্দ উৎসাহ ও একতায় উন্নত হইয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ (ঠাকুর দয়ানন্দ)

—ইনির কীর্তন প্রচার ও আচণ্ডালে সমতা (এক পংক্তি ভোজনাদি করা) দেখিয়া নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর ম্লেচ্ছাচারী শিক্ষিত সমাজও সত্যপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুর কীর্তন ও অমায়িকতার প্রভাবে সে অঞ্চলের অন্যান্য সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বনুয়া বাগদী অশিক্ষিত সমাজগুলিকে কত রকমে উন্নত করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। মোট কথা এইরূপ ভাবে খণ্ড খণ্ড ধর্ম সম্প্রদায়দিগের দ্বারা দেশের যত কাজ হইয়াছে বা হইতেছে, এরূপ কাজ করিতে দাম্ভিক শিক্ষিত সমাজের অনেক যুগ বা অনেক জন্ম লাগিবে। ···ইহাদের প্রভাবে গোঁড়া হিন্দু সমাজের অবিধিযুক্ত গোঁড়ামির প্রভাব খুব দুর্বল হইয়াছে।

সেদিনের কথা—কেন্দুয়ার নিকট আমতলা গ্রামের দশরথ নামক একজন নমশূদ্রকে পূজার্চনার বিধি দিয়াছিলাম। সে বাড়ীতে মূর্তি স্থাপিত করিয়া ঘণ্টাবাদ্য সহকারে পূজা করিত বলিয়া এতবড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গ্রামের ব্রাহ্মণগণ তাহাকে কত প্রকার নির্যাতন করিয়াছেন। আর এখন সে আনন্দের সহিত উচ্চ প্রণব উচ্চারণে পূজাদি করিতেছে, এখন সমাজ নীরব।

···আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে, যাহা সত্য তাহা পালন করিতে যিনিই বদ্ধপরিকর হইবেন বা পালন করিবেন, তাঁহার পশ্চাতে, অর্থাৎ সেই কার্যের পশ্চাতে সত্যস্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তি সেই কার্য সম্পাদন করিবেন এবং করিয়া থাকেন। ইহা সত্য সত্য ত্রিসত্য বলিলাম।

....এইরূপ সত্য প্রচারে বাধা বিঘ্ন অনেক উপস্থিত হইয়া থাকে। জ্ঞানীগণ বলেন, বিরুদ্ধ শক্তি জাগিলেই কার্যের পুষ্টি সাধন হয়। ১৩৩২।২২।৯, কাওরাইদ।

সিদ্ধাশ্রমের ব্রতাচারী সন্ন্যাসীগণের নিকট—

মহাবাক্য—প্রাচীনকালে তত্ত্ববিদ্‌গণ মুমুক্ষুদিগকে স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য আত্মজ্ঞান বোধক যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—তাহাই মহাবাক্য। চারিটি মহাবাক্য প্রচারিত আছে,—(১) তত্ত্বমসি,

(২) অহং ব্রহ্মাস্মি, (৩) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, (৪) অয়মাত্মা ব্রহ্ম। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তত্ত্বমসি কথাটা তস্য (তাঁহার) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও) অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 'তুমি সেই' ও 'তুমি তাঁহার', অর্থাৎ 'আমি সেই' বা 'আমি তাঁহার', এই উভয় বাক্যের কোন্ সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত ইহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া সিদ্ধাশ্রমের সন্ন্যাসিগণ শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন করেন। তাহারই উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল—

স্বগত ভেদ তিন প্রকার—স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। এক বস্তুর পৃথক পৃথক অংশে যে প্রভেদ তাহা স্বগত। মানুষের হাত পা চুল নখ মুখ মাথা বুক কান নাক জিহ্বা ও ত্বক ইত্যাদিতে পরস্পরের প্রভেদকে স্বগতভেদ বলে। এক জাতীয় পৃথক পৃথক বস্তুর যে প্রভেদ, তাহার নাম স্বজাতীয় প্রভেদ। রাম, শ্যাম, যদু, মধু ইত্যাদি বহু মানুষের মধ্যে পরস্পর যে প্রভেদ তাহাই স্বজাতীয়। পৃথক পৃথক জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যে প্রভেদ তাহা বিজাতীয় প্রভেদ। মানুষ, পশু, বৃক্ষ, জল ও অগ্নি প্রভৃতিতে যে প্রভেদ তাহাই বিজাতীয়। ... আমি তাঁহার—'আমি' অর্থে জীব, 'তাঁহার' অর্থে ব্রহ্মের, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ। এখানে জীবের 'আমি' অভিমান—তাহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক রাখিতেছে। এই দৃষ্টতঃ প্রভেদবোধ জীবের—ব্রহ্মের নহে। যতক্ষণ অহংবোধ থাকে ততক্ষণ ত্বং বোধও আছে; যখন অহংবোধ লোপ পায় তখন ত্বংবোধও থাকে না। সেই ভাবই অদ্বৈত-ভাব বা সোঽহংভাব। এই অবস্থায় না পৌছিলে তাহা বুঝা যায় না। এই অবস্থা ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া ইহা চিন্তা ও মনন করাও যায় না। নির্বিকল্প সমাধিতে এই অদ্বৈতভাবের অপরোক্ষানুভূতি হয়। সচ্চিদানন্দ সাগরে যিনি এইরূপ ডুই এক ডুব দিয়াছেন, তাঁহাকে তত্ত্ববিদ্ বা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা যায়।

ব্রহ্মের সগুণ ভাবই প্রকৃতি (ত্রিগুণময়ী পরা প্রকৃতি)। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্বের প্রকাশ। সুতরাং

সাধক অহংতত্ত্বে থাকিয়া বুদ্ধিতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। পরা প্রকৃতি বা ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি ত আরও দূরের কথা। আবার বিচার দ্বারা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়, তারপর আর বিচার চলে না। তখন প্রকৃতির হাতে আত্মসমর্পণ ব্যতীত সাধকের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

যিনি একত্বে (অদ্বৈতভাবে) পৌছিয়া স্থিতিলাভ বা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি অভ্রান্ত (পূর্ণজ্ঞানী) হওয়ায় যে কোন বাক্য, যে কোন শাস্ত্র, যে কোন মতের সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ হয় না। তিনি কোন বাক্য মত বা শাস্ত্র খণ্ডন করেন না, শুধু সেই সমস্ত বাক্যাদির যথাযথ সদর্থ প্রচার করিয়া মীমাংসা ও সামঞ্জস্য বিধান করেন।

অদ্বৈতভাবে পেঁাছিয়াও স্থিতিলাভ করিতে অর্থাৎ দ্রষ্টা (লীলা দর্শক) হইতে না পারিলে ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। যাবৎ ভ্রম থাকে তাবৎ দেহাত্মবোধ জনিত বাসনার ফলে কর্মফল (জন্ম মরণ সুখ দুঃখ) ভোগ হইতে নিস্তার নাই। সুতরাং স্থিরভাবে লক্ষ্যের দিকে অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব লাভের জন্য প্রাণপণ যত্ন করা আবশ্যক। —১৩৩১,১৭ই কার্তিক।

সিদ্ধাশ্রমের সন্ন্যাসীদের নিকট—

দ্রষ্টার আত্মসমর্পণ ও আত্মসমর্পণকারীর দ্রষ্টৃত্ব। আত্মজ্ঞানলাভে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও ঈশ্বরোপাসনায় আত্মজ্ঞান লাভ (চৈতন্য সত্তায় স্থিতি)—যেহেতু চৈতন্যসত্তা অকর্তা। প্রকৃতি হ্লাদিন্যাভিমানী শক্তি প্রকাশে সৃষ্টি লয়াদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন, অর্থাৎ চৈতন্য-সত্তা প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। জীবাত্মার আত্মসমর্পণই আত্মজ্ঞান বা চৈতন্য-স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়া। কর্তৃত্বাভিমানই জীবত্ব। পরমাত্মা কর্তৃত্ববিহীন কর্তা। জীবাত্মার কর্তৃত্বাভিমান থাকাতেই সুখ দুঃখ ভোগ করে। কর্তৃত্বাভিমান দেহাত্মবোধে ঘটে। অতএব তাহাকে বদ্ধজীব বলে।

পরাপ্রকৃতির ষড়ৈশ্বর্যের বিকাশই ঈশ্বরত্ব, আর জীবাত্মা বা অপরা প্রকৃতির আত্মসমর্পণই চৈতন্য বা আত্মজ্ঞান। পরাপ্রকৃতি ও চৈতন্য

অভেদ হইলেও কি এক অজানা ইঙ্গিতে যেমন কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষে ষড়ৈশ্বর্যের বিকাশে ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পায়, আর কাহারও মধ্যে প্রকাশ পায় না। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বরত্ব বা ষড়ৈশ্বর্যের বিকাশ পরাপ্রকৃতির বিশেষ ইচ্ছার অধীন। জীবাত্মা বা অপরাপ্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপত্ব (আত্মস্বরূপত্ব) প্রাপ্ত হইলে, পরা প্রকৃতিগত হয়, অর্থাৎ তাঁহাকে কর্তা মানিয়া অকর্তা হয়। ইহাকেই বেদান্তে তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং পুরাণে আত্মসমর্পণ বলিয়া থাকে।—১৩৩১।২০।১০, চিত্রধাম।

কল্যাণবাণী : দেশাত্মবোধক

[পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন মায়ের কাজ। মায়ের আদেশে রাজনীতিকে ধর্মনীতি হইতে পৃথক না করিয়া ইহারই আদর্শে ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন, শিক্ষা সংস্কার, সামাজিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য জাতীয় সংগঠন মূলক কার্য ব্রহ্মাচারীবাবার কর্ম-যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সমস্ত কার্য সম্পাদন উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে কর্মিগণকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।]

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায়, এম. এ. বি. এল. উকিল, ময়মনসিংহ

…আপনার জেল হইতে ফিরিয়া আসার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আজকাল দেশের যেরূপ অবস্থা, এ-অঞ্চলের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রায়কে আবদ্ধ করিয়াছে, বিশেষতঃ তন্মধ্যে আমরা আপনাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি। আপনি যদি পূর্বেই এভাবে আবদ্ধ থাকেন তবে এ-অঞ্চলের কাজ ভাল চলিবে না, তাই ভগবৎ ইচ্ছায় আপনি ফেরৎ হইয়াছেন।

…সময় অতি নিকট, এইবারেই আমাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। আর গৌণ করিবেন না, এখন আবার কাজে অগ্রসর হইলে আপনার দ্বারা খুব কাজ হইবে। কারণ বর্তমানে মহাশয়ের মত নেতা এ-অঞ্চলে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

…আমি যাহা জানি বা বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চয় করিয়াই বলিতেছি। মা'র আদেশ—এবার কলিকাতা ইত্যাদি স্থানে যে খেলা চলিয়াছে, এই আন্দোলন আর না কমিয়া আরও ভীষণ আকার ধারণ করিবে এবং ইহার ভিতরেই স্বরাজ লাভ হইবে। আপনি অতিশীঘ্র দেশের ছেলেদের পশ্চাৎ রক্ষক স্বরূপ হইয়া দাঁড়ান, নচেৎ মায়ের কাজে আংশিক রকমের হইলেও সাময়িক অঙ্গ ভঙ্গ হইবে। আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি এমন আমার ভাব নয়, আপনি যে আমার কথার অপেক্ষা করিতেছেন এমনও নয়। তবে আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনার কথা অম্লান চিত্তে লোকে গ্রহণ করিতেছে ও করিবে। তাই আমার মনের দুই একটি কথা জানাইবার ইচ্ছা হইতেছে।…

আমার সিদ্ধিলাভের পর,—মা আমাকে কৃপা করিয়াছন পরই বলিয়াছেন—"আমি ইউরোপের শক্তি হ্রাস করিবার জন্য মহাসমরের সংগঠন করিব, পরে ভারত স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে সত্য-ধর্ম স্থাপন করিয়া ভারতে দেবতা মানবে অপূর্ব লীলা করিব।" তদবধি আমি এই অপেক্ষায় বসিয়া আছি এবং দেখিয়া আসিতেছি। আর এসব দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া শুনিয়াও স্থির থাকিতেছি। কি করি, এসব আমার কাজ নয়। আমি সন্ন্যাসী, আমি ছোট হইতেই এসব সাংসারিক বা রাজনৈতিক কোন কাজই করি নাই। তাই মা আমাকে এসব বড় বড় কাজে অবোধ সন্তান বিধায় নেন না। এসব আপনাদেব কাজ, আপনারাই করিবেন। আমি জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ দেখিয়া যে কবে এই আনন্দসাগরে ভাসিব, তাই আমার উদ্দীপন। আমার দ্বারা কোন কাজ হবে যে এমন বুঝিতেছি না। এমন কি এজন্য মা'র নিকট প্রার্থণা করিবারও নাই। আমি জানি বর্তমানে মা সমুদয় দেব দেবী সমভিব্যাহারে বিষ্ণুশক্তি সহায় করিয়া ভারত উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি করিতেছেন ও করিবেন।………১৩২৮।৬।১০, গৌরা আশ্রম।

শ্রীমান্ সুশালানন্দ, কংগ্রেস কমিটি নেত্রকোনা।

জানিবা মায়ের ইচ্ছায়ই তোমরা সেখানে বাস করিতেছ।

শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারীবাবার

হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

মনোযোগের সহিত কাজকর্ম করিও। স্মরণ রাখিও তোমরা সন্ন্যাসী। ঠাকুর সেবার জন্য বরাবর কংগ্রেস কমিটির অপেক্ষায় থাকা অবিধি হইবে। সেবার জন্যে এক হইতে পাঁচ ঘর পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়া লইও, আর কেহ ভোগের জন্যে কিছু দিলে গ্রহণ করিও।...

শ্রীমৎ বিশ্বামিত্র ঋষি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য পালন করিয়াছিলেন কেবল বৃক্ষতল পতিত ফল সেবন করিয়া। আর তোমরা যদি নিজেদের দেহ রক্ষার জন্যে একজনের অপেক্ষায় থাক, তবে ইহা অধর্ম। কংগ্রেস কমিটির দুই একটি ছেলের সাহায্য কর বলিয়া মনে অহঙ্কার আনিও না। এক মুষ্টি ধুলা দ্বারা সাগর বন্ধন দূরের কথা, সামান্য গোষ্পদের জলও রক্ষা করা যায় না। ১৩২৮।৬।১০, গৌরী-আশ্রম।

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র চন্দ্র রায়—নেত্রকোণা

তোমার পত্র পাইয়া মনে হয় যেন প্রহ্লাদের কাল—হিরণ্যকশিপুর নির্যাতন। এইরূপ মন্বন্তর উপস্থিত অর্থাৎ যুগ-পরিবর্তন সময়ে হইয়া থাকে। ইহা কেবল ভক্তের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির কারণ।...ধর্ম সংস্থাপনের জন্যে এবার দেশের বহু লোককে কত কামান গোলাও সহ্য করিতে হইবে।...তোমাদেরও কত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। বর্তমানে এই যে রাজনৈতিক আলোচনা চলিতেছে, ইহাতে কত যে নির্যাতন সহিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে আমি বলি মন শক্ত কর, দেশের দিকে লক্ষ্য কর। এসব কলির প্রভাব।

এই রাজশক্তিকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটাইতেছে। কোমর শক্ত করিয়া বাঁধ এবং দেশের কাজে লাগিয়া যাও।

১৩২৮।২১।১০,—গৌরী-আশ্রম।

শ্রীমান্ যোগেশ চন্দ্র শীল, কংগ্রেস-কমিটি, নেত্রকোণা

ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনের মধ্যে সংযমই প্রধান তপস্যা, ইহার মধ্যে আহার সংযমই মূল। আমার সাধনাবস্থায় মাসের মধ্যে ৫।৭ দিন প্রসাদ পাইয়াছি কিনা সন্দেহ।

আহার সংযমের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও সংযম হইতে থাকে। (আহার টুটিলে টুটে ইন্দ্রিয় বিক্রম)। সংযম অভ্যাস না করিলে মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। সংযমী ব্যক্তির ভিতর দিয়াই মা বৃহৎ বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

...আজকাল দেশের লোকগুলি ভাত ভাত করিয়া, ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া নিজ নিজ তত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। এমন কি পরের চিন্তা দূরে থাকুক, আত্মচিন্তা বা ঈশ্বর-চিন্তা করিবারও সময় করিয়া উঠিতে পারে না। অতএব তোমরা একবেলা প্রসাদ পাইবা এবং মাসের মধ্যে ৪।৫ দিন উপবাস থাকিতে অভ্যাস করিবা। আর ধ্যান ধারণা জপ ও প্রাণায়ামাদি করিতে ভুলিও না। ব্রহ্মচর্য-ব্রতই মানব জীবনের ভিত্তি। ইহা গৃহী ও উদাসী সকলেরই দরকার। ১৩২৮।৬।১২—হাসামপুর।

শ্রীমান্ রাজেন্দ্র চন্দ্র শীল, নেত্রকোণা।

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আমার বিশ্বাস স্থানীয় লোকের অমত প্রকাশের কারণ, উপরের পীড়ন ভয়। আর কংগ্রেস কমিটির উপরও একান্ত কোপ-দৃষ্টি থাকা বশতঃ লোকে মাথা উঠায় না, এবং কমিটিও বিশেষ কাজ করিয়া লোককে উৎসাহিত করিতে পারিতেছে না। তাই লিখি বর্তমান সময়ে এইভাবে কাজ চলিবেনা, এবং কোনকালে চলেও নাই।

যিনি কর্মী—যিনি সৎ, অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ের সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সত্য অন্যকে বুঝাইতে হইলে নিজেদের অন্য কর্মকে গৌণ মনে করিয়া, আপন কর্মের দ্বারা অর্থাৎ নিজে করিয়া, এমন কি যে পর্যন্ত ইহার উপকারিতা লোকে না বুঝে, সে পর্যন্ত নিজেদের সর্বস্বান্ত করিয়া, কাজ না হইলেও যে পর্যন্ত দেহে প্রাণ আছে, তাহার জন্য খাটিতেই হইবে। তবুও যদি সফল না হয়—দেহ শেষ হইয়া যায়, তবেও জানিবা তাহার এই সত্যপথের অনুগামী পুরুষ দুই পুরুষ পরে হইলেও হইবে। ইহা ঈশ্বরেরই বিধান। ইহাকেই সত্যদ্রষ্টা, কম ,

ত্যাগী, পরোপকারী, মহৎ বা মহীয়াম্ বলে।—১৩২৯।১৩।১, গৌরী-আশ্রম।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র দে, উকিল,—নেত্রকোণা।

জানিতে পারিলাম, আপনাদের কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মজুমদার নাকি উক্ত কর্মত্যাগ করিয়া আবার তাঁহার পূর্ব কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজকাল এমন বিষম সমস্যার সময়, ইহার মধ্যে যদি তাঁহাদের মত লোক পশ্চাদ্‌পদ হন তবে বড়ই ক্ষতি। তাহাদিগকে দেখিয়া শত শত লোক উক্ত কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ইহাদিগকে এখন বিপদ-সাগরে ফেলিয়া কেবল নিজেদের অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা। নচেৎ কোন লাভের আশায় কাজ করা হইয়াছিল, এখন লাভ নাই বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া। আমি কিন্তু এসব লিখিতে পারিনা, কারণ আমি সাধারণ লোক। আমার বিদ্যা বুদ্ধি নাই, অর্থবিত্ত কিছুই নাই; কিন্তু মনে কষ্ট হইলে বিদ্যা বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, মনে যাহা আসে বলিয়া ফেলে। আমার কথায় যেন কেহ বিরক্তি প্রকাশ না করেন, এই জন্য আমার শত অনুরোধ। ··আমি কিন্তু উপদেশ দিতেছি এখন কেহ বুঝিবেন না, তাহা হইলে আমি বড়ই দুঃখিত হইব। অমি আত্মীয় জ্ঞানে মনের কথা জানাইতেছি।

আমি সন্ন্যাসী, আমার ভোগ বিলাস, সুখ সাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ এই স্বরাজের জন্য বা স্বাধীনতার জন্য কোন ঠেকা নাই, কারণ আমি সর্বদাই স্বাধীন—কেন না আমি কাহারও অধিকারে থাকি না। যেমন এ জগতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি, তেমন ইচ্ছা করিয়া যাইতে পারিব। দেহের সুখ দুঃখে আমাকে আটকাইতে পারিবে না। তবে যে এমন ভাবে চলিতেছি ইহার কারণ কেবল পল্লীগ্রামে থাকিয়া সকলের সুখ দুঃখে তেমন না হইয়া পারা যায় না।

···আমি দেখিতেছি এইবার দেশের দুর্ঘটনা; এইভাবে শিথিল

হইয়া থাকিলে কাহারও অব্যাহতি নাই। কারণ বাঘ যদি ক্রোধান্বিত হয়, তবে হন্তাকারীকেও মারে, আর তামেসগিরকেও মারে। তাই আবার লিখি, পূর্বে বুঝা উচিত ছিল যে, এমন লণ্ড ভণ্ড তপস্বীর কথায়, (অর্থাৎ মহাত্মার—যাহার কাণ্ড জ্ঞান নাই, কোটি কোটি টাকার বিপুল সম্পত্তির দিকে যাহার কিছু মাত্র লক্ষ্য নাই), এমন লোককে যখন আদর্শ করিয়া কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে, তখনই বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করা উচিত ছিল। তাই লিখি, যাহারা ধরিয়াছেন আর ছাড়িবেন না। এবং আরও সাথী করিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হউন, এই আমার শেষ কথা। ১৩২৯।১৫।১, গৌরী-আশ্রম।

—•—

মনিষী মণ্ডলীর রচনাঞ্জলি ঃ

জন্মশত বার্ষিকোৎসবে

শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারিদেব প্রশস্তি ঃ

ডক্টর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

১

যো ব্রহ্মচারি-চির-চারুচরিত্রদীপ্তঃ
শ্রীলোকনাথ ইতি সার্থক নামধারী।
তস্য প্রশিষ্য উপযুক্তগুণাভিরামঃ
শ্রীভারতো বিজয়তামপিভারতে্যম্ ॥

(ব্রহ্মচারী চিরচারু চরিতে উজ্জ্বল
লোকনাথ নামে খ্যাত ভুবন মঙ্গল।
তাঁহারি প্রশিষ্য যোগ্যগুণে অভিরাম
জয়তি ভারতভূমে "শ্রীভারত" নাম ॥১॥)

২

উদ্ভূয় যো মনুজমঙ্গল চিন্তনায়
সদ্‌ব্রহ্মচর্য্য পরমব্রতমাললম্বে।
জীবেষু যশ্চ নিখিলেষু সমানুতাবো
ব্রহ্মাপিতেন্দ্রিয়মনস্তনুকর্মমর্মা ॥

(মানব মঙ্গল চিন্তাতরে অভ্যুদিত
ব্রহ্মাচর্য্যব্রতে যিনি পরম আশ্রিত।
সমস্ত জীবেতে যাঁর ছিল সমজ্ঞান
ব্রহ্মাপিত চিত্ত কায়কর্ম মর্ম প্রাণ ॥২॥)

৩

নাম্না স ভারত ইতি প্রতিভাগুণেন
প্রাচীং দিশং রবিরিব প্রবিকাশমানঃ।
তস্যাস্ত্য জন্মশতবার্ষিক উৎসবোনঃ
সৌভাগ্যসূচক শুভাবসরায় লব্ধঃ ॥

(ভারত নামটি ধরি প্রতিভা প্রভায়
প্রাচী দিক্ প্রকাশিছে দিবাকর প্রায়।
জন্মশতবর্ষে আজি উৎসব তাঁহার
মোদেরই সূচিত করে সৌভাগ্য অপার ॥৩॥)

৪

যেষাং হি সাত্ত্বিকধনপ্রদসাধনস্য
ধারা কঠোর গিরি নির্ঝরিণী সমানা।
সংসার তাপিতহৃদাং প্রশমপ্রদাস্তে।
তে ব্রহ্মচারিচরণাঃ সুতরাং জয়ন্তি ॥

(ধর্মধন দেন যাঁর সাধনার ধারা
কঠোর হলেও গিরিনির্ঝরিণী পারা।
সংসার তাপিত প্রাণে আনে শান্তিবারি
চিরজয়ী হ'ন সেই পূজ্য ব্রহ্মচারী ॥৪॥)

৫

কালে কলৌ কলুষিতে জনচিত্তমার্গে
ধর্মাপবর্গকিরণং বিধুবদ্ বিকার্য্য।
শ্রীলোকনাথ সরণীশ্রিতসম্প্রদায়
শ্রীভারতো বিজয়তাং সহভক্তবর্গঃ ॥

(কলিকালে কলুষিত জনচিত্ত পথে
ধর্ম-অপবর্গ আলো আসে যাঁহা হ'তে।
লোকনাথ পথাশ্রিত সেই সম্প্রদায়
শ্রীভারত ভক্ত সহ জয়তু ধরায় ॥৫॥)

—০—

ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শ : জগতের কল্যাণ

ডক্টর রণজিৎ সরকার, (গ্রেনিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়, হল্যাণ্ড)

মানুষের মনে ব্রহ্ম আর জগৎ নিয়ে একটা বিরোধ লেগে আছে অনেক যুগ থেকে। জগতের মধ্যে আমরা দেখি পাপ, মালিন্য, অপূর্ণতা, তাই বলি জগৎটা অনিত্য, দুঃখময়—অনিত্যং অসুখং লোকং—একমাত্র ব্রহ্ম সত্য। আমাদের সত্তার পূর্ণতা তাই ব্রহ্মকে জেনে, ব্রাহ্মী চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে, ব্রহ্মের মধ্যে নিজের সত্তাকে বিলীন করে দিয়ে। জগতের সব ধর্মমতেই ইহলোকের চেয়ে পরলোকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। ভারতবর্ষ আবার মায়াবাদের মোহে পড়ে জগৎকে কেবল দুঃখময় বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বলেছে জগৎ মিথ্যা। আর জগৎ যদি মিথ্যা হয় তবে তাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে। জগতের কল্যাণ, সামাজিক উন্নতি, জাতীয় অগ্রগতি—এ-সমস্ত কথার কোন অর্থ নেই।

আমাদের ঝোঁক লোকাতীতের দিকে ; আর পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রের, জড়বাদের ঝোঁক লোকায়তের দিকে। ভারতবর্ষে লোকায়ত দর্শন যে ছিলনা তা নয়, তবে তা কোনদিনই বহুজনের হৃদয়ের সায় পায়নি। তাই ব্রহ্ম আর জগৎ, লোকাতীত আর লোকায়তের মধ্যে বিরোধ মানুষের মনে প্রায় কায়েমি হয়ে বসেছিল। কিন্তু আমরা যদি প্রাচীন ভারতের মনোরাজ্যে প্রবেশ করি তবে দেখতে পাই যে, সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মনে এই বিরোধের স্থান ছিল না। তাঁরা দেখেছিলেন যে জগৎটা মায়া নয়, জগৎ ব্রহ্মেরই সম্ভূতি আর মানুষও অমৃতের পুত্র। বেদে মুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

দৌর্মে পিতা জনিতা···মাতা পৃথিবী মহীয়ম্ (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৩৩)
দ্যুলোক আমার পিতা, জনিতা··· মাতা আমার এই বিশাল পৃথিবী।

আবার—

ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সং বিদানা দিবা কবে শ্রিয়াম মা ধেহি ভূত্যান্॥

(অথর্ববেদ ১২।১।৬৩)

হে মাতা ভূমি, সুষ্ঠুভাবে দাও আমাকে সুপ্রতিষ্ঠা। তুমি কবি, দ্যুলোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীময় বিশ্বে আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

বৈদিক ঋষির সত্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল যে, পৃথিবী, স্বর্গ আর মানুষের মধ্যে আছে এক নিবিড় নিগূঢ় সম্বন্ধ। পিতা, মাতা আর পুত্র—এই তিনে মিলে পূর্ণতা। ভারতীয় সভ্যতার উদয়লগ্নে ঋষিরা পূর্ণতার ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা মানুষ আর মানুষের জীবনকে, জগৎ আর জাগতিক সত্যকে বাদ দিয়ে একরোখা গতিতে কেবল স্বর্গের দিকে, বা কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির দিকে ছুটে যাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন জীবনকে সম্পূর্ণ সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। কারণ তাঁরা জানিতেন জীবন ও জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের আবাস:

ঈশা বাস্যমিদং সবং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।—

তাই তাঁদের আদর্শ ছিল জগতের আনন্দলোকে বিরাজ করা, জগৎকে ভোগ করা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভোগের অর্থ নয় কামনা আর অহঙ্কারের জালে জগৎকে আবদ্ধ করা। ভোগ হচ্ছে রসাস্বাদন, আর রস হচ্ছে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ। তাই আত্মাকে জেনে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই আত্মার বহুমুখী প্রকাশ উপলব্ধি করাই হলো ভোগের তাৎপর্য। উপনিষদের ঋষি আবার বলেছেন —তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। ভোগের প্রথম শর্ত হচ্ছে ত্যাগ—কামনার আর অহঙ্কারের ত্যাগ। কামনা থেকে মুক্ত না হলে আমরা আনন্দে উত্তীর্ণ হতে পারবো না। কামনা আনন্দের বিকৃতি, অহঙ্কার আনন্দের অবগুণ্ঠন। মুক্তি চাই আমরা। মুক্তি কি? কামনা আর অহঙ্কারের পাশ যখন আমরা চেতনা থেকে খসাতে পারি তখনই

আমরা মুক্ত। কারণ তখন আমরা দেখতে পাই জগৎ ও ব্রহ্মের একত্ব। সৃষ্টি আর স্রষ্টার বিভেদ ঘুচে যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানুষ তখন সৃষ্টির আনন্দলীলা উপভোগ করতে পারে। "আমি" বা "আমার" লোপ পায়।

আমাদের ভোগ বা আনন্দ আর কামনার মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বিকৃত হয় না। আমরা জানতে পারি যে, জাগতিক বস্তুর আস্বাদন আমরা চাই না সেই বস্তুটির লোভে, সেই বস্তুটিকে কামনা করে। বস্তুর মধ্যে আত্মার প্রকাশকে উপলব্ধি করাই হলো ভোগের চূড়ান্ত। এই কথাই সুন্দরভাবে বলেছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য—

ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি আত্মানস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মানস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৫।৬)

অহঙ্কারে বন্দী থাকলে বস্তুর, প্রাণীর বাহ্যরূপের অন্তরে পৌঁছনোর সুযোগ আমরা পাই না। কিন্তু মুক্তপুরুষ সবকিছুর মধ্যে দেখতে পান আত্মার প্রকাশ।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। যে-ভোগের কথা বলা হলো তা কোন অনড় উপলব্ধি নয়, তা আসে চেতনার বিকাশের দ্বারা। আমরা যদি নিজ নিজ ব্যক্তিসত্তায় বাঁধা থাকি তবে ভোগ হয় সামায়িত। তাই কামনা ও অহঙ্কার থেকে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চাই বিকাশ। এক যেমন বহু হয়ে জগতের সৃজন করেছেন তেমনি নিজের আত্মকেও জানতে হবে বহুর মধ্যে। এটা হচ্ছে ভোগের বিশ্বরূপ। বহুজন যদি অন্ধকারের মধ্যে দুঃখের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তবে একের আনন্দভোগ খণ্ডিত হতে বাধ্য। তাই বুঝি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "মোক্ষার্থং" আর "জগদ্ধিতায়"। একদিকে মুক্তি আর অন্যদিকে জগতের হিত। এ না হলে স্বর্গ-পিতা, পৃথিবী-মাতা আর অমৃতের পুত্র মানুষের সমবেত লীলায় পূর্ণতা আসে না।

ভারতবর্ষের এই পূর্ণতার আদর্শ নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনার আবর্তনে-বিবর্তনে লোপ পেতে বসেছিল। আমরা ব্যক্তিগত মোক্ষ, ব্যক্তিগত নির্বাণের পথে গিয়ে ভোগের পরিবর্তে বৈরাগ্যের উপর এত জোর দিয়েছিলাম যে আমাদের প্রাণশক্তি আর সৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যা সত্য তা মরে না কখনো। বৈদিক ঋষিরা যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তা আবার ভারতবর্ষ তুলে ধরেছে জগতের সামনে মানবের পূর্ণতম আদর্শ হিসেবে। ভারতবর্ষের আধুনিক নবজাগরণের সঙ্গে এই শাশ্বত সত্য ওতপ্রোত হয়ে আছে। জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপ তাই জগতের কল্যাণ আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশ্বের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ না হলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। জন কয়েক ভাগ্যবানের হয়তো মোক্ষপ্রাপ্তি হয় কিন্তু বিশ্বমানব যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকে।

বৈদিক ঋষিরা সামগ্রিক আধ্যাত্মিকতার আদর্শ আবিষ্কার করেছিলেন। বর্তমান কালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনাও সেই সমগ্রতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। আর শ্রীঅরবিন্দ দিব্যজীবনের আদর্শের ভিতর দিয়েও পূর্ণযোগের পথনির্দেশ করে দেখিয়েছেন, জীবনকে আর জগৎকে বাদ দিয়ে নয়, তাদের রূপান্তরিত করে, কি ভাবে আমরা সমগ্রতার দিকে, জগতে ভগবৎ প্রকাশের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। জগৎকল্যাণের যে মহান্ আধ্যাত্মিক কর্ম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে সুরু হয়েছিল, যা শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে সম্পূর্ণতা পেয়েছে তা ভারতবর্ষের অনেক যোগী, ঋষি, মহাপুরুষের সাধনায় ও তপস্যায় পুষ্ট হয়েছে। শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী এমনি একজন মহাপুরুষ যিনি স্পষ্টভাবে এই আদর্শ উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর কঠোর তপশ্চর্যার সাহায্যে তাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সাধনা ও শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় যে কতো নিবিড় সম্বন্ধ ছিল—যদিও মর্ত্যজগতে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়নি—তা শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে

ব্রহ্মচারীবাবার এক শিষ্যকে জানিয়েছেন—"তোমার গুরুর শিক্ষা আর এই যোগের শিক্ষা মুলতঃ এক ; তিনি যাকে চিত্তশুদ্ধি বলেছেন আমরা তাকেই বলি চেতনার রূপান্তর।" (১)

আমরা এখন ব্রহ্মচারীবাবার শিক্ষা ও পৃথিবীতে দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্রত সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো।

ব্রহ্মচারীবাবার সাধনার চতুরঙ্গ

ব্রহ্মচারীবাবা পণ্ডিত ছিলেন না। বিদ্যালয়ের লেখাপড়া অল্পই করেছেন। তিনি কোন দার্শনিক তত্ত্বের ধার ধারতেন না। মানসিক বুদ্ধি আমাদের যে জ্ঞান দেয় তা খণ্ডিত। ভারতীয় সাধনায় তাই দেখি মনোবুদ্ধির অগোচরে চৈতন্যলোকে যে সত্য নিহিত আছে তাকে মনোবুদ্ধির জগতে নামিয়ে আনা হচ্ছে জগতের শিক্ষার জন্য। এখানে পুঁথিপড়া বিদ্যার মূল্য অল্পই। শাস্ত্র সাধনার প্রথম স্তরে সহায় হতে পারে, যেমন সহায় হতে পারেন গুরু। কিন্তু যে সাধক নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে পারেন ভগবানের হাতে তাঁর শাস্ত্রও লাগে না, গুরুরও প্রয়োজন হয় না। ভগবানই তাঁকে অবিদ্যা থেকে বিদ্যায় নিয়ে যান, অন্ধকার থেকে আলোয়। তখন ভগবানই হন শাস্ত্র, ভগবানই গুরু। ব্রহ্মচারীবাবার জীবনেও দেখা যায় তাঁর সাধনার ভার নিয়েছিলেন স্বয়ং জগজ্জননী ভগবতী মা। এ-সম্বন্ধে তাঁর জীবনীতে লেখা হয়েছে—

"মাকে ডাকিতে ডাকিতে এই সময়ে একদিন মা দশভুজারূপে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—'পূজার মন্ত্র বলিতেছি শুন।' তখন তিনি অঙ্গলি দ্বারা মাটিতে মন্ত্রগুলি লিখিয়া প্রভাতে কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া তদনুসারে পূজাদি করিতে লাগিলেন। মায়ের আদেশবাক্য বলিয়া শাস্ত্রের সহিত এই সব মন্ত্র মিলাইবার প্রয়োজন হইল না।" (২)

---

(১) মহাবতার। শ্রীঅনিলবরণ রায় ও শ্রীযোগানন্দ, পণ্ডিচেরী ১৯৫২, পৃ ৩২৬ (শ্রীঅরবিন্দের মূল ইংরেজীর বাংলা অনুবাদই শুধু এই রচনায় দেওয়া হলো)। (২) ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী. পৃ ১৫।

ব্রহ্মচারীবাবা এমনই একজন সাধক ছিলেন যিনি নির্বিশেষে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আর তিনি ছিলেন সঙ্কল্পে দৃঢ়, ব্রতে একনিষ্ঠ। তাই ভগবান স্বয়ং তাঁকে নিয়ে গেছেন সত্যের দিকে, যে-সত্যকে উপলব্ধি করে তিনি ভারতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ মায়াবাদকে অমান্য করতে এতটুকু ইতস্তত করেননি। তাঁর সাধনা সম্বন্ধে পরে তিনি লিখেছেন—

"বাবা শ্রীকৃষ্ণরূপে আমাকে আদেশ ও উপদেশ দিয়া আমাকে একটু জ্ঞান দিলেন এবং মাকে আনিয়া আমাকে মায়ের কোলে দিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং আমাকে জানাইলেন, 'আমরা আসিয়াছি জগতের মঙ্গলবিধান করিতে।" (১)

ব্রহ্মচারীবাবার শিক্ষা ও সাধনার সারাংশ পাই এই একটি বাক্য থেকে। তিনি যাদের বাবা-মা বলেছেন তাঁরাই হলেন গীতার পুরুষোত্তম ও পরাপ্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

···অন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ (৭।৫)

হে মহাবাহো, জানো আমার পরাপ্রকৃতিকে, সেই প্রকৃতি হয়েছে জীব আর তার দ্বারা ধৃত এ-জগৎ।

আমরা দেখছি জীব আর জগৎ, পুরুষোত্তম আর পরাপ্রকৃতি পৃথক নয়, একীভূত তারা। সৃষ্টি আসছে পরাপ্রকৃতি থেকে যদিও তার পিছনে রয়েছেন পুরুষোত্তম। এই পরাপ্রকৃতি বা আদ্যাশক্তিই "মা"। তাই জন্ম ও জীবন মা'র শক্তিতেই চালিত। শক্তির দ্বারাই অগ্রগতি সম্ভব। ব্রহ্মও সত্য জগৎও সত্য। ব্রহ্ম ও জগৎ দুই নয়, একের দুই রূপভেদ মাত্র। ব্রহ্মচারীবাবার সাধনার এইটি হলো প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হলো মহাশক্তির পৃথিবীতে অবতরণ। মানুষী শক্তির সাহায্যে আমরা ব্যক্তিগত মুক্তি হয়তো পেতে পারি—প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে পুরুষ। জগৎটাকে মায়া বলে জেনে, "নেতি

---

(১) ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী, পৃ ১০

নেতি" বলে হয়তো নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তিও হতে পারে। কিন্তু পরাশক্তির প্রত্যক্ষ কর্ম ছাড়া সমগ্র মানবজাতি, বিশ্বচরাচর অজ্ঞানের তিমির থেকে রেহাই পেতে পারে না। তাই ব্রহ্মচারীবাবার সাধনার একটি মহৎ লক্ষ্য ছিল মহালক্ষ্মীরূপিণী আদ্যাশক্তিকে মর্ত্যে নামিয়ে আনা।

তৃতীয় কথা হলো মায়ের কোলের শিশু হওয়া। মহাশক্তি জগতে কাজ করেন মানুষের ভিতর দিয়ে। তাই সাধককে হতে হবে ভগবানের যন্ত্র। মা'র প্রথম কাজ সাধকেব মধ্যে। সচেতন ভাবে যে মা'র হাতে নিজেকে তুলে দিতে পারে মা নিজেই নেন তার সাধনার ভার; তাকে জ্ঞান দেন, শক্তি দেন, তাকে গড়ে তোলেন যন্ত্ররূপে। তার পর সেই যন্ত্র ব্যবহার করেন জগতের মঙ্গলের জন্য।

জগতের মঙ্গলবিধান হলো চতুর্থ কথা। ব্রহ্মচারীবাবা তাই ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি বা রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছেন সমাজের রূপান্তর, জাতির রূপান্তর। পৃথিবীতে যাতে সত্যধর্ম স্থাপিত হতে পারে তা-ই ছিল তাঁর সাধনার শেষ লক্ষ্য।

ব্রহ্মচারী বাবার জীবন ও কর্মের তাৎপর্য উপলব্ধি করবার জন্য আমরা তাঁর শিক্ষা ও সাধনাকে নিচে চারটি শিরোণামে ভাগ করে বিচার করবো— ১) ব্রহ্ম ও জগৎ; (২) মহাশক্তির আবির্ভাব; (৩) মহাশক্তির যন্ত্র; আর (৪) জগতের মঙ্গলবিধান।

ব্রহ্ম ও জগৎ

ব্রহ্মচারীবাবার আন্তর দৃষ্টিতে জগতের সত্য স্বরূপ ধরা পড়েছিল। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এর অর্থ এই নয় যে আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ মিথ্যা। এ-মহামন্ত্রের অর্থ হচ্ছে যে জগৎও ব্রহ্মই, ব্রহ্মের বিকাশ। ব্রহ্মচারীবাবা লিখেছেন—

"জগৎটা ব্রহ্মের বিকার নয়, বিকাশ অর্থাৎ লীলা। যাহা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিপরীত, তাহাই বিকার।"

"জগৎ শব্দে গতিশীল, সৃষ্টিলয়াদি ক্রিয়াশীল অর্থাৎ অবস্থান্তর দেখা যায় বলিয়া জগৎ, ইহা ব্রহ্মের স্বভাব প্রকৃতির প্রকাশ।" (৪)

আমাদের দেশে মায়াবাদ চিন্তাজগতে ও অধ্যাত্মজগতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু ব্রহ্মাচারীবাবা সেই মত মেনে নিতে পারেননি। তিনি দেখেছিলেন, ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। শঙ্করাচার্য জগৎকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য মায়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন—মায়া, মিথ্যাভূতা সনাতনী। "একং সৎ"-এর পাশাপাশি তাঁকে খাড়া করতে হয়েছে এক সনাতনী মিথ্যাকে। কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখা যায় যে জগৎ সত্য, জীব সত্য, ব্রহ্ম সত্য। তিন-ই সত্য কিন্তু তারা বিভিন্ন নয়, তাদের মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। একদিকে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অন্যদিকে ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। অহংবোধের লোপ হলে এই অভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হয়।

"ব্রহ্ম অখণ্ড, তাহাতে অংশ সম্ভবে না, সুতরাং ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নাই। জীব তাঁহার সহিত স্বগত প্রভেদ আমি-অভিমানে দৃষ্টতঃ উপলব্ধি করে মাত্র।" (৫)

"আমি-অভিমান" যা অহংভাবই বিভিন্নতার কারণ। জীব ও ব্রহ্ম যেমন এক অখণ্ড, তেমনই ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন।

"তোমাকে কে বলিল যে, ব্রহ্মের ভিতর বাহির সম্ভবে? ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি যেমন অভিন্ন তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। তবে সাংখ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্লেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রকৃতি পুরুষ বিভাগ করিয়াছেন; যেমন সক্রিয় অবস্থাকে 'প্রকৃতি' ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে 'পুরুষ' বলিয়াছেন। এইরূপ নিষ্ক্রিয় নিরাকার নির্বিকার অবস্থাকে কেহ কেহ কেবল 'ব্রহ্ম' এবং ব্রহ্মশক্তি সৃষ্টি লয়াদি বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া ইহাকে জগৎ বলিয়াছেন মাত্র। মূলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদজ্ঞানে জগৎকে ব্রহ্মশক্তির বিকাশ বলিতে হয়।" (৬)

এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মচারীবাবা মায়াবাদ মানছেন না। তাঁর

(৪) ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী, পৃ ৬৪ ৬৫ (৫) ঐ পৃ ১৮। (৬) ঐ পৃ ৮১-৮২

মতে জগৎ ব্রহ্মশক্তির বিকাশ আর ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। জগতের সৃষ্টিতে খণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে সত্য, এবং সেই খণ্ডিত চৈতন্যের জন্য জীব অবিদ্যার বশীভূত। অবিদ্যা থেকে মুক্তি পেলে দেখা যাবে খণ্ডের মধ্যেও অখণ্ডের বিকাশ। সীমার মাঝে অসীম, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড বিরাজমান্ঃ ব্রহ্মচারীবাবার জীবনের একটি ছোট ঘটনাকে এই সত্যের রূপক হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।

শঙ্কর মায়াবাদের প্রভাবে তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে কারো কারো মনে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে অনাস্থা ও সংশয় দেখা দেয়। বিচার বুদ্ধিতে ব্রহ্ম ও জীবজগতের অভিন্নতা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। তখন একদিন তাঁর এক প্রিয় শিষ্য শান্তিদানন্দ প্রকাশ্যে তাঁকে বললেন যে তিনি ব্রহ্মচারীবাবার মতকে খণ্ডন করবেন। ব্রহ্মচারীবাবা উত্তর দিলেন, "আমি খণ্ডে খণ্ডেই থাকিব।"

এই ক'টি কথা অত্যন্ত তাৎপর্যময়। "আমি খণ্ডে খণ্ডেই থাকিব।" ব্রহ্ম ব্রহ্মশক্তি, ঈশ্বর-ঈশ্বরী, পুরুষ-প্রকৃতি—এই সব বিভেদ বিচারবুদ্ধি আর অহঙ্কারের সৃষ্টি। সত্যদ্রষ্টা ঋষির চোখে এই বিভেদ থাকে না।

প্রকাশের জন্যই সৃষ্টি। "বহু স্যাম"—বহু হবো। আর বহু হওয়ার অর্থ হলো একের পূর্ণতম অনন্তমুখী বিকাশ। তাই বিশ্বসৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি "আমি" ভগবানের অংশ। ব্রহ্মের অখণ্ডতা খণ্ডিত হয়েছে আনন্দের বা ভোগের জন্য। শিব জীব হয়েছেন যাতে শক্তির মাধ্যমে নিজের অনন্ত চিন্ময় সত্তাকে আস্বাদন করতে পারেন। তাই এই আপাত বিচ্ছেদ—অসংখ্য "আমি"র সৃজন। ব্রহ্মচারীবাবা তাই লিখেছেন, "মা বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাকে ভাবিতে ভাবিতে একেবারে আমি (অহং) হয়ে গেছে।" (৭)

জগতে এই যে বহু, এই খণ্ড, এই যে "আমি" তার মধ্যেও ব্রহ্মকে

(৭) ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী পৃ ৬৭।

জানতে হবে। ব্রহ্মচারীবাবা বলেছেন, কেবল সৎকে জানলে চলবে না, চিৎ-শক্তিকেও জানতে হবে। তাই হলো আত্মজ্ঞান।

"জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদরূপ সন্দেহ নিবৃত্তিই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। ব্রহ্ম-চৈতন্যই ঘটস্থ অবস্থায় পরমাত্মা। এই পরমাত্মার আত্মস্বরূপ ভুলিয়া দেহাত্মবোধ হইলে তাহাকে জীবাত্মা বলে। তোমারই বন্ধন, তোমারই মুক্তি, স্থূলে আসিয়া সূক্ষ্মতত্ত্ব ভুলিয়াছ।" (৮)

তাই দেখি জীব মায়ার সৃষ্টি নয়, অনৃত নয়। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন আছি বলেই দেহাত্মবোধ, অজ্ঞান থেকে মুক্ত হলে সত্যিকারের আত্মজ্ঞান আসে। "এই আত্মজ্ঞান লাভ" বলেছেন ব্রহ্মচারীবাবা, কেবল আত্মসত্তাকে জানা বুঝায় না, আত্মশক্তিকেও জানিতে হয়।...কেবল চৈতন্য-সত্তাকে জানিলে চলিবে না, চৈতন্য-শক্তিকেও স্থূলে সূক্ষ্মে জানিতে হইবে ও তাঁর গুণাগান করিতে হইবে।" (৯)

তিনি আরো বলেছেন, জগৎটাকে ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপ ভাবিয়া একটি কীটানুকীটকেও হেলার চক্ষে দেখিবে না।" (১০) তিনি দেখেছেন, "বাহিরের প্রতি পদার্থ চিৎসত্তা বা চৈতন্যরূপিণী মায়ের বিকাশ।" (১১) দেহাভিমান, অহংবোধ, অজ্ঞান বিদূরিত হলে দেখা যায় জগতের সত্য স্বরূপ। জগৎ তখন মায়ামোহের মতো মিলিয়ে যায় না কারণ সর্বভূতে হয় ঈশ্বরের উপলব্ধি। "অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরানুভূতি প্রস্ফুটিত হইলে কেবল প্রতিমাতে কেন, আকাশে পাতালে বায়ুতে অনলে ঈশ্বরজ্ঞান উদিত" হয়। (১২)

এখানে তাই দেখি অদ্বৈতবাদের নির্গুণ ব্রহ্মকেই তিনি একমাত্র সত্য বলেননি। তাঁর উপলব্ধি সমর্থন পায় আদিবেদান্তে, উপনিষদের শিক্ষায়, যেখানে নির্গুণ ব্রহ্মেরই অন্য প্রকাশ ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম। সেই ঈশ্বরকেই ব্রহ্মচারীবাবা বলেছেন, "বাবা", আর তাঁর শক্তিকে বলেছেন "মা"। বহুকাল পরে শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচারীবাবার শিক্ষা সম্বন্ধে

---

(৮) ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী, পৃ ৩২। (৯) ঐ পৃ ১১। (১০) ঐ পৃ ৩০
(১১) ঐ, পৃ ৩৪ (১২) ঐ, পৃ ৫৬।

যোগানন্দকে যে চিঠি দেন তার কিছু অংশ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"শঙ্কর জ্ঞান, তোমার গুরুও যেমন নির্দেশ করিয়াছেন, সত্যের একদিক মাত্র। পরমপুরুষকে কেবল নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়রূপেও না উপলব্ধি করিলে, পদার্থসমূহের প্রকৃত উৎপত্তি এবং সগুণ ব্রহ্মও সমান সত্য তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না। যদি তুমি সেই পরমপুরুষকে তাহার দ্বিবিধরূপ অর্থাৎ সৎ ও চিৎশক্তি, দুই অথচ অখণ্ড—তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে চেষ্টা কর, তবে পদার্থের সমগ্র সত্যকে তোমার অন্তরের অনুভূতি দ্বারা ধরিতে পারিবে। এই অন্য দিকটি শাক্ততান্ত্রিকগণ পরিস্ফুট করিয়াছিলেন, এতদুভয় অর্থাৎ বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক সত্যকে একীভূত করিলে আমরা পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছিতে পারি।"

"দার্শনিকভাবে বিচার করিলে, ইহাই হইতেছে তোমার গুরুর শিক্ষার মূল কথা এবং ইহা স্পষ্টতঃ শঙ্করসূত্র হইতে পূর্ণতর সত্য এবং বিস্তৃততর জ্ঞান।"(১৩)

ব্রহ্মচারীবাবা এই জ্ঞানলাভকেই সাধনার শেষ কথা বলে গ্রহণ করেন নি। জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ আর শক্তির দ্বারা সেই প্রকাশ হয় সম্ভব। তেমনি জীব বা "আমি"-ও শক্তির প্রকাশ। "জগৎটা মায়ের প্রতিমা" আর মা-ই "আমি" হয়ে গেছেন। তাই জগতে দেবরাজ্য স্থাপন, সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা "মা"-র আবির্ভাব ছাড়া অসম্ভব। আমরা যদি ব্যক্তিগত মোক্ষ চাই তবে বৈদান্তিক সাধনায় বা যোগ-সাধনায় শক্তির সাহায্য ব্যতীত কিংবা তন্ত্রের সাধনায় শক্তির সহায়ে আমরা মোক্ষলাভ করতে পারি; কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শ ছিল পৃথিবীতে "দেবতা মানবে মিলিয়া অপূর্বলীলা" অর্থাৎ মর্ত্যে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তাই মহাশক্তিকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা তাঁর সাধনার এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।

---

(১৩) মহাবির্ভাব, পৃ:২৭

মহাশক্তির আবির্ভাব

আমরা দেখেছি ব্রহ্মচারীবাবা মায়াবাদীর সনাতনী মিথ্যার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সনাতনী মহাশক্তিকে। ব্রহ্মের মতো ব্রহ্মশক্তিও অনন্ত। শিব ও শক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ নেই। সৃষ্টির জন্য, সম্ভূতির জন্য একের বুকে অন্যের প্রস্ফুরণ। তাই বলা হয়েছে—

শিবেচ্ছয়া পরা শক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকতাং গতা।
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব॥

শিবের ইচ্ছায় পরাশক্তি শিবতত্ত্বে একীভূতা॥ সেই একাত্মতা থেকে সৃজনেব আদিলগ্নে পরাশক্তি প্রস্ফুরিতা হয়েছে, তিল থেকে তেলের মতো।

তন্ত্র কখনো কখনো আবো দুঃসাহস দেখিয়েছে। শক্তিকেই এক ও অদ্বিতীয় বলে প্রচার কবেছে। বাস্তবের দিক থেকে, শাক্তসাধনার দিক থেকে দেখলে শক্তিই আদি—আদ্যাশক্তি; কারণ শক্তিই সাধককে দেয় সদ্বস্তুব উপলব্ধি—

এঁকৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
এ-জগতে আমিই এক, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কে আছে?

দেবী ভাগবতে-ও দেবর্ষি নারদ বলছেন শ্রীরামকে—

শৃণু রাম সদা নিত্যা শক্তিরাদ্যা সনাতনী।

এই শক্তিই জগতের আদি কারণ। এই শক্তির দ্বারাই প্রচোদিত হয়ে জগৎ এগিয়ে চলেছে তার অধ্যাত্ম-লক্ষ্যের দিকে। এই শক্তির সাহায্য ছাড়া কোন কিছুই সম্ভবপর হয় না।

তস্যাঃ শক্তিং বিনা কোঽপি স্পন্দিতুং ন ক্ষমো ভবেৎ। তার শক্তি ছাড়া কেউ স্পন্দিত হতে পারে না।

জগতের অর্থ হচ্ছে গতিশীল। শক্তি ছাড়া গতি নেই, স্পন্দন নেই, জন্ম নেই। শক্তি ছাড়া বিশ্ব অচল, অনড়, স্থাণুভূত। জাগতিক প্রসঙ্গে তাই শক্তিই ইচ্ছা ক্রিয়া, জ্ঞানের উৎস।

ব্রহ্মচারীবাবা একটি চিঠিতে অজপা মন্ত্রের প্রসঙ্গে শিব ও শক্তির,

পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। তাতে বোঝা যায় জীবনে শক্তির কতো প্রয়োজন। "শ্বাস নির্গমকালে 'হং'কার, আর প্রবেশ-কালে 'সঃ'কার জপ হইতেছে। 'হং'কার পুরুষ, 'সঃ' কার প্রকৃতি। এই পুরুষ, প্রকৃতির অনন্ত নাম। উপাসক ভেদে কেহ রাধাকৃষ্ণ কেহ বা শিবশক্তি বলিয়া থাকেন। শ্বাস প্রবেশে দেহ জীবিত বা শক্তি সম্পন্ন হয়, তাই 'সঃ'কার শক্তিরূপিণী। শ্বাস নির্গমে, পুনঃ প্রবেশ না করিলে, দেহ নির্গুণ ও মৃত।" (১৪)

ব্রহ্মচারীবাবার শক্তিসাধনায় আমরা তুটি স্তর দেখতে পাই। প্রথম স্তরে তাঁর নিজের সিদ্ধি, ভগবতী মায়ের দর্শন ও প্রসাদলাভ। দ্বিতীয় স্তরে মহাশক্তির মহালক্ষ্মীরূপে মর্ত্যে অবতরণ জগতের কল্যাণের জন্য।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের শিবচতুর্দশী রাত্রে মা তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন যে-রূপে সেই আবির্ভাব, সেই রূপের নাম দিলেন তিনি "ভারতেশ্বরী"। এই নামের তুটি অর্থ। প্রথম অর্থ হলো, মা ভারতব্রহ্মচারীর ঈশ্বরী, তাঁর আরাধ্যা ইষ্টদেবতা। দ্বিতীয় অর্থ হলো, মা ভারতবর্ষের ঈশ্বরী যাঁর প্রকাশে ভারত আবার আধ্যাত্মিক মহিমায় জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে, ভারত হবে জগতের অধ্যাত্ম গুরু। এই পুণ্যভূমি ভারতই মা'র মনোনীত কর্মক্ষেত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রহ্মচারীবাবা প্রায়ই বলতেন, "বিগত মহাযুদ্ধে মা ইউরোপের অপক্ষাত্র শক্তি হ্রাস করিয়া এবং ম্লেচ্ছ শক্তিকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ভারতে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।" (১৫)

মহাশক্তিকে ভারতেশ্বরীরূপে জেনেও ব্রহ্মচারীবাবার শক্তিসাধনা সাঙ্গ হলো না। তিনি মা'কে জগতের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে নামিয়ে আনবার সাধনা করতে লাগলেন। এবং ১৩৩১ সনে বৃন্দাবনে মহা-লক্ষ্মীরূপে মা আবির্ভূতা হয়ে জানালেন, "ভারতের—তথা সমস্ত জগতের মঙ্গলার্থ প্রকাশিত হইব।" (১৬)

---

(১৪) ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী, পৃ ৩৩। (১৫) মহাবির্ভাব, পৃ ২৯।
(১৬) ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী, পৃ ৬৩।

মহাশক্তি ঋষি দৃষ্টিতে নানা রূপে প্রকট হয়েছে। নানা রূপের মধ্যে চারটি রূপই প্রধান। শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের নাম দিয়েছেন মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। দেবীমাহাত্ম্যে যদিও স্পষ্ট করে মহেশ্বরী সম্বন্ধে কিছু নেই তবু সেই রূপের ইঙ্গিত সেখানেও আছে। (১৭) সেই মহেশ্বরীই চণ্ডিকা, দুর্গা যার সম্বন্ধে দেবী উপনিষদে বলা হয়েছে—

যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈষা দুর্গা প্রকীর্তিতা।

দেবীমাহাত্ম্যে অন্য তিন রূপের কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে তাঁরা চণ্ডিকার ত্রিধা প্রকাশ—চণ্ডিকায়া সত্বয়োদিতা।

সর্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।

লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা॥

মহালক্ষ্মীকেই সবার আদ্যা বলা হয়েছে। তারপরে মহাকালী—

মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষা।

নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরত্যয়া॥

আর সর্বশেষের প্রকাশ হচ্ছে মহাসরস্বতী—

মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী।

আর্যা ব্রাহ্মী কামধেনুর্বেদগর্ভা সুরেশ্বরী॥ (১৮)

ব্রহ্মচারীবাবা মহালক্ষ্মীরূপেই মাকে মর্ত্যে নামিয়ে আনার সাধনা করেছেন। পরে তাঁর এক শিষ্যের নিকট তিনি নিজেই বলেছেন—

"সন্তানের অপার দুঃখদুর্দশা দেখিয়া এবার 'মা' স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এবং জগতের সদ্ব্যক্তিগণের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মীশক্তি প্রকাশ করতঃ শান্তি স্থাপন কার্য সম্পাদন করিবেন। প্রতিকূল অবস্থাসকল মায়ের ইচ্ছায়ই অনুকূল হইয়া আসিবে। মা

(১৭) S. Shankar Narayan-এর Glory of the Divine Mother, Pondicherry পৃ ৩৯।

(১৮) শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Mother গ্রন্থে চার রূপের বিশদ্ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

স্বয়ং কৃপা করিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে 'ক্রমে জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে।" (১৯)

এখন স্বতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে—কে এই মা? কোন্ রূপে তিনি মর্ত্যে আবির্ভূতা হয়েছেন? ব্রহ্মচারীবাবার নানা কথা, নানা ইঙ্গিত মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে এই মা হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমা। (২০)

আজ শ্রীমা, শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মচারীবাবা—কেউ-ই মরদেহে নেই। কিন্তু যে মহাশক্তি মর্ত্যে নেমে এসেছিল তা পার্থিব চেতনায় কাজ করে চলেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে কবে দেবরাজ্য স্থাপিত হবে তা নির্ভর করছে মানুষের গ্রহণক্ষমতার উপর। আমরা যদি দেহে মনে প্রাণে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে পারি তবে সেই সুদিন আসতে দেরি হবে না।

মহাপুরুষদের কাজ যে সূক্ষ্মশরীরেও চলে তাতে সংশয়ের স্থান নেই। শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচারীবাবা সম্বন্ধে যোগানন্দের নিকট লিখেছিলেন, "তোমার গুরুদেব বহু বৎসর ধরিয়া মায়ের নিকটেই আছেন, তুমি এখানে আসিবার অনেকদিন আগে, হয়ত তাঁহার মৃত্যুর অনেক পূর্বেই।" (২১)

ব্রহ্মচারীবাবা চেয়েছিলেন মায়ের পৃথিবীতে আগমনের পথ সুগম করতে; এবং তিনি তা-ই করেছেন। এখানেও শ্রীঅরবিন্দের উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। "তিনি নিজেই ত বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কাজ শ্রীমায়ের আবির্ভাবের পথ পরিষ্কার করা—এবং তাহা তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে করিয়াছিলেন।" (২২)

---

(১৯) মহাবির্ভাব, পৃ ৪৮। (২০) মহাবির্ভাব গ্রন্থে শ্রীযোগানন্দ এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

(২১) ঐ, পৃ ৩২৫। (২২) ঐ, পৃ ২০৪।

মহাশক্তির যন্ত্র

জগতে মহাশক্তির কাজ সম্পূর্ণ হতে পারবে তখনই যখন মানুষ দেহাত্মবোধ ভুলে হয়ে যাবে মায়ের হাতের যন্ত্র। "আমরা করি"—এই ভাব হচ্ছে অহঙ্কারপ্রসূত। "তুমি করাও তাই তো করি"—এই হলো সাধকের সত্যিকারের ভাব।

ব্রহ্মচারীবাবা তাঁর সাধনার ভিতর দিয়ে, জীবনের উদাহরণ দিয়ে, এই কথাই জানিয়ে গেছেন তিনি ছিলেন মা'র কোলের শিশু। মা-ই তাঁকে গড়ে তুলেছেন, জ্ঞান দিয়েছেন। যে মা'র কাছে, মহাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে তার আর কোন ভাবনা থাকে না। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে আছে—

যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্। আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকেই করে তুলি বীর্যবান, তাকেই করি ব্রহ্মবিৎ, তাকেই করি ঋষি, তাকেই করি সুপ্রজ্ঞ।

ব্রহ্মচারীবাবার জীবনে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি মা'র কৃপায় পেয়েছিলেন জ্ঞান, মা'র কৃপায় পেয়েছিলেন শক্তি যাতে সমাজের অনড়তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ভয় পান নি। তিনি সমাজের নানা দুর্নীতি ও অবিচারের সঙ্গে লড়াই করেছেন। কিংবা বলতে পারি মা-ই সংগ্রাম করেছেন তাঁর ভিতর দিয়ে। দেবীসূক্তে আরো আছে—

অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ। জীবের জন্য আমি সংগ্রাম করি—স্বর্গে পৃথিবীতে আমি প্রবেশ করে আছি। (২৩)

মা'র কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ ছিল নিঃশেষ। জীবনের ক্ষুদ্রতম কাজও মা'র প্রত্যাদেশ ছাড়া করতেন না। তাঁর জীবনীতে লেখা হয়েছে—

"আদেশানুক্রমে ভিক্ষা করিতেন, আদেশ হইলে ভোগের জন্য

---

(২৩) অনুবাদ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, "বেদমন্ত্র" পণ্ডিচেরী ১৯৬৬। পৃ ১৫২-৩।

অন্নাদি পাক করিতেন, নতুবা পাকই হইত না। ভোগাদি নিবেদন করিয়া গ্রহণের আদেশের অপেক্ষায় থাকিতেন। গৃহীত হওয়ার আদেশ না হইলে অন্নাদি ফেলিয়া দিতেন।" (২৪)

বুঝতে হবে আমি কর্তা নই। তিনি লিখেছেন, "জ্ঞানরূপ বালক হইয়া অর্থাৎ কর্তা না সাজিয়া (বালক কোলে না লইয়া) মায়ের কোলে বসিয়া তাঁহার ভালবাসা পাইবার জন্য পুনঃপুনঃ আব্দার কর।" (২৫)

এই যে আব্দার তারই অন্য নাম আস্পৃহা থাকলে ভগবতী শক্তিই কৃপারূপে জীবকে নিয়ে যায় তার লক্ষ্যের দিকে। "একমাত্র ভগবৎ কৃপা ভিন্ন জীবের আর অন্য উপায় নাই। (২৬) এই কথাই শ্রীঅরবিন্দও" বলেছেন "মা" গ্রন্থের সুরুতে। "আমাদের প্রচেষ্টার মহৎ ও কঠিন যে লক্ষ্য তা কেবল সাধিত হতে পারে দুটি শক্তির সহযোগে: এক দৃঢ় অমোঘ আস্পৃহা যা নীচ থেকে করছে আহ্বান, আর এক পরম কৃপা যা উত্তর দিচ্ছে উপর থেকে।"

ব্রহ্মচারীবাবা জানতেন যা সত্য তা প্রতিষ্ঠার জন্য মহাশক্তিই কাজ করে চলেছেন মানুষের ভিতর দিয়ে। আমাদের হতে হবে মায়ের কোলের শিশু, মায়ের যন্ত্র। অচেতনার, নির্জ্ঞানের মোহে পড়ে আমরা যেন ভগবানের কাজে বাধা না দিই। আর আমরা যদি সজ্ঞানে মায়ের যন্ত্র হতে পারি তবে আমরা হই মর্ত্যে দেবলীলার অধিকারী। যিনি সত্যকে তাঁর অন্তরে আবিষ্কার করেছেন তিনি যদি সেই সত্যকে জীবনে ও সমাজে প্রকট করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন যে, যাহা সত্য তাহা পালন করিতে যিনিই বদ্ধপরিকর হইবেন বা পালন করিবেন, তাঁহার পশ্চাতে অর্থাৎ সেই কার্য্যের পশ্চাতে সেই সত্যস্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তি সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন এবং করিয়া থাকেন। ইহা সত্য সত্য ত্রিসত্য বলিলাম।" (২৭)

(২৪) ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী, পৃ ১৯। (২৫) ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী পৃ (২৬) ঐ পৃ ৮ (২৭) ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী, পৃ ১২১

কিন্তু কর্মীর—মহাশক্তির যন্ত্রের—প্রথম কথা হচ্ছে মুক্তি, কামনা থেকে, কর্মের ফলপ্রাপ্তির লোভ থেকে। কর্মীকে হতে হবে "নিরাশী", "ত্যক্ত সর্বপরিগ্রহ"। আমরা যখন কামনা আর অহং-এর বশীভূত হয়ে কাজ করি তখনই কর্মে আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ (৪,২৩)

যিনি মুক্ত, আসক্তিহীন, চেতনা যাঁর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, যিনি যজ্ঞ-রূপে কর্ম করেন, তাঁর কর্ম লীন হয়ে যায়।

কর্মত্যাগ ভারতের আদর্শ নয়। কর্মফল ত্যাগ করতে হবে। ঈশোপনিষদ্‌ও তাই বলেছে, মানুষ দীর্ঘজীবন কামনা করবে কর্ম করবার জন্য, কর্মের ভেতরেই সে বেঁচে থাকবে। কর্ম মানুষের সঙ্গে লেগে থাকে না—ন কর্মলিপ্যতে নরে।

ব্রহ্মচারীবাবা ছিলেন সন্ন্যাসী; তিনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ। শৈশব থেকেই জানতেন, "ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।" কিন্তু প্রাপ্তিতে বিভোর হয়ে পৃথিবীকে ভুলে গেলেন না। কারণ পৃথিবী মায়েরই প্রতিমা। তিনি বুঝেছিলেন, তিনি মায়ের প্রেরিত মায়ের কর্মের জন্য। "আমি তোমাদের নিকট মায়ের প্রেরিত", বলতেন তিনি। তাই মুক্ত হয়েও তিনি স্বদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে উৎসাহ দেখিয়েছেন; বিপ্লববাদীদের অনুপ্রাণিত করেছেন, সংগঠনমূলক কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। সন্ন্যাসী হিসেবে, মুক্ত পুরুষ হিসেবে, স্বাধীনতা বা স্বরাজে তাঁর ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন ছিল না। "এই স্বরাজের জন্য বা স্বাধীনতার জন্য কোন ঠেকা নাই, কারণ আমি সর্বদাই স্বাধীন—কেন না আমি কাহারো অধিকারে থাকি না।" (২৮)

(২৮) ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী, পৃ ২৫

মুক্তির মধ্যে তিনি মায়ের যন্ত্র হয়ে জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন এবং এইভাবে কাজ করাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

জগতের মঙ্গলবিধান

জগতের পূর্ণতম মঙ্গল তখনই সম্পাদিত হবে যখন ভূমা প্রতিষ্ঠিত হবে ভূমিতে—ভূমৈব সুখং—যখন মরজীবন রূপান্তরিত হবে দিব্যজীবনে; যখন মানুষ ঈশ্বরলাভ করে নরলীলায় প্রবৃত্ত হবে। "ঈশ্বর লাভ না হইলে নরলীলার অধিকারী হওয়া যায় না।" (২৯) সারা জগৎ হঠাৎ রূপান্তরিত হয়ে যাবে না, যেতে পারে না। রূপান্তরের কাজ চলেছে ধীরে ধীরে। সারা পৃথিবীতে, কেবল ভারতে নয়, জড়বাদী ইউরোপ, আমেরিকায়ও, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক আস্পৃহা ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে। তারা তাকাচ্ছে ভারতের দিকে। কিন্তু রূপান্তরের কাজ কঠিন। আমাদের সময়ের মাপে দেখলে মনে হবে খুবই মন্থর। তবু দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ, মৃত্যু, দারিদ্র্য, দুঃখের মধ্যে মানুষ নানাভাবে চেষ্টা করে চলেছে শান্তির জন্য, সর্বজনের সুখের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য। রূপান্তরের কাজ যেমন সূক্ষ্মজগতে চলেছে তেমনি চলেছে স্থূলজগতেও। আধুনিক যুগের অন্য মহাপুরুষদের মতো, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের মতো, ব্রহ্মচারীবাবা তাই বাইরের জগতেও কাজ করেছেন, নতুন করে সমাজকে গড়বার প্রচেষ্টায়। মা তাঁকে বলেছিলেন, "ভারত স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে সত্যধর্ম স্থাপন করিয়া দেবতা মানবে অপূর্ব লীলা করিব। (৩০)

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, এই ছিল ব্রহ্মচারীবাবাব আদর্শ— যেমন করে রামচন্দ্র "ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণাদি রাক্ষসকুল নির্মূল করিয়া পরাধীন ভারতকে পুনরুদ্ধার করিয়া স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।" (৩১) তিনি তাই বারবার পূর্ববঙ্গের নেতাদের নিকট চিঠি দিয়েছেন; তাঁদের বোঝাতে চেয়েছেন, দেশোদ্ধারের কাজ

---

(২৯) ঐ, পৃ ১৩। (৩০) ঐ পৃ ১৫ ১৫। (৩১) ঐ, পৃ ২০

ভগবানেরই কাজ, সমাজের মঙ্গলের জন্য। জাতীয়তাকে তিনি ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখেন নি। ১৩৩১ সনে তিনি লিখেছিলেন, "ধর্মনীতির ভিতর দিয়া কংগ্রেসের ভাব প্রচারিত হইলে দেশ ও সমাজ সদাচারী, সদ্ভাবাপন্ন ও কর্মঠ হইবে।" (৩২) জাতীয়তার সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ অনেক তথাকথিত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের চোখে বিসদৃশ ঠেকেছে। ব্রিটিশরাজের আমলাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারাও বিপ্লবীদের শক্তি-আরাধনা, গীতাপাঠ, ব্রহ্মচর্যপালন প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করেছে। অগ্নিযুগে শ্রীঅরবিন্দ নানা রচনার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন ভারতীয় সভ্যতা জীবনকে খণ্ডিত করে দেখেনি। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম, ঈশ্বরের উপলব্ধি। তাই আধ্যাত্মিকতার উপরই স্থাপন করতে হবে সমাজ ও জাতীয়তা। এখানে ধর্ম বলতে বিভিন্ন ধর্মমত—রিলিজন্—বোঝানো হচ্ছে না। এই ধর্ম সমস্ত মতভেদের উর্ধ্বে আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে দৃঢ়মূল। ব্রহ্মচারীবাবা বলেছেন, ধর্ম ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব মিটে গেলে "ধর্মনীতির প্রতিষ্ঠায় চিত্তশুদ্ধি হইলে মিথ্যাপ্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি অপসারিত হইয়া অহিংসা ও একতা আসিয়া আপনা হইতেই বর্তমান যুগ সত্যযুগে পরিণত হইবে; কারণ ধর্ম সম্বন্ধে মানবজাতি সকলেরই একমত। ঋষিগণ বলিয়াছেন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধং দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

উক্ত লক্ষণগুলিই মানবীয় ধর্ম। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক ভেদ থাকিতে পারে না।" (৩৩)

দেশের উন্নতির জন্য তিনি নানাভাবে তাঁর মত প্রচার করেছেন। সমাজের নানা কুসংস্কার, অন্যায়, অত্যাচার তিনি দূর করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর সমস্ত প্রয়াসের মূলে ছিল মায়ের নির্দেশ। গতানুগতিক সমাজের মত, শাস্ত্রের মত, পাঁজি-পুঁথির মত তিনি মানতে নারাজ

(৩২) মহাবির্ভাব, পৃ ১০৫ (৩৩) মহাবির্ভাব, পৃ ১০০।

ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমরা লৌকিক ভাল মন্দের ধার ধারি না, ধারিবও না।" (৩৪) তিনি গোঁড়ামি মানতেন না; গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর অনেক মুসলমান শিষ্যও ছিল। তিনি জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। মা তাঁকে বলেছিলেন, "জাত কি রে?" এই একটি-মাত্র প্রশ্নে মা তাঁর অন্তর থেকে জাতের সংস্কার নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি তপস্যাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতে পারেন।" তিনি আরো বলেছেন, "বর্তমানে ভগবদিচ্ছায় এই সসীম চারিটি বৃহৎ জাতি এবং শত শত উপজাতি ভাঙ্গিয়া সমাজকে এক ব্রাহ্মণজাতিতে পরিণত করিতে হইবে।" (৩৫)

তিনি শূদ্রকেও বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষা দিয়েছেন; তাদের দিয়েছেন দেবার্চনার অধিকার। ক্রমে গোঁড়া সমাজও তা মেনে নিয়েছে। একটি ঘটনা তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন ১৩৩২ সনে এক চিঠিতে—

"সেদিনের কথা—কেন্দুয়ার নিকট আমতলা গ্রামের দশরথ নামক এক নমঃশূদ্রকে পূজার্চ্চনার বিধি দিয়েছিলাম। সে বাড়ীতে মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া ঘণ্টাবাদ্য করিয়া পূজা করিত বলিয়া এত বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গ্রামের ব্রাহ্মণগণ তাহাকে কত প্রকার নির্য্যাতন করিয়াছেন। আর এখন সে আনন্দের সহিত উচ্চ উচ্চারণ প্রণবের সহিত পূজাদি করিতেছে, এখন সমাজ নীরব।" (৩৬)

এই দশরথই একবার অক্ষয় তৃতীয়ায় মায়ের পূজা করতে চাইলেন, কিন্তু প্রতিমা সময়মতো তৈরী না হওয়ায় তিনি ব্রহ্মচারীবাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা অক্ষয় তৃতীয়া চলিয়া যাইতেছে, মায়ের মূর্ত্তি এখনো নির্ম্মিত হয় নাই, মায়ের পূজার কি হইবে?" তিনি উত্তর

---

(৩৪) মহানির্বাণ, পৃ ৮৭। (৩৫) ঐ, পৃ ৪৫ ৪৬।

(৩৬) ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী, পৃ ১২০।

দিলেন যে, মা তাঁকে বলেছিলেন, "তুই যে তিথিতেই আমার পূজা করিবে সেই তিথিই অক্ষয় তিথি হইবে।"(৩৭)

এমনি নানা প্রকারে তিনি স্থূল জগতে সমাজের মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ ছিল অন্তরজগতে। মহাশক্তির প্রভাবে অন্তরের রূপান্তরের দ্বারাই ক্রমে সমাজ রূপান্তরিত হতে পারবে। এই আন্তর রূপান্তরকেই তিনি বলেছেন "চিত্তশুদ্ধি"। প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রহ্মচারীবাবার কাজ কতদূর সফল হয়েছে। এই প্রশ্নই শ্রীঅরবিন্দকে করেছিলেন যোগানন্দ ব্রহ্মচারী। তার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ যা লিখেছিলেন তা এখানে তুলে দিচ্ছি—

"যোগানন্দ, প্রত্যাদিষ্ট কর্ম্মের মধ্যে সত্য যাহা থাকে তাহা কখনও বৃথা যাইতে পারে না—হয় তাহা কার্য্য করিয়াই চলে, নয়ত রূপান্তর গ্রহণ করে।

"তোমার গুরুদেবের শিক্ষা এবং আমাদের এই যোগের শিক্ষা মূলতঃ এক ; তিনি যাহাকে চিত্তশুদ্ধি বলিয়াছেন আমরা চৈতন্যরূপান্তর বলিলে তাহাকেই বুঝি। এখানকার শিক্ষা আরও পরিণত, কেন না দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠার যে অতিমানস পন্থা তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত। তেমনই সত্যোপলব্ধির প্রণালীও এখানে অন্যরূপ কারণ, তাহা এমন-ভাবেই রচিত হইয়াছে যে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকলেই দিব্য সত্য ও দিব্য জীবনরূপ সমৃদ্ধির ভোগে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। কিন্তু যাহারা পূর্ববর্ত্তী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা নিষ্ফল, কেন না তাহাদের দৃষ্টি এখনও অতীত রূপরাজি ও অনুভূতিচয়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ, সে-গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তুমি সে-মনোভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছ এবং একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব আনিতে পারিয়াছ, ভালই হইয়াছে—কাহারও যদি আসিতে হয় তো আসিবে। আমাদের একাগ্র চেষ্টা হইবে—সবাইকে

(৩৭) ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী, পৃ ৬১।

প্রস্তুত হইতে, এইজন্য যে তোমার গুরু যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা যেন এবার এখানে সিদ্ধ হইতে পারে।" (৩৮)

ব্রহ্মচারীবাবা ছিলেন মায়ের প্রেরিত। তিনি যে কাজের জন্য এসেছিলেন তা তিনি করে গেছেন। তা কখনো ব্যর্থ হবার নয়। জগতের মঙ্গলবিধান হবেই। জগতের সর্বোত্তম মঙ্গল হলো দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে অতিমানস সমাজের সংস্থাপন।

—o—

ধর্মধারার মিলনসেতু ভারতব্রহ্মচারী

আচার্য্য শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী

মহাত্মা ভারতব্রহ্মচারী স্বনামধন্য মহাপুরুষগণের অন্যতম ছিলেন। ভরণের ভাব লইয়াই ভারতভূমি প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। আর্থিক সম্পদে ভারত বর্তমানে অন্য দেশের তুলনায় ন্যূন হইলেও পারমার্থিক সম্পদে ভারত এখনও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং সকলের চিত্তাকর্ষকও হইয়া রহিয়াছেন। ভারতভূমির ভাব ভারতের ভার-হরণকারীগণের মধ্যে প্রশমিত হইয়াছিল। এইভাবে ভূষিত হইতে গিয়া আমাদের আলোচ্য ব্রহ্মচারী মহারাজ 'ভারত' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

ভরণ-পোষণের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শ্রদ্ধেয় ভারতব্রহ্মচারী দেশ ও ধর্মকে অভিন্ন বুঝিয়া চলিতে আগ্রহী ছিলেন। সাধুগণকে শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রহ্লাদ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈষয়িক স্বার্থপরগণকে একভাগে পারমার্থিক স্বার্থপরগণকে অন্যভাগে রাখিয়া প্রহ্লাদ উভয়ের সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে ৭।৯।৪৪ শ্লোকে বলিলেন—

(৩৮) মাহাবির্ভাব, পৃ ৩২।২৮

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা,
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥

হে দেব, হে নৃসিংহ ভগবান, মুনিগণের প্রায় সকলেই স্ব স্ব মুক্তি কামনা করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্বক অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। অপর স্বার্থীগণ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে বলিলেন,

"মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।"
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥ [ভাঃ ৭।৯।৪৬]

মৌন অবলম্বন, ব্রতপালন, শাস্ত্রশ্রবণ, তপস্যা অধ্যয়ন, স্বধর্মপালন ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা, নির্জনবাস, মন্ত্রজপ ও সমাধি এই দশবিধ মুক্তির সাধন প্রসিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু ঐ সকল সাধন প্রায়ই অজিতেন্দ্রিয় ও দাম্ভিকগণের জীবিকা হইয়া থাকে।

এই দুই স্বার্থীর পরিবেশের বাহিরে থাকার অভিপ্রায়ে প্রহ্লাদ নৃসিংহ দেবকে বলিলেন, আমি পূর্বোক্ত শোচনীয় নিপীড়িত জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী নিজের বিমুক্তির অভিলাষ করি না। আমাদের আলোচ্য শ্রদ্ধেয় ভারতব্রহ্মচারিজী প্রহ্লাদের সুরে সুর মিলাইয়া সকলের মুক্তিসাধনে নিজ মুক্তির পথ অতিক্রম করিতে অভিলাষী ছিলেন। এইকালে তাঁহার মত পরার্থপর প্রহ্লাদ অতি অল্পই দেখা যায়।

ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতু হইতে ধর্ম শব্দ এবং ধরা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা ধরিয়া রাখেন, যাহাকে ধরিয়া রাখি তাহা ধর্ম ও ধরা উভয় নামে অভিহিত হইতে পারে। ধর্ম, আদর্শ, ধরা বাস্তব বলা চলে। ধর্মে ধরায় যে সম্বন্ধ আদর্শ ও বাস্তবে সেই সম্বন্ধ। ধরার যাবতীয় সমস্যা

সমাধানের জন্য ধর্মপ্রবর্তিত হইয়াছে। সামাজিক সমস্যাগুলিকে রূপক অলংকারের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে গেলে ধর্মশাস্ত্রের প্রসংগে উপনীত হইতে হয়। রহস্য ভাষায় বা সন্ধ্যা ভাষায় প্রকাশিত হইতে গিয়া অনেক রাজনৈতিক সমস্যা ধর্মশাস্ত্রের উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। মহাত্মা ভারত ব্রহ্মচারিজী এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, এজন্য তিনি ধর্মানুশীলন ও দেশ-সেবা সমান্তরালভাবে প্রচলিত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ময়মনসিংহ জেলার সর্বত্র তিনি চরকার প্রবর্তন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় দেশের সর্বত্র বস্ত্রাভাব দূরীকরণে এবং যুবকগণকে স্বাবলম্বীকরণে যথেষ্ট সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। দেশের মুক্তি ও দশের মুক্তি উপেক্ষা করিয়া নিজের মুক্তিসাধনে চেষ্টিত না হওয়ায় মহাত্মা ভারত ব্রহ্মচারীর নাম মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ভারত ব্যাপিয়া চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিল।

আলোক যখন আসে তখন বিদ্যুতের মত আসিলে তাহা দৃষ্টিশক্তির অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হয়। এই আলোকেই অনেকেই অন্ধ হইয়া পড়েন। স্বাধীনতা এইভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া দেয়। অসহযোগ আন্দোলন ব্যারিষ্টার গান্ধী মহাত্মা গান্ধীতে পরিণত হওয়ায় তাঁহার সহিত যোগদানকারিগণের মধ্যে সংযমের আবশ্যকতা অত্যধিক হইয়া উঠিয়াছিল। অধ্যাপক অরবিন্দ শ্রীঅরবিন্দে পরিণত হওয়ায় সে যুগে বিপ্লবীগণের মধ্যে যোগসাধনার চর্চ্চা ও চর্য্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল। মহাত্মা ভারতব্রহ্মচারী ময়মনসিংহে গ্রাম্যগান্ধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি দেশকর্মিগণের চরিত্র গঠনে কঠোর শাসনের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সকলের আকর্ষণজনক ছিল বলিয়া তাঁহার স্নেহের শাসনকে অনেকে শিরোধার্য করিয়া লইতে উৎসুক ছিল। এইজন্য গুরুর গৌরবে অনেকে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিল। দেশকর্মিগণকে তিনি অষ্টাঙ্গযোগের প্রণালীতে অভ্যস্ত করাইতে আসনাদি শিক্ষা দিতেন। আবার তাহাদের মধ্যে বৈরাগ্য বা স্বার্থত্যাগের শিক্ষা দিতে

তিনি উপনিষদের আলোচনায় তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত রাখিতেন ধর্মশাস্ত্রে আদর্শ ত্যাগী ও কর্মিগণের জীবনী আলোচনায় তাঁহার সহকর্মিগণ তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা পাইতেন।

তিনি পরোপদেশে পাণ্ডিত্য দেখাইতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবধারা অনুসরণ করিয়া নিজে আচরণ করিয়া অন্যকে আচারবান করিতেন। শাস্ত্রে ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যের কথা বলা হইয়াছে। ষড়ৈশ্বর্যের মধ্যে বৈরাগ্যও একটা ঐশ্বর্য। অবতারগণের মধ্যে এই বৈরাগ্য ঐশ্বর্যের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছেন। সঞ্চয়বৃত্তিবিহীন নিষ্কিঞ্চন জীবনযাপনের দৃষ্টান্তরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা সমাপ্তিকালে বলিয়াছেন :—

"তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং।" [ভাঃ ১২।১৩।১৮] অর্থাৎ এই ভাগবতে জ্ঞান-বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত নৈষ্কর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈরাগ্যকে আবিষ্কৃত উপকরণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত স্থান দিয়াছেন। বৈরাগ্যবিহীন ভক্তিতে ভোগের প্রসঙ্গ আসিতে পারে। এজন্য বৈরাগ্যকে গীতায়ও উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। কর্মযোগীর বৈরাগ্য না থাকিলে জাগতিক ব্যাপারে বাস্তবের প্রতি আকৃষ্ট থাকায় আদর্শের প্রতি ধাবিত হইতে পারে না। সৈনিক যখন সংগ্রামে মৃত্যুর মুখে ধাবিত হয় সাংসারিক সুখের স্বপ্ন তাহাকে পশ্চাদাকর্ষণ করিতে পারেনা। মহাত্মা ভারতব্রহ্মচারিজী এইরূপ সংসারে সন্ন্যাসী গঠনে সিদ্ধহস্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগী হইতে বলিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অনুযায়ীগণকে যোগী করিয়াছেন। মহাত্মা ভারতব্রহ্মচারী এই ধারাকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত করিয়া কর্মযোগীর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে সিদ্ধসঙ্কল্প শ্রীমদ্‌ভারতব্রহ্মচারী তাঁহার পত্রাবলীতে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত—"আমার জন্যই মা একেবারে মাটি হয়ে গেছে"—কথাটি সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। দেবতার

জনতায়, ধর্মে ধর্মায়, নারায়ণে নরে, শিবে জীবে, গৌরীতে নারীতে একই ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া এবং করাইয়া তিনি ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রোক্ত বাণী—"অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ হোতারম্ রত্নধাতমম্" অর্থাৎ সেই অগ্নিকে আমরা স্তুতি করি যিনি পূজ্য-পূজক দেবতা-ঋত্বিক দাতা-গ্রহীতা উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান—এই বেদবাক্যকে লৌকিক ভাষায় তথা সামাজিক আচরণে প্রবর্তিত করিয়া কৃতকৃতার্থ তথা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

ঘটনা ও রটনার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রসঙ্গ করা ও প্রবন্ধ লেখা প্রায়ই সম্ভব হয় না। ভক্ত ভগবানকে, শিষ্য গুরুকে, অনুগত অগ্রগামীকে এমন এক প্রীতির চক্ষে দেখেন যেই প্রীতির প্রেম পক্ষপাতী না হইয়া যায় না। সেই বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ধর্মজগতে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সমস্ত গ্রন্থই প্রেমের পক্ষপাতজনিত ভাষায় পরিপূর্ণ। এ কথাগুলির মধ্যে অব্যাপ্তি-দোষ যতই থাকুক না কেন অতিব্যাপ্তিদোষ তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে বেশী আছে। অসীমকে সীমার মধ্যে আনা, অব্যক্তকে ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য কর্ম ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুক্ত অংশকে উক্তির মধ্যে আনিতে পথভ্রান্ত হইয়া অবান্তর কথার সৃষ্টি করার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গেলে ইহা দুঃখের বিষয়। সমদর্শী সমালোচকের মুখে প্রায়ই ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য বাহির হয়। কিন্তু ভক্ত সমালোচকের চশমা পরিয়া দেবদর্শন, গুরুদর্শন, প্রিয়দর্শন করিতে যান না বলিয়া ভক্ত সমালোচকের সতর্কতাবাণী স্মৃতিপথে রাখিতে পারেন না।

আমাদের আলোচ্য সাধুবাবা শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী সম্বন্ধে যত পুস্তক লিখিত হইয়াছে, বিশেষতঃ তাঁহার লিখিত যত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে সে বিষয়ে উপরিলিখিত মন্তব্য স্মৃতিপথে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ভক্ত একদেশদর্শী, ভক্ত প্রেমান্ধ, অন্ধের হাতী দেখার উপাখ্যান তাহার পক্ষে প্রযোজ্য। সে হাতীর কানে হাত দিয়া

হাতীকে কুলা বলিতে পারে, হাতীর শুঁড়ে হাত দিয়া হাতীকে মূলা বলিতে পারে। হাতী সম্বন্ধে কুলা ও মূলার উপমা তাহার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া তাহার হাতীদর্শনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলে। ভক্ত ভগবানকে, শিষ্য গুরুকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া যথাসাধ্য অনুভূতির যে অপূর্ণ অসমীচীন বর্ণনা দেন তাহা উপেক্ষার বিষয় না হইয়া আস্বাদনের বিষয়ও হইতে পারে। সমালোচকের সহনীয়তা, পরমতসহিষ্ণুতা নিজভাবের উদারতা প্রদর্শনে যাহা করণীয় তাহা বলিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ সর্বভূতে যিনি নিজকে ও নিজের ভগবানকে দর্শন করেন এবং নিজের মধ্যে সর্বভূতকে ও সর্বারাধ্য ভগবানকে দর্শন করেন তিনিই উত্তম ভাগবত। এরূপ উত্তম ভাগবত হওয়ার আগ্রহ আলোচ্য আলোচক, লেখক পাঠক, বক্তা শ্রোতা সকলের মধ্যেই আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের উত্তম-ভাগবতের চশমা দিয়া যদি শ্রীমদ্‌ভারতব্রহ্মচারী মহারাজের পত্রগুলি পড়া যায় তাহাতে অশেষ আনন্দের সহিত উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রতিধ্বনিত হইয়াছে দেখা যায়।

শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী মহারাজ নানা অধিকারীর জন্য নানা স্তরের উপদেশ দিয়াছেন। শিষ্য যদি অবাধ্যই না হইল তবে পরিত্রাতার যোগ্যতা গুরুর মধ্যে আছে কিনা দেখার সুযোগ ঘটে না। এই পরিত্রাতা অবাধ্য শিষ্যকে আনিতে কতবার তাহাকে একই পথে অগ্রসর হইতে দিয়া আবার তাহাকে পশ্চাদ্‌গামী করিয়াছেন পুনরায় পশ্চাদ্‌গামীকে পুনরাবর্তিত করাইয়াছেন তাহা দেখার সৌভাগ্য সৃষ্টি করিতে ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়, মহাপুরুষের জীবনী রচিত হয় এবং আমাদের আলোচ্য সাধুবাবার কথাও প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপ

বলার পর সেইরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই এমন মন্তব্য করার পূর্বে গুরু-শিষ্য সংগ্রামে স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কথা বলিলে সকল দিক রক্ষা হয়। আমাদের আলোচ্য মহাত্মাজী তাহা করিয়াই সমালোচকের সম্মান অর্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের মধ্যে সকলকে দেখিয়াছেন ও সকলকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি নিজে উত্তম ভাগবত ছিলেন এবং উত্তম ভাগবত সৃজনে সযত্ন ছিলেন। এজন্য তিনি প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রণম্য হইতেছেন।

মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎষু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

অর্থাৎ একই ঈশ্বরের অধীনে আমরা সকলেই চালিত হইতেছি বলিয়া উচ্চের প্রতি শ্রদ্ধা, সমজনের প্রতি ভালবাসা এবং তুচ্ছের প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে উপেক্ষা প্রদর্শন করাই মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ। দোষদর্শিতা অপেক্ষা গুণগ্রাহীতা অধিকতর প্রশংসনীয়। কিন্তু গুণগ্রাহীতা অপেক্ষাও দোষে ক্ষমা মানুষকে দেবপ্রতিম করিয়া তোলে। শাস্তি দেওয়ার শক্তি থাকিতেও স্বস্তির অনুরোধে শান্তির আবেদনে উপেক্ষায় তুচ্ছকে আপ্যায়িত করা মহত্বের লক্ষণ। আমাদের আলোচ্য মহাত্মাজী তাঁহার জীবনের ঘটনায় ও রটনায় অনুগতগণকে উত্তম ভাগবত হইতে না পারিলে অন্ততঃ মধ্যম ভাগবত হইবার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধগণ আলোচনায় ও অনুষ্ঠানে, চর্চায় ও চর্যায় তাঁহার এই আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকিয়া চলিতে পারি এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষাজীবী আমি এই প্রবন্ধের অপূর্ণ সমাপ্তি ঘোষণা করি।

—০—

পুণ্যশ্লোক শ্রীমদ্‌ভারত ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও বাণী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রীমদ্‌ভারত ব্রহ্মচারী সার্থকনামা আত্মসমর্পণ-যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ সার্থকনামা এইজন্য যে তিনি নিজেকে ভারতের বৈদিক-তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ভাবধারায় নিষিক্ত ও নিষ্ণাত করে 'মামেকং শরণং ব্রজ'—যোগে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অথচ অন্যান্য মুক্তাত্মার মত দেশের পরাধীনতার সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকেন নি।

তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয় নি। তিনি আবির্ভূত হন ১২ই শ্রাবণ ১২৮১ বঙ্গাব্দে। তিরোধান করেন ২৮শে ভাদ্র ১৩৩৩ সনে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সোনার ভারতের' দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রাবণ, ১৩৬৮ সংখ্যায়,—তাঁহার আবির্ভাব সংখ্যায় আমি 'সোনার ভারত' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখি তাঁর ৮৮তম আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে। উহার সম্পাদক ছিলেন বন্ধুবর শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়। বর্তমান বৎসরে তাঁহার শত-বার্ষিক প্রকাশন ও প্রচার বিভাগে তিনিই সম্পাদক হয়েছেন দেখে তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ কচ্ছি। তাঁহার পত্রাবলীতে সুসাহিত্যিক শ্রীপূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য সুনিপুণ শিল্পী শ্রীভারতের দিব্যজীবন, জীবন দর্শন,—কঠোর সাধনা ও সিদ্ধি, তাঁহার আত্মসমর্পণযোগ, সমসাময়িক ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির চিন্তানায়ক মনীষিবৃন্দের সহিত তাঁহার নিগূঢ় যোগ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি সতর্ক ও বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিদান করে একটী মনোজ্ঞ আলেখ্য রচনা করেছেন।

ইতিহাসের সঙ্কটকালে ভারতবর্ষের চিরদিনের প্রার্থনা--'আবিরাবী র্ম এধি'—হে প্রকাশস্বরূপ তুমি তোমার পূর্ণশক্তিতে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ কর এবং 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—অন্ধকার হতে আমাদের আলোকে নিয়ে চল। শ্রীভগবানেরও প্রতিশ্রুতি 'তদাত্মানং

সৃজাম্যহম্' শ্রীশ্রীমার মুখের আশ্বাসবাণী "তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্"।

তাই পরাধীনতার 'মগ্নপঙ্কে সুদুস্তরে' যখন আমরা বহিশত্রু ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত-এবং অন্তঃশত্রু অরি ষড়্‌বর্গের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে 'হা হতোঽস্মি' বলে চিৎকার করি তখনই আবির্ভূত হন, অবতীর্ণ হন ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষগণ। তাই এই যুগসঙ্কটকালে আমাদের মধ্যে পেয়েছি লোকোত্তর মহাপুরুষদের,—পেয়েছি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র, অরবিন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, ভগ্নী নিবেদিতা, মাতা মাতঙ্গিনী, পওহারী বাবা, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ভারত ব্রহ্মচারী, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, সাধু তারাচরণ, ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, মহাত্মাজি, তিলক, লাজপৎ, মাষ্টার-দা, ভগ্নী প্রীতিলতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং অগ্নিযুগের শহীদবৃন্দকে।

ইঁহারা অরণ্যের আরণ্যক উপনিষদকে গৃহীর গৃহে স্থাপন করেছেন,—বনের বেদান্তকে এনেছেন ঘরে ঘরে,—যুবক-যুবতীরা এক হাতে গীতা এক হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আততায়ী নিধনের আত্মদান-যজ্ঞে নিজেদের পূর্ণাহুতি দিতে পেরেছেন। অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'রে পুত্র! ভয় নাহি' ব'লে,—অমনি "গুরুজির জয়"—বলিয়া বালক লুটালো ধরণীতলে'। কত ক্ষুদে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে।

দেশের মুক্তি এবং আত্মার মুক্তির যুদ্ধে যাঁরা অগ্রণী—'যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ'—সেই সেনানায়ক ও নায়িকাদের কয়েকজনের মাত্র নাম স্মরণ করলাম স্বস্তিবাচন হিসাবে।

আমরা মাতৃজাতিকে চিতাগ্নিতে জীবন্ত দগ্ধ করেছি,—সাগরে শিশুদের সলিল-সমাধি দিয়েছি, নির্জলা একাদশীতে মুমূর্ষু বিধবার তৃষ্ণাশুষ্ক মুখে জল দিই নি।

মহাপুরুষরা আসেন আমাদের কুসংস্কার দূর করে, সুসংস্কারের দ্বারা

পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃত করতে। জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-তিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলন করতে। ভারতব্রহ্মচারীবাবা সংশয়াপন্ন তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের বহু জটিল সমস্যার প্রাঞ্জল মীমাংসা করে দিয়ে তাঁদের সত্যের পথে আলোকতীর্থে পৌঁছে দিয়েছেন। এইরূপ উত্তরণের ইতিহাস তাঁহার অসংখ্য পত্রের মধ্যে বিধৃত হয়েছে,—অসংখ্য ভক্ত শিষ্যের সকৃতজ্ঞ স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে।

'আপনি আচরি ধর্ম জগতে শিখায়' এইরূপ নিষ্ঠাবান স্বয়ং আচরণশীল আচার্য ছিলেন তিনি,—তাঁর জীবনই তাঁর 'বাণী'। আচার্যের সংজ্ঞায় পাই—

অচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে চৈব আচার্যঃ স প্রকীর্তিতঃ॥

যিনি শাস্ত্রার্থ চয়ন করেন, শাস্ত্রের উপদেশ ভক্ত ও শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অবশ্য-কর্তব্যরূপে স্থাপন করেন, এবং স্বয়ং তাহা আচরণ করেন তিনিই প্রকৃত আচার্য। তিনি, উপদেশের মুখে, কেবল 'কর' বলিয়াই দায়মুক্ত হতেন না,--নিজে করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেখাইয়া দিতেন।

প্রসাদে খাদ্যবুদ্ধি করা নিষেধ। একবার তাঁর প্রব্রজ্যার পথে, না-জেনে, এক মুসলমান গ্রামে তিনি তাঁর ভিক্ষালব্ধ অন্ন ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন করে খেতে গিয়ে দেখেন তাতে মুর্গীর মাংসের কুচি মিশ্রিত রয়েছে। তিনি সেই প্রসাদান্নে, খাদ্যবুদ্ধি না করে সংস্কারমুক্ত প্রসন্ন-মনে তাই আহার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। আবার তপস্যাকালে তিনিই দিনের পর দিন অনাহারে, অনিদ্রায় সেই ইষ্টদেবীকে আত্মনিবেদন করে আকুলভাবে গলদশ্রুলোচনে প্রার্থনা করেছেন। পত্রাবলীর প্রাক্-কথনে বন্ধুবর পূর্ণেন্দুভূষণ লিখেছেন—"ব্রহ্মচারীবাবার অনুপম পত্রগুচ্ছের মধ্যেই তাঁহার দিব্যজীবনের বাণীকমল সহস্রদলে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে,—যাহার ত্রিদিব সৌরভ সত্য-সন্ধিৎসু মুমুক্ষু

জনগণকে বিমুগ্ধ ও আনন্দ-বিহ্বল করিবে,"--ইহার সত্যতা পাঠক-মাত্রেই উপলব্ধি করবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা শ্রীভারতব্রহ্মচারীর সিদ্ধি, সত্যোপলব্ধি, তাঁর প্রত্যক্ষানুভূতি, তাঁর ১৮ দিন হত্যা দিয়ে আদেশ লাভ করা এবং সর্বোপরি তাঁর ইষ্টাবির্ভাবের অপরোক্ষ দর্শনকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি ও সমর্থন দান করেছেন লিখিত পত্রের দ্বারা।

ব্রহ্মচারীবাবা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে "শ্রীভগবানের আদালতে উকিল লাগে না, পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না"। এ কথাও তাঁর সংস্কারমুক্ত সিদ্ধিপ্রাপ্ত মনের উদাত্ত সোচ্চার এবং বলিষ্ঠ ঘোষণা। তিনি 'সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্,'--'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' তিনি 'দিবীব চক্ষুরাততম্'--এই সব কথা আমরা পড়া পাখীর বুলির মত গ্রন্থ থেকে আবৃত্তি কবি মাত্র,--ইহাদের মূল সত্যের, মূল মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয় সিদ্ধ পুরুষদের আত্মোপলব্ধিমূলক বাণীর দ্বারা এবং বাক্-কায়মনে তপস্যার দ্বারা।

তিনি কয়েকটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে বিভিন্ন বিগ্রহমূর্তি স্থাপন করেন এবং শ্রীভগবান ও শ্রীভগবতী মহামায়ার প্রতিমা বা প্রতীক-রূপ অর্চাবতার পূজায় সৌলভ্য ও সৌকর্য সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ প্রদান করেন। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ দর্শনই তাঁর সাধনার মূলসূত্র।

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ
যোঽসৌ সাঽহং অহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥

'শিবশক্তি' 'রাধাকৃষ্ণ' 'সীতারামের' অভিন্নতা তাঁর উপাসনায় স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বীকৃত বিষয়।

যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি, দুগ্ধ ও তার ধবলতা, তুষার ও তার শীতলতা, তেমনি শক্তি ও শক্তিমান—অবিভাজ্য, অপৃথক কারণ তাদের সম্পর্ক এক যুক্ত এক=দুই নয়, এক গুণিত এক= এক। কাজেই এতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-রূপ অদ্বৈততত্ত্বের কোন

হানি হয় না, রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগে (গীতা নবম অধ্যায়) প্রত্যক্ষাকামং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ভক্ত-সাধক বহু বিচিত্ররূপে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন 'একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।' (গীতা ৯।১৫)

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্
তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃণাং
যদুত্তম শ্লোক যশোঽনুগীয়তে ॥

তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে গেছেন তাঁর নাম—এবং নাম, নামী এবং বিগ্রহ তিন স্বরূপতঃ একই। ইষ্টের এই ধ্যানমূর্তি, সাধকের হৃৎপুণ্ডরীকে দহরাকাশে বিধৃত মূর্তি তা' কোন কালাপাহাড় ভাঙ্তে পারে না। তাঁর উপাসনায় শ্রীরামকৃষ্ণের মত বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা এসে মিলিত হয়েছে,—যত মত, তত পথ এই সত্য তাঁরও স্বকীয় সাধনায় প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন সমস্ত নদী তাদের আপন আপন সত্তা এবং স্বত্ববত্তা সমুদ্রে বিসর্জন করে তেমনি সেই পরম তত্ব সকল সাধকেরই একমাত্র গম্যস্থান,—

"নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"।

তিনি পদব্রজে ভারতবর্ষের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বহু তীর্থে পর্যটন করেন এবং তাঁর বাণী ও উপদেশাবলী প্রচার করেন।

তিনি যুগপৎ ধর্মবীর এবং কর্মবীর ছিলেন,—'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দন্তি সাধবঃ' তিনি নিষ্কাম কর্মযোগী হয়ে কর্মের পুষ্পে ভক্তির চন্দনে দেশ-মাতৃকার তথা জগজ্জননী মহামায়ার পূজা করে গেছেন।

তিনি নিজের মুক্তি অর্জন করেই ক্ষান্ত বা নিবৃত্ত হন নি—'কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্' এই ছিল তাঁর উদার-হৃদয়ের করুণ-কোমল মানবদরদী চিত্তের সর্বতোভদ্র কল্যাণ-কামনা।

তিনি আকাশবর্ণা দ্বিভুজা সিংহবাহিনী ভারত-মাতার মৃণ্ময়মূর্তি নির্মাণ করাইয়া আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে জন পঁচিশেক কিশোর-বয়স্ক বালক নিয়ে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান, ক্রীশ্চান প্রভৃতিকে জাতিবর্ণনির্বিশেষে এক পরিবারভুক্ত ভারতজননীর সন্তান মনে করিতেন। তিনি বয়ন-বিদ্যালয়, বেদ-বিদ্যালয় প্রভৃতিও স্থাপন করেন, ১৯২১ সালে তিনি ভারত-সমাজ গঠন করেন। ১৯২৪ এর অক্টোবরে তিনি চিত্রধাম আশ্রমে শারদীয়া পূজায় দশভুজা দুর্গামূর্তি এবং লক্ষ্মীপূজার দিনে মহালক্ষ্মী ও কৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বছরের শেষভাগে নেত্রকোণায় জেলা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি তাঁর শিষ্য কুমুদানন্দকে দিয়ে 'সত্যযুগাঙ্কুর' এবং যোগানন্দকে দিয়ে 'কংগ্রেস ও পল্লীসংস্কারে আমাদের কথা' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়ে বিতরণ করেন।

১৯২৬ (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)-এ তিনি ভারত-সমাজ সমিতিকে মাতৃভাণ্ডার পরিচালনার ভার দেন, এবং নিজে তার উপদেষ্টা থেকে অজপানন্দের সম্পাদনায় 'সোনার ভারত' পত্রিকা প্রকাশ করান। ঐ বৎসর ১৪ই সেপ্টেম্বর রাধাষ্টমীর দিন ব্রহ্মচারীবাবা দেহরক্ষা করেন।

তাঁর কোন কোন শিষ্য তাঁর দেহত্যাগের পর শ্রীঅরবিন্দের পত্রে ব্রহ্মচারীবাবার সাধনা ও সিদ্ধির প্রতি অনুকূল মত প্রকাশের ফলে পণ্ডিচেরী আশ্রমে তাঁর সান্নিধ্যে বাস করেন কিন্তু তাঁর অগণিত ভক্ত এবং শিষ্য সমগ্র দেশে তাঁর তেজঃপুঞ্জমূর্তি ধ্যান করে, তাঁর নির্দিষ্ট সাধন পন্থায় নীরবে অগ্রসর হচ্ছেন।

১২ই শ্রাবণ ১৩৮০ তাঁর শততম জন্ম-বার্ষিকীর শুভারম্ভ হয়েছে। তাঁকে স্মরণ করলে মনে হয় যেন আমাদের আত্মা তাঁর পুণ্যস্মৃতিতে স্নান করে পবিত্রতা লাভ করল। শ্রীচৈতন্যোক্ত পঞ্চ সাধনের প্রথম কথাই সাধুসঙ্গ।

"সাধুসঙ্গ কৃষ্ণকথা ভাগবত নাম
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান

এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প যদি হয়
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।"

তাঁর হৃৎকর্ণ রসায়নী-কথার প্রভাবে এবং প্রেরণায় আমাদে 'শুষ্ক হৃদয়' হয় 'প্রেমে সরসতর,'

'পুণ্য নয়নে' আনে 'পুণ্য প্রভা'।

সূর্যকে 'ধ্বান্তারি' বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি কেবল দিবাভাগে বাইরের অন্ধকার দূর করতে পারেন। কিন্তু সাধুরা কি দিবা কি রাত্রি, সব সময়েই আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করেন,—

"সন্তঃ সূক্তি মরীচ্যোঘৈর্ধ্বান্তং ঘ্নন্তি হি সর্বদা"।

তাই আচার্য শঙ্কর বলেছেন—

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা"।

সাধুসঙ্গলাভ সর্বোত্তম, কিন্তু তার অনুকল্পে সাধুচরিত্রের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারাও আমরা কিয়ৎপরিমাণে সাধুসঙ্গলাভের ফল পেতে পারি।

—০—

মহাত্মা ভারত ব্রহ্মচারীবাবার ব্রহ্মচিন্তা

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

বিভিন্নকালে এই ভারতভূমিতে বহু আপ্তকাম সাধক জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের অধ্যাত্মচেতনার আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে দিক্‌চক্রবাল। হিমগিরির অজানা কন্দরে, দুর্গম অরণ্যে কত অজানা ব্রহ্ম-পথিকের নিস্তরঙ্গ সাধনা চলেছে যুগ-যুগান্তর ধ'রে তার খোঁজ ক'জন জানি! অথবা অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত পল্লীগ্রামে কোন পবিত্র আধারে হয়েছে ঈশ্বরের অকৃপণ কৃপাবর্ষণ। বিদ্যালয়ের ন্যূনতম প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত না হবার আগেই নেমে এসেছে ঐশী করুণাধারা। পরম জ্যোতির্ময়ের জ্যোতিঃকণায় আপ্লুত সাধকের বাহ্য চেতনা মূর্ছিত। তাঁর অন্তরলোকে দিব্য আনন্দের হিল্লোল। পার্থিব জগৎ থেকে বহু দূরে আনন্দময় লোকে যেন তাঁর বিচরণ। কণ্ঠে আবির্ভূতা হন ব্রহ্মের ত্রিধা-বিভক্ত অংশের একটি—মহাসরস্বতী। তিনি বাক্‌দেবী। আদি বাক্ প্রণবের বিচিত্র উল্লাস সাধকের সর্বদেহে। এমনি এক সিদ্ধ মহাত্মা ভারতব্রহ্মচারীবাবা সার্থকনামা তিনি। এই পুণ্যভূমি ভারতে জন্ম নিয়ে তিনি যেমনি উপলব্ধি করেছেন ভারত-আত্মার বাণীকে, তেমনি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধা ভারতজননীর বেদনা অনুভব করেছেন হৃদয় দিয়ে।

আদি মন্ত্র হলো ব্রহ্মগায়ত্রী। 'তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ।' জ্ঞানের উন্মেষকারী যে সবিতৃদেব আমাদের বুদ্ধিকে সৎকর্মানুষ্ঠানে প্রকৃষ্টরূপে নিয়োগ করেন, সেই দ্যোতমান জ্ঞানপ্রেরক সবিতৃদেবের (পরব্রহ্মের) শ্রেষ্ঠ সর্বপাপনাশক জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। ব্রহ্মের অনুচিন্তনে যেন আমাদের চিত্ত নিয়ত নিরত হয়। শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারী গায়ত্রী মন্ত্রের বিশেষ পরিপোষক ছিলেন। এই মন্ত্র মানুষকে দেবত্বের পথে নিয়ে যায়।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য গায়ত্রীমন্ত্রের পঁচিশটি অক্ষরের ব্যাখ্যা অপূর্বভাবে করেছেন। 'কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ ভূতানাঞ্চৈব পঞ্চকম্॥ মনো বুদ্ধিস্তথাত্মা চ অব্যক্তঞ্চ যদুত্তমম্। চতুর্ব্বিংশত্যথৈতানি গায়ত্র্যা অক্ষরাণি তু। প্রণবঃ পুরুষং বিদ্ধি সর্ব্বগং পঞ্চবিংশকম্।'

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি, আত্মা আর অব্যক্ত—এই চব্বিশটি গায়ত্রীব অক্ষর। পরম পুরুষ প্রণব নিয়ে পঁচিশ অক্ষর। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীবাবা বলেছেন, 'ব্রহ্মগায়ত্রী দ্বারা সাধারণভাবে ব্রহ্মকে আত্মা-স্বরূপে বহিঃশক্তির ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইযা দিতে হয়।···সাবিত্রী-গায়ত্রীকেও ব্রহ্ম-গায়ত্রী বলে। ওঁ পরমাত্মায়ৈ বিদ্মহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম পরমাত্মা বলিয়া জানি, 'পরতত্ত্বায়ৈ ধীমহি' অর্থাৎ পরতত্ত্ব বলিয়া ধ্যান করি এবং 'তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মভাব আমাতে প্রেরণ কর বা দাও।

শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীবাবা বলেন, মন থেকে অহংতত্ত্ব পর্যন্ত জীবের বদ্ধাবস্থা। একে বলে সূক্ষ্মদেহ এবং এই পর্যন্ত যার গতি তাকেই বলে বদ্ধ-জীব। সাধনের সময় যঁারা এর অতীত হয়েছেন তাঁদের বলা হয় মুক্ত জীব। আত্মজ্ঞান না হলে মুক্ত জীব হওয়া যায় না। তা হলে প্রশ্ন উঠবে আত্মজ্ঞান কি ? জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদরূপ সন্দেহ নিবৃত্তিই হলো ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। ব্রহ্মচারীবাবা বলেন, ব্রহ্মচৈতন্যই ঘটস্থ অবস্থায় পরমাত্মা। এই পরমাত্মার আত্মস্বরূপ ভুলে দেহাত্মবোধ হলেই তাকে বলে জীবাত্মা।

শাস্ত্রে আছে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে নাভিমূলে আছেন স্বয়ম্ভু লিঙ্গ এবং হৃদয়ে দ্বাদশদল পদ্মে রয়েছেন বাণলিঙ্গ শিব। বাণলিঙ্গ শিবের মাথায় স্ফটিকের মত স্বচ্ছ মণি থাকে। স্বচ্ছ মণির গূঢ়ার্থ হলো ত্রিগুণময়ী মায়া। এই স্বচ্ছমণির মধ্যে এক অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ প্রদীপশিখার মত জীবাত্মা আবদ্ধ রয়েছেন।—'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষোন্তরাত্মা সদা হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।' প্রদীপশিখার মত হৃদয়ে জীবাত্মাকে স্মরণ করতে হবে।

'প্রদীপ কলিকাকারং হৃদি জীবং সদা স্মরেৎ।
হংসঃ ইতি প্রাণমন্ত্রস্তু জীবঃ জপতি সর্ব্বদা ॥'

এই জীবাত্মা সর্বদা 'হংসঃ' মন্ত্র জপ করছেন। হং=লয় বা শিব এবং সঃ=মায়া শক্তি। অর্থাৎ জীবাত্মা সর্বদাই পরমাত্মাতে বিলীন হতে সচেষ্টিত কিন্তু মায়া শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তিনি বাধা প্রাপ্ত হচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা 'সোঽহং' জপ করছেন কিন্তু এই শব্দ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্য দিয়ে বিপরীতক্রমে 'হংসঃ' শব্দে রূপান্তরিত হচ্ছে। 'সোঽহং' শব্দে আমিই সেই পরমাত্মস্বরূপ জীবাত্মা। স এবং হ এই দুটি বর্ণ মুছে দিলে অবশিষ্ট থাকে ওঁকার। বলা বাহুল্য এটি সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতীক চিহ্ন। এই জপ হলো 'অজপা গায়ত্রী'।

শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীবাবা বলেছেন 'এই আত্মশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে চতুর্দলে থাকিয়া "হংসঃ" জপ করিতেছেন, ইহাকেই অজপা গায়ত্রী বলে। শ্বাস নির্গম কালে 'হং'-কার, আর প্রবেশকালে 'সঃ'-কার জপ হইতেছে। হং-কার পুরুষ, সঃ-কার প্রকৃতি। এই পুরুষ-প্রকৃতির অনন্ত নাম। উপাসক-ভেদে কেহ রাধাকৃষ্ণ, কেহ বা শিবশক্তি বলিয়া থাকেন। শ্বাসপ্রবেশে দেহ জীবিত বা শক্তিসম্পন্ন হয়, তাই 'সঃ'-কার শক্তিরূপিণী। শ্বাসনির্গমে, পুনঃ প্রবেশ না করলে, দেহ নির্গুণ ও মৃত। পুরুষ নির্গুণ বলিয়া 'হং'-কার পুরুষ।'

শাস্ত্রে আছে 'হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥'

(স্বরোদয়শাস্ত্র, ১১।৭)

তা হলে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মচারীরাবার বক্তব্যটি শাস্ত্র-প্রবচনের সঙ্গে কিভাবে সমতা রক্ষা ক'রে চলেছে।

ব্রহ্মচারীবাবা 'অজপা'র একটি অপূর্ব সংজ্ঞা দিয়েছেন অতি সহজ ভাষায়—'যাহা তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত জপ হইতেছে তাহাকেই অজপা বলে।' ব্রহ্মই লীলার ছলে স্পন্দিত হয়ে বায়ু আকার ধারণ

ক'রে জলবিম্বসম এই প্রাণবায়ুরূপে ঘটস্থ হন। আগমন ও নির্গমনের সময় 'হং', 'সঃ' এই দুটি বীজ উচ্চারণ করছেন। অহং ভাব দূর হলে অর্থাৎ অহং তত্ত্ব অতিক্রম করে যেতে পারলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায়। অন্তরে ও বাইরে ঈশ্বরের অনুভূতি দিব্যভাবে প্রকটিত হয়। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সব কিছুতেই চৈতন্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়; যেমনটি দেখেছিলেন শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীবাবা। বিদ্যালয়ের শিক্ষাও তাঁর ছিল না অথচ তাঁর পত্রাবলী পাঠ করলে আশ্চর্য হতে হয় কি গভীর তাঁর তত্ত্বজ্ঞান। ঈশ্বরের কৃপা অত্যন্ত সুপ্রকট না হলে এ জাতীয় পরাজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

ব্রহ্মের সংজ্ঞা দেওয়া সুকঠিন। উপমার সাহায্যে ব্রহ্মচারীবাবা বলেছেন, 'যেমন জলবিম্ব হইলেও সাগরে রাশি রাশি জল থাকে, এই অনন্ত জীব হইলেও এই 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং' ফুরায় না বা তাহার শক্তি অনন্তই থাকেন। ইহাকেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে।' তিনি বলতেন, জগৎ ব্রহ্মের বিকার নয়, বিকাশ অর্থাৎ লীলা। স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিপরীত হলেই তাকে বিকার বলে। জগৎ শব্দে গতিশীল, সৃষ্টিলয়াদি ক্রিয়াশীল বা অবস্থান্তর দেখা যায় বলে জগৎ, এ হলো ব্রহ্মের স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতির প্রকাশ। ব্রহ্ম বা আত্মার নির্লিপ্ততার জন্যে তার ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই। সঙ্কল্প-বিকল্প নেই।

ব্রহ্মচারীবাবার উপরোক্ত বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য। পঞ্চদশীকার বলেছেন, 'তিনি সৃষ্টির পূর্বেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনই আছেন। তবে শ্রুতিতে এ কথাও আছে 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।' তিনি ঈক্ষণ করলেন যে তিনি বহু হবেন। 'কাম সঙ্কল্প ঈক্ষণম্—ব্রহ্মের এই বাসনা সঞ্জাত হলে তিনি প্রকট চৈতন্য হলেন এবং সেই বাসনা মূলাতীতা মূলা প্রকৃতি হলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মেরও ঈক্ষণ আছে। শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী বলেছেন—

'সাবির্ভবতি তস্যা হি সাংবৎসর ইতীক্ষণম্।
যতো দ্বৈতমহোরাত্রং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ পুনঃ।' (জপসূত্রম্, ১ম খণ্ড)

যাদি কলনবৃত্তি 'আমি সংবৎসর হইব' এইভাবে ঈক্ষণ করেন। 'বৎসর' এবং 'সংবৎসর' এই দুটি শব্দকে যেন গুলিয়ে না ফেলি। সৃষ্টিসূক্তে য 'সংবসর' শব্দটি আছে তা হলো কলনবৃত্তির একটি রূপ।

জ্ঞানযোগের লক্ষ্য হলো ব্রহ্ম। সত্তা, চৈতন্য, আনন্দ আর শক্তি এগুলি হলো ব্রহ্মের লক্ষণ। এগুলি হলো চিদ্‌বৃত্তি বা বোধরূপ। ব্রহ্মকে জানতে হবে অর্থাৎ আত্মচেতনাকে শান্ত, প্রদীপ্ত এবং বিস্ফারিত করা চাই। তা না করতে পারলে আনন্দকে নিষ্কলুষ আর শক্তিকে নিরঙ্কুশ রাখা যাবে না। ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্যকে বলা যেতে পারে পুরুষ আর আনন্দ ও শক্তিকে বলতে পারা যায় তাঁর আত্মপ্রকৃতি।

ব্রহ্ম হলেন 'অবাঙ্‌মানসগোচরঃ'। তাই ব্রহ্মকে পেতে হলে মনকে নিরুদ্ধ করতে হবে। মন যদি না থাকে তাহলে জগৎও থাকবে না। জ্ঞানযোগীর কাছে জগৎ মুছে যাবে না, কর্মের অস্তিত্ব থাকবে না। এমন কি সাংসারিক কর্তব্য বা দেবার্চন শেষ পর্যন্ত সব কর্মই ছাড়তে হবে। ভারতব্রহ্মচারী অদ্বৈতবাদের কথা বললেও দ্বৈতবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। শ্রীমৎ অনির্বাণজী বলেন, 'অবিমিশ্র জ্ঞানযোগের যাঁরা সাধক, তাঁরা ভক্তি এবং কর্মের সাধনাকে এড়িয়ে চলেন।...জ্ঞান-বাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা অথবা গৌণ করে দেখা।' শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীজী উভয়ের সমন্বয় সাধন করেছেন। ব্রহ্মবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীকেও সমভাবে মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ব্রহ্মের সগুণভাবই প্রকৃতি (ত্রিগুণাময়ী পবাপ্রকৃতি)' প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহংতত্ত্বের প্রকাশ। সুতরাং সাধক অহংতত্ত্বে থাকিয়া বুদ্ধিতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। পরাপ্রকৃতি বা ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি ত আরও দূরের কথা। আবার বিচার দ্বারা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়, তারপর আর বিচার চলে না, তখন প্রকৃতির হাতে আত্মসমর্পণ ব্যতীত সাধকের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।"

জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদরূপ সন্দেহ নিবৃত্তিই হলো আত্মজ্ঞান বা

ব্রহ্মজ্ঞান। জীবের এই অনুভূতি নেই। তত্ত্বজ্ঞের কাছে উপদে গ্রহণ করে মায়িক জীব ধ্যানসহযোগে তা উপলব্ধি করবেন। নিজে ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলে ভ্রম করছে মানুষ। যদি বলা যায় জীব ব্রহ্মে অংশ তা হলেও জীবের 'আমি' অভিমান তাকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক ক রাখছে। এই প্রভেদবোধ জীবের, ব্রহ্মের নয়। ধ্যান প্রগাঢ় হ জ্যোতিরাবেশের সান্দ্রতা নিয়ে আসবে সাযুজ্যের পর উপলব্ধি। তখ জ্ঞানী অনুভব করবেন 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম। নিত্য জাগ্রত উপলব্ধিই আমাদের পরম পুরুষার্থ। একেই বলে ব্রাহ্মী স্থিতি।

'ব্রহ্মাস্মি'—এই বোধ যখন হয়, তখন সেই বোধ শোকাদি বিভ্রম-সমূহকে একান্তভাবে রোধ করে থাকে; আবার যেহেতু এই বোধটি চরম বৃত্তি, তাই সেটি উৎপন্ন হয়েও নিজেকে রোধ করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি ব্রহ্মই' এই বৃত্তি রয়েছে বা এ জাতীয় অন্য কোন বৃত্তি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ব্রহ্মস্বরূপত্য হয় নি। একান্তভাবে সব বৃত্তির নিরোধ বা শূন্যত্য না হলে 'ব্রহ্মৈব ভবতি' এই পরমপ্রাপ্তি ঘটে না। সাধকপ্রবর স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী বলেন 'আমি ব্রহ্ম' এইটিকে ব্রহ্মাকারা চরমবৃত্তি বলা হয়, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এটি নয়।'

অগ্নি যেমন ইন্ধনকে নিঃশেষে দগ্ধ করার পর নিজেও নির্বাপিত হয়, তেমনি এই ব্রহ্মাকারা চরমবৃত্তিটি নিঃশেষে ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় এই চারটি ভব ইন্ধন নিঃশেষে দগ্ধ ক'রে নিজেই অস্তমিত হয়। শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারী তাই বলেছেন, আমি সেই, আমি তাঁর এই দুটি ভাবনাই আমি (জীব) সেই তিনি (ব্রহ্ম) থেকে দৃষ্টতঃ ভিন্ন অনুভূত হয়। 'যতক্ষণ অহং বোধ থাকে ততক্ষণ ত্বং বোধও আছে; যখন অহং বোধ লোপ পায় তখন ত্বং বোধও থাকে না। সেই ভাবই অদ্বৈতভাব বা সোহহংভাব। এই অবস্থায় না পৌঁছিলে তাহা বুঝা যায় না, অন্যকে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না—এই অবস্থা ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া ইহা চিন্তা ও মনন করাও যায় না।'

ব্রহ্মচারী মহারাজ ব্রহ্মচর্যব্রতের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা সকলেই ব্রহ্মচর্যের উপর জোর দিয়ে থাকেন। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বীর্যলাভ হয়। তাতে মন স্থির হয়। ব্রহ্মচারীজী বলেন, ব্রহ্মচর্য ব্রত হলো ব্রহ্মে বিচরণ করবার উপায় অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়া, তদ্গত হওয়া। ধ্যান, ধারণা, সমাধি, মন স্থির করবার পন্থা।

যোগীশ্বব যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলেছিলেন,—

'যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে ॥' (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের এই আট অঙ্গ। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন না করলে এর কোনটিই সম্ভব নয়। অথবা বলা যেতে পারে যম, নিয়ম এগুলিই হলো ব্রহ্মচর্যব্রতের সোপান। আবার 'দেবীভাগবতে' আছে—

'ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে।
ঐক্যং জীবাত্মনো রাহুর্যোগং যোগবিশারদা ॥'

স্বর্গ, মর্ত্য, বা পাতালে কোন স্থানেই যোগ বলে কোন পদার্থ নেই। যোগ বিশারদ যোগীগণের জীবনীশক্তি সহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধনাই যোগ।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য চিত্তের বিক্ষেপে শক্তি ছড়িয়ে পড়ে, সমত্বে সংহত হয়। শক্তি সংহত হলে আধারে বীর্যের আবির্ভাব হয়। বীর্যের সাধনা হলো পূর্ণযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ। 'তার লক্ষ্য, অপরা-প্রকৃতির বাধা সঙ্কোচ ও পঙ্গুতা দূর ক'রে চেতনাকে বৃহৎ উর্ধ্বায়িত এবং সমর্থ করা, তার রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে দিব্যকর্মের সাধন করে তোলা।'

একারণে শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীবাবা প্রায়ই বলতেন, সংযম অভ্যাস না করলে মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। সংযমী

মানুষের ভিতর দিয়েই মা অর্থাৎ পরমাপ্রকৃতি বা ব্রহ্মশক্তি বড় কাজ করে থাকেন। বুদ্ধিতে যখন বীর্যাধান হয় তখন তার ফল হ'লো বিশুদ্ধি প্রকাশ বিচিত্রবোধ এবং সর্বজ্ঞানসামর্থ্য।

ব্রহ্মচারীবাবা বলেছেন, 'ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বনে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া, আত্মাতেই স্থিতি লাভ করিতে পারিলে একাত্ম-জ্ঞানে অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহংকারাদির কিছুই আমি নহি ; আমি—সত্য নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, নির্গুণ, নিরাকার, নিরহঙ্কার সুতরাং কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি গুণ না থাকা হেতু আমি অকর্তা, দ্রষ্টা স্বরূপ থাকায় দেহাদি ক্ষণিক জড় পদার্থের সংযোগ-বিয়োগরূপ গড়া ভাঙ্গা খেলা জানিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়া জগতে বিচরণ কর। ইহাকেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলে।'

চাই বুদ্ধির স্বচ্ছতা। শ্রদ্ধার বীর্যের সংগে যুক্ত হওয়া চাই প্রেম। প্রেম চৈত্যসত্ত্বের স্বরূপশক্তি, হৃদয়ের স্বভাবধর্ম। তার উৎস হলো ব্রহ্মের আনন্দে। আমাদের প্রাণবাসনা তার স্বীয় স্বার্থে বুদ্ধিকে নিয়োজিত ক'রে তাকে আবিল করে। তাই বাঁচার পথ হচ্ছে বুদ্ধির স্বচ্ছতা। সত্যকে যেন আমরা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করি। স্বচ্ছ বুদ্ধি হল নির্মল অন্তর্দর্শী দর্পণের মতো। এক বিজ্ঞানের মধ্যেই সর্ববিজ্ঞান জানা হলো সিদ্ধি। সিদ্ধ পুরুষ ভারতব্রহ্মচারী সেই পরম সাধনায় স্থিতিলাভ করেছিলেন। এই মহাত্মার জন্মশতবার্ষিকীর শুভলগ্নে তাঁর উদ্দেশ্যে জানাই আমার সশ্রদ্ধ ও বিনম্র প্রণতি।

—০—

ভারত কথা

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

জগৎ কি ?—প্রশ্নটা কঠিন।

একটি সুন্দর ভাষ্যে তা পরিষ্কার করে দিলেন ভারতব্রহ্মচারী। বললেন : 'এ জগৎ মায়ের প্রতিমা।'

এর চাইতে সুন্দর মানে বোধ করি কেউ কোথাও খুঁজে পায় নি। মা বলতে কাকে বুঝি ? বুঝি এই জগৎ-সৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মময়ী মহামায়াকে। তিনি আমার এই প্রাণের মধ্যে নিত্য প্রাণ হয়ে জেগে আছেন। এ বিশ্ব তাঁরই প্রাণের লীলা। জগতের আনন্দযজ্ঞে তিনি চির আনন্দময়ী। প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য ওঠে, আকাশে জাগে আলোর সঙ্গীত ; বনে-বনান্তে, নদীতে সমুদ্রে, পাহাড়ে-পর্বতে, বিটপীর শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় পাখীদের কল-কাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে সেই সঙ্গীত। এ তো প্রাণেরই খেলা! অনন্ত প্রাণ যে এই বিশ্ব-প্রাণেই প্রতি মুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠছে! সামগ্রিক এই প্রাণ-চিত্রকে প্রতিমা ভিন্ন আর কি ভাবা যায় ? যায় না। এই জগৎকে তাই মায়ের প্রতিমা বলেছেন ভারত ব্রহ্মচারী।

যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা যে এই ভারতভূমিতেই!

ভারত এলেন যেন এই ভূমিরই প্রতীক হয়ে! প্রাণবায়ুতে যাঁর ব্রহ্মভাবনা, ব্রহ্মই যাঁর প্রাণায়াম আর উপাসনা, তিনিই তো যোগী। কিসের যোগে যোগী ? যোগ ব্রহ্মের সাথে আর ব্রহ্মসৃষ্ট এই জগতের সাথে। এমন যোগীপুরুষ মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে মানবকল্যাণের মন্ত্র রেখে যান সকলের অন্তরে। এমনি এক যোগী ভারত ব্রহ্মচারী।

আমরা মধ্যযুগীয় যে সব সাধক সম্প্রদায়ের ইতিহাসের সাথে

পরিচিত, তিনি সেই সম্প্রদায়েরই এক সার্থক উত্তরসূরী। তাঁর কাছে কোনো বর্ণাশ্রমিক সংখ্যাতত্ত্বের মূল্য ছিল না। তিনি ছিলেন সকল বর্ণ মিলে এক অখণ্ড চিত্রকল্প পুরুষ। সকল সম্প্রদায়ের মানুষকেই তিনি প্রেমের সঙ্গে আলিঙ্গন করতেন। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমন্বয়ে সমগ্র মানুষের পরিচয়। তিনি বললেনঃ 'সত্ব গুণাধিক ব্যক্তি ব্রাহ্মণবর্ণ, সত্ব ও রজোমিশ্র গুণাধিক ব্যক্তি ক্ষত্রিয়বর্ণ, রজঃ ও তমোমিশ্র গুণাধিক ব্যক্তি বৈশ্যবর্ণ এবং তমোগুণাধিক ব্যক্তি শূদ্রবর্ণ। যে বর্ণে যে পরিমাণে জ্ঞানের বিকাশ হওয়া স্বাভাবিক, সেই বর্ণে তদনুযায়ী সদসৎ ভাব বিকাশক কর্ম সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে থাকে।'

তা হিন্দুর ক্ষেত্রেও যা, মুসলমানের ক্ষেত্রেও তা, আবার বৌদ্ধের ক্ষেত্রেও যা, খৃষ্টানের ক্ষেত্রেও তা। তিনি তাই সমাজের নীচু স্তরের মানুষকেও দীক্ষা দান করে ব্রাহ্মণের পর্যায়ে তুলেছেন। এই সমতাবোধ নিয়েই তিনি ভারতবোধের মন্ত্র গেঁথেছেন। বলেছেনঃ 'যার সংস্পর্শে নিজেকে উন্নত, কর্মঠ, শক্তিমান, স্থৈর্য ধৈর্যশালী ও আত্মনির্ভরশীল করে সদ্‌ভাবাপন্ন করে, তাহাই স্পৃশ্য বা গ্রহণীয়। আর যার সংস্পর্শে কলুষিত, অলস, দুর্বল, চঞ্চল, অশান্ত ও আত্মশক্তিকে আবৃত করে, তাহাই অস্পৃশ্য বা বর্জনীয়। জাতীয় শিক্ষা বা জাতিগঠন সম্বন্ধে অস্পৃশ্যদোষ বিশেষ অন্তরায়, অতএব সর্বতোভাবে অস্পৃশ্যদোষ বর্জন করবে।'—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর জীবনাদর্শের এ যেন আর এক মূর্ত প্রকাশ।

জীবের সেবায় তিনি এলেন জীবজগতে তাদেরই অন্যতম একজন হয়ে। বিচিত্র তাঁর জীবন সাধনা, বিচিত্র তাঁর যোগায়ন। পূর্ববঙ্গের ক্ষুদ্রতম গ্রাম থেকে শুরু করে বৃন্দাবন, যখনই যেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন তিনি, তাঁকে কেন্দ্র করে সেখানেই মানুষের মিছিল গড়ে উঠেছে, তাঁর অমৃতময় বাণী শুনতে সাগ্রহে এগিয়ে এসেছেন ভক্তশ্রেণী। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমের

সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটেছিল অতি সহজেই। তাঁর গ্রাম পরিক্রমার ফলে সেই সেই অঞ্চলের সামাজিক অনাচার প্রভৃতি অবদমিত হয়ে গড়ে উঠেছিল পল্লী-উন্নয়ন, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা ও জাতীয় সংগঠন। এ বড় সহজ কথা নয়। এখানে অন্যান্য বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সন্ন্যাসীদের জীবনে সাধারণতঃ দেখা যায়—আপন আপন আশ্রমে বা আখ্‌ড়ায় জপ-তপ নিয়েই তাঁরা নিমগ্ন থাকেন, সমাজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগ নেই। কিন্তু ভারত ব্রহ্মচারী সে-পথের সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁর কর্ম বরং তথাকথিত ধর্মক্ষেত্রের বাইরে সামাজিক তথা জাগতিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই অধিক নিয়োজিত ছিল।

মানুষ বড় অসহায়, সমাজ বড় অন্ধকারাচ্ছন্ন; তাদের সমুন্নতিসাধনে নিজেকে ব্যয় করা—তার মতো সার্থকতা মানবজীবনে আর কী আছে? ঈশ্বরাদেশই যে তাই। ব্রহ্মময়ী মহামায়া তাঁকে দিয়ে এই কাজ করাতেই ধরাধামে এনেছিলেন। তিনি যোগচিত্তে তাই তাঁর এক ভক্তকে লেখেন—'আমি মায়ের বড় বাৎসল্যের ধন। এই যে শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চক, কেবল আমার জন্য। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিও আমার জন্য, সৃষ্টিলয়াদি ক্রিয়া আমার জন্য। হাসি-কান্নাও আমার জন্য। জন্ম মৃত্যু আমার জন্য। সুখ-দুঃখ আমার জন্য।—শুধু আমার জন্যই নিদ্রারূপে মা, ক্ষুধারূপে মা, তৃষ্ণারূপে মা, ভ্রান্তিরূপে মা, পুষ্টিরূপে মা, দয়ারূপে মা, ক্ষমারূপে মা, আবার আকাশরূপে মা, বাতাসরূপে মা, তেজোরূপে মা, জলরূপে মা। এমন কি কেবল আমার জন্যই মা আমার একেবারে মাটি হয়ে গেছে। এই যে জগৎ, এও আমার জন্য; জগৎটা আমার খেলা।'

এ একেবারে পূর্ণ চৈতন্যব্রহ্মের গভীরতম উপলব্ধি। সব কিছুর সঙ্গে একাত্মতাবোধ এবং নিজেকে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ উপলব্ধি, এ বড় সহজ নয়। সাধক তাঁর তপস্যার কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছালে

এই অনুভূতি আসে, তা তাঁর সমধর্মী সাধক ভিন্ন বলা কঠিন। ভারত ব্রহ্মচারীজীর জীবনালোচনা এবং তাঁর পত্রাবলী ও বাণী থেকে আমরা তাঁর সাধন-জীবনের সেই শীর্ষতা সম্বন্ধে অনেকখানি অবহিত হই।

তিনি মানবদেহ পরিগ্রহ করে যেমন মানবকল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন, তেমনি রাজনীতি নিয়েও গভীরভাবে চিন্তা করে গিয়েছেন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ও জাতীয় কংগ্রেসের নানা ঘটনাকে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ, আবার কখনও বা পরোক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, আবার কখনও বা গৃহী ও সন্ন্যাসীদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে মেনিফেস্টো রচনা করেছেন। তাঁর সন্ন্যাস তাই বাস্তব জগৎ-বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাস ছিল না, ছিল ব্রহ্মলোক ও এই জগতের সেতুবন্ধনের সন্ন্যাস। যে সব শিষ্য একদা তাঁর নিত্যসান্নিধ্য লাভ করে তাঁর অমৃতস্পর্শে ধন্য হয়েছেন এবং গুরুর শততম জন্মোৎসব পালনে উদ্যোগী হ'য়ে বর্তমানে ব্রহ্মচারীবাবাকে একালের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ব্রত নিয়েছেন, তাঁরা ধন্য। তাঁদের পুণ্যব্রতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি সেই ব্রহ্মময়ীর বড় বাৎসল্যের ধন ভারত ব্রহ্মচারীজীর মহিমময় দেবোজ্জ্বল বিভার উদ্দেশ্যে নমস্কার করি। বস্তুলোকের উর্ধ্বে অদৃশ্য দেবলোক থেকে তিনি আমাদের অশীর্বাদ করুন ॥

—•—

ভারত আত্মার বাণী

ডক্টর শ্রীহীবেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ভারত আত্মার অমৃতবাণী যুগে যুগে ধ্বনিত হয়েছে মহাপুরুষের কণ্ঠে। ধ্যানগম্ভীর ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। শোন আত্মার পরিচয়। শোন জীবন মরণের রহস্য, শোন মুক্তির উপায়। উপনিষদের ঋষি জীবন-জিজ্ঞাসার লৌহকপাট খুলে দিয়েছেন মানুষের ত্রিতাপদগ্ধ মনে। সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। মানবমন অরণ্যে অরণ্যে ঘুরেছে শান্তির সন্ধানে। কিন্তু জ্ঞানের পথে মিলেছে কি শান্তির সন্ধান ?·· না। দৃষ্টি ফিরেছে আত্মানুসন্ধানের রহস্যময় পথে। বেড়ে চলেছে জিজ্ঞাসা। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের আবর্তে ঘূর্ণায়মান চিত্ত স্তব্ধ হয়েছে অর্ধপথে। মহর্ষি কপিল আত্মদর্শনেব পন্থা বলে দিলেন। কিন্তু প্রমাণসাপেক্ষ নয় বলে, বললেন ঈশ্বর অসিদ্ধ।

কে দেখাবে পথ! যে পথে এগিয়ে গেলে সব সমস্যার সমাধান হয়।

সম্যক্ দর্শন বা শুদ্ধ জ্ঞান, সম্যক্ প্রত্যয় ও সম্যক্ চারিত্র পারে দুঃখের অবসান ঘটাতে, বললেন মহাবীর। বুদ্ধ বললেন—বাসনা বর্জন কর, হিংসা বর্জন কর। বার বার জন্মগ্রহণ কবে দুঃখের আবর্তে হাবু-ডুবু খেতে হবে না। পথের নির্দেশ মিললো, কিন্তু দুঃখেব অবসান হলো না। এলেন শ্রীকৃষ্ণ। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তি-যোগে রচিত হলো মানুষের জীবনবেদ। বৈবাগ্য সাধনে নয়, জীবন-ধর্ম পালনের 'ভিতর দিয়া মুক্তির পথ প্রদর্শিত হলো। সক্রিয় হলো মানুষ।

এলেন শঙ্কর। বললেন, যা কিছু দুঃখের কারণ এই দৃশ্যমান

জগৎ—সবই মায়া। মিথ্যা এই জগৎ। একমাত্র সত্য ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। এই উপলব্ধি ও সাধনার দ্বারাই হবে দুঃখনিবৃত্তি। হলো কি? এ পথ যে সাধারণ মানুষের নয়। তারা চায় বাঁচতে। সংসারকে অবলম্বন করে, স্নেহমমতা ভালবাসা প্রেম ভক্তি ও নিষ্ঠার পথে পার হতে চায় সংসার সমুদ্র। চায় অনন্ত শান্তি। শান্তিই জীবমাত্রের একমাত্র কাম্য। ক্ষুধার অন্ন, ধনদৌলত ঐশ্বর্য, স্বচ্ছন্দ জীবন, ক্লান্তিতে বিশ্রাম, প্রেম প্রীতি ভালবাসা, সংসার সন্ততি সবই মানুষ চায় শান্তির জন্য। কিন্তু শান্তি মেলে না। লিপ্সা বাড়ে।

এলেন চৈতন্য। মানুষকে শিক্ষা দিলেন প্রেমধর্ম। প্রেমের পথে, অহিংসার পথে শ্রীভগবানের কাছে এগিয়ে যাবার পথসন্ধান পেল সংসার-তাপদগ্ধ, অবহেলিত ও অনাদৃত জনগণ। আশার সঞ্চার হলো মানুষের মনে। প্রেমধর্মে প্লাবিত হলো সারা দেশ।

তারপর আবার এলো নিষ্ক্রিয়তা। আত্মচেতনা ঝিমিয়ে পড়লো। অনাচারের প্লাবন এলো দেশ জুড়ে। আবার এলো দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত।

দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ঈশ্বর সাধনার পথ দেখালেন মহাপুরুষেরা। সিদ্ধির পথ। এলেন তৈলঙ্গস্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ভারত ব্রহ্মচারীবাবা, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ঘটলো। অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন-পথ উদ্ভাসিত হলো দিব্যজ্ঞানের আলোকে। দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ভগবচ্চরণে। মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হলো।

ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত করে বন্ধুবর শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায় দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করলেন। তাঁকে আমার আন্তরিক সাধুবাদ জ্ঞাপন করি। এই সংকলনে যাঁরা তাঁর সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারলাম না।

—০—

শ্রীভারতব্রহ্মচারীবাবা—তাঁহার পত্রাবলী

শ্রীজগন্নাথ ভক্তিভূষণ, সাহিত্যরত্ন

"আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র"—ইহাই ভারতবর্ষ। সে যুগে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি ছিল আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু এদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন একদল ঋষি—যাঁহাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে সামমন্ত্র—আচরণে প্রকাশিত হইয়াছে এক অভিনব জীবন-তন্ত্র। ইহা অনস্বীকার্য। শুধু সেই যুগে নয়—যুগে যুগে, এবং এই যুগেও ভারতের মাটিতে আবির্ভূত হইয়াছেন একদল মহাপুরুষ—রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তের বাহিরে দাঁড়াইয়া যাঁহারা মানুষকে দিয়াছেন চিরনূতন দিক্‌দর্শন। শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবা এমন একজন পুরুষ যাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে পুরাতন ভারতবর্ষের চিরনূতন জীবন-মন্ত্র। তাঁহাব পুণ্য আবির্ভাব শতবার্ষিকী স্মরণে তাঁহার অমরস্মৃতি নন্দিত করি, বন্দিত করি।

শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব শতবর্ষ আগে, ১২৮১ সনের ১২ই শ্রাবণ। তাঁহার প্রকট কাল মাত্র বাহান্ন বছর। এই স্বল্প-পরিসর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার অসামান্য যোগৈশ্বর্য। ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অনতিদূরবর্তী জগদল গ্রাম তাঁহার আবির্ভাব স্থান—পিতা রামরতন দেব, মাতা দীনমণি উভয়ে মিলিয়া ধর্মপ্রাণ দম্পতি।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"সমস্ত মহামানবের চিন্তাধারা এক"—শুধু চিন্তাধারা নয়, মহাপুরুষগণের জীবনধারাও এক। সাধারণতঃ তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন ধর্মপ্রাণ দম্পতির সন্তানরূপে—বাল্যকাল অতিবাহিত করেন একইভাবে, তারপরেই আরম্ভ হয় তাঁহাদের অলোক-সামান্য প্রতিভার বিকাশ। ভারত-ব্রহ্মচারীবাবার জীবনও ইহার ব্যতিক্রম নহে। মহাপুরুষগণের মহান পথেই তাঁহার

ভাগবত জীবন মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রমে সৌরভ বিতরণ করিয়াছিল।

মহামানবগণ শুধু মানব হিসাবেই মহান নহেন, তাঁহারা মহান তাঁহাদের কর্মে ও জীবন-আচরণে। মানব জীবনের যথার্থ মূল্যায়ন তাঁহাদের কর্মের লক্ষ্য, ধর্মের প্রেরণা। মানুষের জীবনের কোন মূল্য আছে কিনা, অথবা থাকিলেও কোন্ ক্ষেত্রে কতটুকু—ইহাই হইতেছে মহাপুরুষগণের জিজ্ঞাসা—আর এই জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধানই তাঁহাদের তপস্যা। যাঁহারা জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করেন, তাঁহারাই তপস্বী। শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারীবাবা এমনি একজন তপস্বী। জীবন ছিল তাঁহার কাছে এক পরীক্ষাক্ষেত্র। এই পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতি অধ্যায়ে তাঁহার আপন মনে জাগিয়াছে নানা প্রশ্ন।

এই প্রশ্নগুলির সমাধান তাঁহার অধ্যাত্মজীবন। এই আত্ম-জিজ্ঞাসার বাহিরেও তাঁহার অগণিত ভক্তের মুখে তিনি শুনিয়াছেন অগণিত প্রশ্ন, শত শত আগ্রহ পূর্ণ জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার পত্রাবলীতে এই প্রশ্নের মীমাংসা দিয়াছেন, ভক্তজনের অনুসন্ধিৎসার উপশম করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী আলোচনা করিব।

বাংলা ১৩২৮ সনের প্রথম হইতে ১৩৩২ সনের প্রায় শেষ পর্যন্ত পাঁচ বছর কাল ব্রহ্মচারীবাবার এই পত্রাবলী লিখিত হইয়াছে বিভিন্ন ভক্তজনের কাছে। এই পত্রগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতগুলি পত্র বহন করিতেছে তাঁহার দেশপ্রীতির নির্লিপ্ত স্বাক্ষর। অবশিষ্ট পত্রগুলির এক অংশে আছে ভক্তগণের ব্যক্তিগত সমস্যা-উদ্ভুত জিজ্ঞাসার উত্তর। অবশিষ্ট পত্রগুলিতে আছে সাধারণ দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধান ও সমাধান। এই তিন শ্রেণীর পত্রে আমরা পাই ব্রহ্মচারীবারার তিনটি বিশেষ হৃদয়বৃত্তির ছবি। প্রথম শ্রেণীর পত্রাবলীতে আমরা ব্রহ্মচারীবাবাকে দেখিতে পাই একজন দেশ-দরদীরূপে। সেটা ইংরেজী ১৯২০।১৯২১ সাল। ভারতের

বুকে তখন অহিংস অসহযোগের দুর্বার প্লাবন—মহাত্মা গান্ধী এই স্রোতধারার ভগীরথ। দিকে দিকে চরকার প্রচলন ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের মহা আয়োজন। সারা ভারত চঞ্চলতায় উদ্বেলিত। শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারী নিজেকে এই আন্দোলনের বাহিরে রাখিতে পারেন নাই। তিনি সন্ন্যাসী। রাজনীতি তাঁহার মত নহে, পথও নহে। মহাত্মাজী চাহিয়াছিলেন ইংরেজের হাত হইতে জাতির পরাধীনতার মুক্তি। ইহা রাজনৈতিক। ব্রহ্মচারীজীর প্রার্থিত মুক্তি ছিল আধ্যাত্মিক। তবুও তিনি এই রাজনৈতিক মুক্তি-যুদ্ধের শুধু সাফল্য কামনা করেন নাই, ইহাতে সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ইহা সত্যই অভিনব। একজন সর্বত্যাগী ভারতীয় তপস্বীর এই রাজনৈতিক দেশ-প্রেম শুধু অপূর্ব নহে, অভূতপূর্ব।

শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারী ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁহার সাধনক্ষেত্র ছিল রাজনীতির বাহিরে। ময়মনসিংহের স্বনামধন্য আইন ব্যবসায়ী মহিমচন্দ্র রায় মহাশয়কে লিখিত পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"এসব আমার কাজ নয়। আমি সন্ন্যাসী, ছোট হইতেই এসব সাংসারিক বা রাজনৈতিক কোন কাজই করি নাই—।" তবুও তিনি রাজনৈতিক কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছিলেন—জনগণকে দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি রাজনীতির অংশ কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই প্রশ্নের উত্তরও ঐ পত্রেই আছে। ব্রহ্মচারীবাবা ঐ পত্রে লিখিয়াছেন—"মা আমাকে কৃপা করিয়াছেন পরই বলিয়াছেন—আমি ইউরোপের শক্তি হ্রাস করিবার জন্য মহাসমরের সংগঠন করিব, পরে ভারত স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে সত্যধর্ম স্থাপন করিয়া ভারতে দেবতা মানবে অপূর্ব লীলা করিব।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মচারীবাবা শুধু আধ্যাত্মিক সাধনাই করেন নাই, পরাধীনতা পীড়িত জাতির রাজনৈতিক মুক্তির চিন্তাও করিয়াছেন। তিনি হয়তো বুঝিয়া থাকিবেন রাজনৈতিক পরাধীন-জাতির মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক মুক্তি সুকঠিন। কেননা দেশের

রাজ-শক্তি আধ্যাত্মিক সাধনার সহযোগী না হইলে মানুষের অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ হইবে না। অতএব আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রাথমিব পর্যায় হইতেছে জাতির রাজনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তি। তাঁ মহিমবাবুকে লিখিত ঐ পত্রের উপসংহারে ব্রহ্মচারীজী লিখিতেছেন—। "আমি জানি বর্তমানে মা সমুদয় দেব-দেবী সমভিব্যাহারে বিষ্ণুশক্তি সহায় করিয়া ভারত উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি করিতেছেন ও করিবেন। মহাত্মা গান্ধীই বিষ্ণুস্বরূপ—তাঁহাতেই বিষ্ণুর আবির্ভাব। তাই লিখি আর সময় নাই। তাড়াতাড়ি কাজে হাত দেন দেহে মনে প্রাণে। আমার এই মনের কথা," অতএব দেখা যাইতেছে তপস্বী ব্রহ্মচারীবাবার মনেও ছিল দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের দুর্বার বাসনা। এই বাসনাদীপ্ত মনেই তিনি বুঝিয়াছিলেন মহাত্মা-গান্ধী বিষ্ণুস্বরূপ।

দেশের মুক্তি কামনায় ব্রহ্মচারীবাবার মনের এইরূপ আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে ভক্তগণের উদ্দেশে লিখিত তাঁহার বিভিন্ন পত্রে। নেত্রকোণার উকিল নগেন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে লিখিত পত্রেও অনুরূপ বাসনা ব্যক্ত হইয়াছে। শুধু মানসিক আকাঙ্ক্ষাই নয়—তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার কৌশল তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মাজী প্রদর্শিত চরকা-তাঁতের কুটীরশিল্প—ভারতের অর্থ নৈতিক মুক্তির সহায়ক মনে করিয়া ব্রহ্মচারীজী এই ব্যবস্থার সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং হাতে কলমে তাহা করিতে বাস্তব সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি নগেন্দ্রবাবুকে লিখিতেছেন—"বর্তমান সময়ে আমার মনে হয় আপনাদের নেত্রকোণায় আরও কয়েকটি তাঁত বসাইয়া কাপড় বয়ন শিক্ষা দিবার জন্য আর অন্ততঃ ৮।১০টি ছাত্রের খোরাক যোগাইবার জন্য চেষ্টা করা খুব উচিত। ইহাতে তাড়াতাড়ি কাজ হইবে—।" এই সময় মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ব্রহ্মচারীজী এই সংবাদে উদ্বিগ্ন মনে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—"এই টাউনের মধ্যে এমন কি কেউ নাই যে হাজার

দু'হাজার চরকা বিতরণ ও তাঁত প্রচলনের জন্য নিজেদের জমাজমি ঘর দরজা বিক্রয় বা রেহেন বন্ধক দিয়া পথের ভিখারী সাজিয়া বা বৃক্ষতলবাসী হইয়া হইলেও এমন সময় কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া এমন একটা কাজ উদ্ধার করিতে ব্রতী হন? আর কি এইভাবে থাকিবার সময়?" গান্ধিজীর গ্রেপ্তার সংবাদে তিনি এত বিচলিত হইয়াছিলেন বলিয়াই নগেন্দ্রবাবুকে লিখিত পত্রে বলিতেছেন—"তিনি যদি না ধরা দিতেন তবে কাহার সাধ্য তাঁহাকে ধরে? ইহা দ্বারা তিনি কেবল জগৎকে জানাইলেন যে এইরূপ ত্যাগ স্বীকার না করিলে চলিবে না। আপনারা দুই ভাই নিজেকে ভুলিয়া—বিষয় সম্পত্তি ভুলিয়া মহাত্মার কাজ উদ্ধার করুন"—ব্রহ্মচারীবাবার এই উক্তি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহার দেশপ্রেম ছিল কত গভীর—মহাত্মাজীর প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল কত প্রগাঢ়। দেশ-সেবার পটভূমিকায় ভগবৎ সেবার ছবি আঁকিয়াছিলেন ব্রহ্মচারীবাবা। দেশোদ্ধাব সাধনা ও আধ্যাত্মিক উপাসনা তাঁহার চিন্তায় পাশাপাশি স্থান পাইয়াছিল। হাসানপুর হইতে গৌরী-আশ্রমের সাধকগণের নিকট ১৩২৮ সনের ৬ই চৈত্র তারিখে লিখিত পত্রে তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—"আজকাল দেশের কাজ করিতে হইলে কঠোর সংযমী হইতে হইবে, আবার সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে, বলবীর্যশালী হইতে হইবে, মনের একাগ্রতা জন্মাইতে হইবে। তাই লিখি, বাহিরের সংযমের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উপাসনা দ্বারা অতি সত্বর কর্মোপযোগী হও।" ব্রহ্মচারীবাবার এই উপদেশ বাস্তব জীবনের কর্ম ও অধ্যাত্মজীবনের সাধনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। কর্ম ও পরাজ্ঞান এখানে একাকার। ব্রহ্মচারীবাবার মনে তখন বুঝি অনুরণিত হইতেছিল বেদান্তের সত্য—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" দেশের প্রতি এইরূপ অনাবিল প্রেম, দেশের মুক্তির জন্য এইরূপ অদম্য আগ্রহ ব্রহ্মচারীবাবার লিখিত অনেকগুলি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছিল তাঁহার কাছে ধর্ম। তাই

নেত্রকোণার সত্যেন্দ্র রায় মহাশয়কে তিনি লিখিতেছেন—"এই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এবার দেশের লোককে কত কামান গোলাও সহ্য করিতে হইবে। তোমরা কোমর শক্ত করিয়া বাঁধ এবং দেশের কাজে লাগিয়া যাও।" আশ্চর্য! সদা অধ্যাত্মচিন্তায় সঞ্চরণশীল সন্ন্যাসীর মনে এইরূপ দেশের চিন্তা কোথা হইতে আসিল? ভগবত চিন্তার পাশে দেশের পরাধীনতার চিন্তা স্থান পাইল কেমন করিয়া? উকিল নগেন্দ্রচন্দ্র দে মহাশয়কে লিখিত পত্রে তিনি নিজেই বলিতেছেন—"এই স্বরাজের জন্য বা স্বাধীনতার জন্য আমার কোন ঠেকা নাই। কারণ আমি সর্বদাই স্বাধীন—আমি কাহারও অধিকারে থাকি না—তবে যে এমন ভাবে চলিতেছি ইহার কারণ পল্লীগ্রামে থাকিয়া সকলের সুখদুঃখে তেমন না হইয়া পারা যায় না।" অতএব দেখা যাইতেছে ব্রহ্মচারীবাবার এই দেশমুক্তির মধ্যে নিজের মুক্তি জড়িত নাই। তিনি ছিলেন নিত্যমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ। শুধু লোকশিক্ষার জন্যই লোকহিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। যিনি সিদ্ধ জ্ঞানযোগী, তাঁহার কর্মের প্রয়োজন ফুরাইলেও তাঁহাকে লোক-শিক্ষার জন্যই নির্লিপ্তভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছে। গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের মুখেও অনুরূপ বাণী আমরা শ্রবণ করিয়াছি—

> "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন
> নানাবাপ্তম বাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মানি"

—তিনলোকে আমার করিবার কিছুই নাই—তবুও লোক-শিক্ষার জন্য আমি নিয়ত কর্মে প্রবৃত্ত আছি।

শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীবাবার বিভিন্ন পত্রাবলীতে আসক্তিহীন দেশ প্রেমের যে ছবি আমরা দেখিয়াছি সন্ন্যাসী জীবনে তাহা অভিনব। সারা দেশে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিদেশী শাসন মুক্তির যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, ব্রহ্মচারীবাবা তাহাতে উদাসীন ছিলেন না। শুধু মাত্র আত্মিক মুক্তিই তাঁহার কাম্য ছিল না রাজনৈতিক মুক্তির

প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই দেশের মুক্তির জন্য যাঁহারা অহিংস সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, ব্রহ্মচারীবাবা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন সর্বতোভাবে---তাহাদের গঠন মূলক কাজে সহযোগিতা করিয়াছিলেন সর্বপ্রকারে। তিনি শুধু ব্রহ্মচারী ছিলেন না তিনি ছিলেন ভারত ব্রহ্মচারী। তাঁহার পত্রাবলীর শেষে নিজে স্বাক্ষর দিয়াছেন "ভারত"। মাতৃভূমির নামের সহিত নিজের নামটি এক করিয়া লইয়া দেশকে তিনি নিজের মতই ভালবসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে দেশপ্রেমিক ও ভগবৎ প্রেমিক।

ব্রহ্মচারীবাবার লিখিত পত্রাবলীর কতগুলিতে আছে দার্শনিক তত্বানুসন্ধান। ঐগুলিতে তিনি নিজেই প্রশ্নকর্ত্তা নিজেই উত্তরদাতা। এই পত্রগুলিতে আমরা দেখিতে পাই তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানীরূপে। তাহার ভিতরে তখন অনন্ত ভগবান সম্বন্ধে অনন্ত জিজ্ঞাসা---অফুরন্ত অনুভূতি।

মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদে। এই কান্না কিসের? কোথায় এই কান্নার শেষ? এই পৃথিবীতে প্রবেশের পূর্বে মানুষ ছিল এক বিরাট পুরুষের দেহে এক হইয়া। সে এখানে আসিয়াছে সেই বিরাট এক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "মমৈব অংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন।" ভুমিষ্ঠ হইয়াই কান্না এই বিচ্ছেদের কান্না, আর সারা জীবনের ক্রন্দন ঐ বিরাট পুরুষের সহিত মিলিত হইবার ক্রন্দন। যাহাকে বৈষ্ণব দার্শনিক বলিয়াছেন পুরুষোত্তম। যাহাকে আমরা জানি ভগবান বলিয়া। মানুষের যতকিছু দুঃখ এই ভগবৎ বিরহের দুঃখ। কতকিছু কামনা এই পুরুষোত্তম লাভের কামনা। তাইতো তত্বদর্শীগণ বলিয়াছেন ভগবান আছেন, তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। বিভিন্ন সাধনার ইহাই মূলকথা। পার্থক্য শুধু সুরে, পরিবেশনের তত্বটি মূলতঃ এক। শুধু ভগবানের শরণাপন্ন হও "মামেকং শরণং ব্রজ।" ভগবানকে ডাকিতে হইবে; কিন্তু কি নামে ডাকিব? তিনি আমাদের

কে? পিতা মাতা না সখা? বেদ বলিতেছেন 'পিতা নোঽসি', তুমি আমাদের পিতা। গীতা বলিতেছেন, আমি এই জগতের পিতা। শুধু পিতা নয়, অহং বীজপ্রদ পিতা, আমি বীর্যদানকারী পিতা। প্রকৃতি আমার মহৎ যোগিন তস্মিন গর্ভং দধামি অহং, প্রকৃতি যোনিতে আমিই গর্ভ দান করি।

ব্রজের গোপীরা কিন্তু ভগবানকে পিতা মাতা কিছুই বলেন নাই, বলিয়াছেন সখা। তাহাদের কাছে ভগবান জগৎ পিতা নহেন, জগৎপতি। তাই তিনি গোপীবল্লভ।

পর্যটক শ্রীমান যোগানন্দকে লিখিত পত্রে ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেছেন—"যাহা হইতে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইতেছে, ইনিই ব্রহ্মযোনি—আমাদের মা।" শ্রীমান শান্তিদানন্দকে লিখিত পত্রে বলিলেন—"জগৎটা মায়ের প্রতিমা"। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মচারীবাবার জীবন-দর্শনে ভগবানকে ডাকিতে হইবে মাতৃরূপে। তিনি ভগবানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ পাতাইয়া ছিলেন তাহা মাতা ও পুত্রের সম্বন্ধ। রামকৃষ্ণ-রামপ্রসাদের কণ্ঠেও আমরা শুনিয়াছি 'মা' 'মা' ধ্বনি। তাঁহাদের কাছে মা-ই সব।

বেদের পরবর্তী গীতা। এখানে আসিয়া ভগবান নিজে বলিলেন—পিতা অহম্ অস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ—অর্থাৎ ভগবান পিতাও বটেন মাতাও বটেন। এমনকি পিতামহও তিনি; একাধারে সব। ব্রহ্মচারীবাবার জীবনেও বুঝি এই সত্য অনুভূত হইয়াছিল! তাই মাতৃপূজারী ব্রহ্মচারীবাবা শ্রীমান শরচ্চন্দ্র ব্রতাচারীকে লিখিত তাঁহার পত্রে বলিতেছেন "—এই পুরুষ প্রকৃতির অনন্ত নাম। উপাসক ভেদে কেহ রাধাকৃষ্ণ, কেহ বা শিবশক্তি বলিয়া থাকেন।" অতএব দেখিতেছি ব্রহ্মচারীবাবার জীবনদর্শনে ভগবান পুরুষ এবং নারী দুই-ই। তিনি পিতারূপে গর্ভদান করেন—মাতারূপে গর্ভধারণ করেন। ভগবৎ চিন্তার এই সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে বাউলের কণ্ঠে। ভগবৎ স্বরূপের রূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া বাউল বলিয়াছে—

"—তুমি একে তিন, তিনে এক সব করিতে পার,
সর্প হইয়া দংশন কর ওঝা হইয়া ঝাড়।"

বৈষ্ণব কবিরা গাহিয়াছেন—

"তুমি পুরুষ কি নারী তাতো বুঝিতে নারি
স্বয়ং না বোঝালে সেকি বুঝিতে পারি—?"
"তাইতো আধা রাধা আধা কৃষ্ণ
সাজিলে বৃন্দাবনে।"

এমন কি শ্রীকৃষ্ণ নিজেও সনাতনকে বলিলেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শোন সনাতন
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন"—

এই অভেদ জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। শ্রীমান ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণকে লিখিত পত্রে ব্রহ্মচারীবাবা এই ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন। অবশ্য ডাকিবার সুবিধা ও সান্নিধ্যলাভ সহজসাধ্য বলিয়াই একদল সাধক ভগবানকে ভজিয়াছেন মাতৃরূপে। ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার জীবন-দর্শনের মূলকথাটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে শ্রীমান যোগানন্দকে লিখিত পত্রের শেষ অংশে। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, "...সাধারণভাবে মাকে জানিয়া মায়ের কোলে বসিয়া উপাসনারূপ আব্দার করিতে করিতে হ্লাদিনী স্বরূপা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার অধিকারী হও...।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মচারীবাবার জীবনদর্শনে উপাসনা কার্যটি কোন দুশ্চর সাধনা নহে। ইহা নিতান্তই আব্দার—মায়ের কাছে ছেলের আব্দার। ভগবানকে মাতৃজ্ঞানে তাঁহার কোলে বসিয়া তাঁহাকেই ডাকিতে হইবে, এবং ডাকিতে ডাকিতে তাঁহাকে দেখিতে হইবে কৃষ্ণরূপে, বুঝিতে হইবে কৃষ্ণই লীলার কৃপাচ্ছলে মাতৃরূপে ভক্তকে কোলে লইয়াছেন এবং ভক্তের আব্দারে প্রীত হইয়া তাহাকে কৃষ্ণরূপে দেখা দিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই ব্রহ্মচারীবাবার জীবন-দর্শন। তাইতো শ্রীমান শরচ্চন্দ্র ব্রতাচারীকে লিখিত দ্বিতীয় পত্রে লিখিতেছেন,

—"একটি তত্ত্ব, তাহাকে সাধক অন্তরে অর্থাৎ ভিতরে দেখিতে গিয়া আত্মা বলিয়া থাকেন, আর বাহিরে দেখিতে গিয়া ঈশ্বর বা মা বলিয়া থাকেন—" এইখানে আসিয়া ঈশ্বর ঈশ্বরী একাকার। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান, তাই ব্রহ্মচারীবাবার কথা—"ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলিয়া জানি"। এই অনুভূতিটা হইতেছে বেদান্তবাদীর। ব্রহ্মচারীবাবা একাধারে বেদান্তবাদীও বটেন আবার মাতৃসাধকও বটেন। ইহা ব্রহ্মচারী-জীর দ্রষ্টৃত্বাবস্থার ফল। তাই শ্রীমান অশ্বিনীকুমার ধরকে লিখিত পত্রে তিনি লিখিতেছেন—"দ্রষ্টৃত্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে দ্রষ্টাকে হ্লাদিন্যাভিমানী বলা যায়, এই অবস্থায় দ্রষ্টা অনুভব করেন সচ্চিদানন্দ, তাঁহার আত্মা হয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।" এই অবস্থার কথাই গীতায় বলা হইয়াছে—যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি, যিনি আমাকে এইরূপ দেখেন তিনিই ঠিক দেখেন। ব্রহ্মচারীবাবা ভগবানকে এই রূপেই দেখিয়াছিলেন। এইরূপ দ্রষ্টার অবস্থা বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মচারী-বাবা শ্রীমান শিবেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়কে লিখিত তাঁহার পত্রে বলিতেছেন—

"এই অবস্থায় দ্রষ্টা লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন; তখন ভগবদিচ্ছা এবং তাঁহাদের ইচ্ছা অভিন্ন। এই ভাগ্যবান পুরুষগণের জন্ম মৃত্যু নাই। দরকারবশতঃ নানারকমেই জগতে বিচরণ করিতে পারেন, তাঁহাদের গতিও গোলোক হইতে ভূলোক পর্যন্ত......"

তাই প্রয়োজনবশতঃ ব্রহ্মচারীবাবা আমাদের মধ্যে ভূলোকে বিচরণ করিয়াছেন মাতৃসাধকরূপে যদিও তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী—দ্রষ্টাপুরুষ। শ্রীমান সুধীরানন্দকে লিখিতেছেন "রাজলক্ষ্মী জগজ্জননীর করুণা ভিন্ন জগতের মঙ্গল সাধন হইতে পারে না, তাই তাঁহার আদেশ অনুসারে বৃহৎকার্যে ব্রতী হইলাম।" আবার সিদ্ধাশ্রমের সন্ন্যাসী-গণকে উপদেশ দিতেছেন—"আত্মজ্ঞান লাভে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ ও ঈশ্বরোপসনায় আত্মজ্ঞান লাভ"—এখানে মায়ের কথা বলেন নাই। এইভাবেই ভগবানের পিতৃরূপ ও মাতৃরূপের সমন্বয় সাধন করিয়া

কখনও আবার গোলোকে বিচরণ করিয়াছেন। শুধু প্রয়োজন ও উপলব্ধির স্তরভেদে ভগবানকে কখনও ঈশ্বর কখনও ঈশ্বরী বলিয়াছেন। এই দুইজনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সচ্চিদানন্দ অনুভব করিতে মাতৃরূপী ভগবানের কোলে বসিয়া পিতৃরূপী ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সর্বরূপী শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারীবাবার জীবনদর্শন।

ব্রহ্মচারীজীর এই জীবনদর্শন শুধু নিজের জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহার ভক্তশিষ্যগণকেও বিতরণ করিয়াছেন। জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যখনই কেহ তাঁহার কাছে অন্তরের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে তখনই তিনি তাঁহার প্রজ্ঞালোকের রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগে ঐ মানসিক ক্ষত নিরাময় করিয়াছেন। গৌরী-আশ্রম হইতে সরলানন্দকে লিখিত পত্রে তিনি নির্দেশ দিলেন "একমাত্র ভগবৎ কৃপা ভিন্ন জীবের আর অন্য উপায় নাই—স্থির ধীরভাবে উপাসনা করিতে থাক—ক্রমে ক্রমে পূর্ব দুষ্কৃতি নষ্ট হইয়া অচিরেই শান্তি লাভ করিতে পারিবা।" শ্রীমান শান্তিদানন্দকে লিখিত পত্রেও ঐ সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীবাবা ঐ পত্রের উপ-সংহারে লিখিতেছেন—"শান্তি মায়ের অভয় কোল—অশান্তি মা'র অসির তাড়না। আশীর্বাদ করি তোমরা মায়ের কোলে থাকিয়া মায়ের বৈভবরূপ স্তন পান করিয়া আনন্দ-স্বরূপ হও।" এইভাবে যখনই যে ভক্ত তাপদগ্ধ অন্তর লইয়া এই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইয়াছে, তাহাকেই উপদেশবারি সিঞ্চনে তাহার তাপাগ্নি নির্বাপিত করিয়াছেন। আর যখনই যাহা কিছু বলিয়াছেন সর্বত্রই মূলসুরটি হইতেছে, যে আকারেই হোক ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে। ভক্তপ্রবর অক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার রোগ সম্বন্ধে মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে ব্রহ্মচারীবাবাকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়া ছিলেন। উত্তরে তিনি লিখিতেছেন—"মা বলিয়াছেন যে ইহা ভবরোগ, —এই রোগ না সারিয়া যে সাংসারিক কার্যে ব্যতিব্যস্ত থাকিতেছেন

ইহা জগতের অশিক্ষার কারণ।" অতএব দেখা যাইতেছে লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করিতে হইবে, ইহাই ব্রহ্মচারীবাবার নির্দেশ। তাঁহার অনুভূতির পর্দায় কর্ম ও জ্ঞান এক হইয়া দেখা দিয়াছে। তাঁহার কাছে কর্ম শুধু জ্ঞানলাভের উপায় নহে, কর্মই জ্ঞান। আর এই লাভই ঈশ্বরলাভ। তাঁহার কাছে আত্মজ্ঞানলাভ, ঈশ্বরলাভ, সচ্চিদানন্দলাভ এক কথা। তাই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সম্বন্ধে সুশীলানন্দকে লিখিত পত্রে ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেছেন, ইহা আর কিছুই না, মানবের স্থৈর্যই ধর্ম, ধৈর্যই অর্থ, ক্ষমাই কাম, সন্তোষই মোক্ষলাভ বা মুক্তিলাভ জানিবা। অতএব লিখি, সকলকেই বলিবা সর্বদাই যেন স্মরণ রাখে কর্মের ভিতর দিয়াই এই চতুর্বর্গ লাভ করিতে পারে।"

এইভাবে ভক্তজনের বিভিন্ন পত্রের উত্তরে ব্রহ্মচারীবাবা বিভিন্ন তত্ত্ব সমস্যার সমাধান দিয়াছেন। হৃষীকেশ হইতে মোক্ষদানন্দ লিখিয়াছিলেন, সংস্কারগত মলিন বাসনার অভ্যুদয় হইলে স্মৃতিজ্ঞান থাকে না, আবার শাস্ত্র আলোচনাকালে মলিন বাসনা থাকেনা, এই দ্বন্দ্ব উপশমের উপায় কি? ব্রহ্মচারীবাবার মতে এইরূপ দ্বন্দ্বের কারণ হইতেছে অর্দ্ধতত্ত্বজ্ঞান-লাভজনিত ভ্রান্তি। তাই মোক্ষদানন্দের ঐ পত্রের উত্তরে তিনি লিখিতেছেন, "কেবল দেহাত্মবোধে কর্তৃত্বাদি অহংকারবশতঃ যে কামনা বাসনা ইহাই জানিবার জন্য আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। জীব আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে নির্লিপ্ততা অকর্তৃত্ব আপনা হইতেই আসে।" আর আত্মজ্ঞানলাভের সহজ উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন ব্রহ্মচারীজী। একই পত্রে তিনি লিখিতেছেন "বেদান্ত আলোচনা বরাবরই করিতে হয় না, তাহার মর্ম অবগত হইয়া কেবলা প্রকৃতির লীলা শ্রবণ ও কীর্তনাদি করিতে যত্নবান হও, যত সব বিষয়বৃত্তি দেখ, সে সব তোমার নয়, তোমার প্রকৃতির। ইহা নিশ্চয় জানিবা যে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতিকে কর্তা জ্ঞান করিবে ততক্ষণের জন্য তুমি অকর্তা থাকিবে, ইহাই জ্ঞান, ইহাই কর্মের জ্ঞানরূপ; ইহাই মানুষের চতুর্বর্গলাভের কৌশল।"

শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারীবাবা ছিলেন জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ। লেখা-পড়া শিখিতে পারেন নাই—পনর বছর বয়সে হইয়াছিলেন পিতৃহীন—এখানেই তাঁহার পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পত্রাবলীতে যে জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বের বিভিন্ন প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা আমরা দেখিতে পাই তাহা কোথা হইতে আসিল? পৃথিবীতে একদল মহাত্মার দর্শন পাওয়া যায় যাঁহারা জাতজ্ঞাণী। তাঁহারা পূর্বজন্মের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি লইয়াই মাটিতে অবতীর্ণ হন, ঐ জ্ঞানামৃত ধারায় মানুষের অতৃপ্ত অন্তর তৃপ্ত করিতে। ব্রহ্মচারীবাবা এই মহাপুরুষগণের অন্যতম।

ভারতবর্ষের মাটিতে শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারীবাবার মত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যুগে যুগে আসিয়াছেন, আরও আসিবেন। তাঁহারা আসিয়াছেন বলিয়াই আমরা আজও বাঁচিয়া আছি—ভবিষ্যতে আসিবেন বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া থাকিব। ভারতবর্ষ মরিবে না—চিরযুগ বাঁচিয়া থাকিয়া মহাপ্রলয়ের শেষ সন্ধিক্ষণে বিশ্বকে নূতন করিয়া বাঁচিবার পথ-নির্দেশ দিবে—শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারীজীর মত মহাপুরুষগণ হইবেন ঐ পথের দিক্-দিশারী। ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য, ইহাই তাহার নিজস্ব, রাজনৈতিক আবর্তের পঙ্কিলতার মধ্যে ভারতবর্ষ ইহার জোরেই বাঁচিয়া থাকিবে—কারণ:

"এ ভারতভূমির প্রতি তৃণ পরে আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি,
এ ভারতভূমির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।"

—•—

শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীজীর অধ্যাত্মচিন্তা ও স্বদেশচিন্তা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পৃথিবীর প্রতিটি জাতির এক একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটিই ঐ জাতির শিক্ষা, চিন্তা ও সমাজ-চেতনার মূলস্তম্ভ-স্বরূপ। তাকেই আমরা বলে থাকি জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বা সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য। এই সংস্কৃতি জাতির দীর্ঘজীবনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। জাতির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও তার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি কখনো ঘটে না। নদীর ধারার মতো উৎসমুখ হ'তে সাগর মিলন-মোহনা পর্যন্ত সে অনবরত সেই জাতির সঙ্গে সকল অবস্থায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। দুগ্ধের ধবলতার ন্যায়, শর্করার মিষ্টত্বের ন্যায় এবং অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় সেই সংস্কৃতি জাতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত।

ইংরেজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বাণিজ্যমুখী, ফরাসীগণের বৈশিষ্ট্য শিল্প ও সাহিত্যমুখী এবং ভারতীয় বৈশিষ্ট্য অধ্যাত্মমুখী। তাই দেখি ভারতীয় সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা সব কিছুই ধর্মসাপেক্ষ ;—সব কিছুই ঈশ্বরমুখী। এমন কি গার্হস্থ্যজীবনের দৈনন্দিন ক্রিয়া-কর্মাদিও ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে তৎসান্নিধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ দেশে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় শুভ শঙ্খরবের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তৎপর তার বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, বিবাহ, গৃহনির্মাণ, গৃহপ্রবেশ, ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষিকার্য, নূতন ধান্যের নবান্ন প্রভৃতি গৃহধর্মের নানাবিধ ক্রিয়াকর্মাদি এবং পরিশেষে মৃত্যুকালে কর্ণে নাম শ্রবণ, কীর্তন, পরলোকান্তে শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া সব কিছুই ঈশ্বরকে পুরোভাগে রেখে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এক কথায় বলা চলে ভারতের সর্বক্ষেত্রের চিন্তার নিয়ামক বা প্রভু হলেন ঈশ্বর।

আকাশ, বাতাস, জলবায়ু, মেঘ, রৌদ্র, বৃষ্টির মতোই ভারতের জীবনধারায় ঈশ্বরচিন্তা অতি সহজ, সুলভ এবং স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়—মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নীর মতোই ভগবান এখানে সহজ সম্বন্ধে সকলের সঙ্গে নিত্য জড়িত হয়ে আছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাই গেয়েছেনঃ

"দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
মানুষের ঘরে দেখেছি আমরা মানুষের ঠাকুরালি।"

ভারতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ একটি পুষ্পেরই চারিটি 'দল' মাত্র। ভারতীয় মহাপুরুষগণ এ কথা বার বার বলেছেন। কেউ ত্যাজ্য নয়। জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য এদের সম্যক্ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই দেখি দেবতার মন্দিরগাত্রেও স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগচিত্র উৎকীর্ণ রয়েছে দেবলীলারই পাশাপাশি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মন্দির" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন, "মানুষের ছোটো-বড়, ভালোমন্দ, প্রতিদিনের ঘটনা তাহার খেলা ও কাজ, যুদ্ধ ও শান্তি, ঘর ও বাহির বিচিত্র আলেখ্য দ্বারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিস চোখে পড়ে যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয় অনেক কিছুই আছে।" এই 'মন্দির" শীর্ষক প্রবন্ধের অন্যস্থানে কবি বলিয়াছেন, "ভুবনেশ্বর মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা মনে মনে স্বর্গ-মর্ত্যকে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্বদা ভয়, দেবমানবের মধ্যে যে পরম পবিত্র সুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্রমানব বুঝি তাহা লেশমাত্র লঙ্ঘন করে।...কিন্তু এখানে মানুষ দেবতার যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে তাও নয়। গতিশীল, কর্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।"

কবিগুরুর এই যুক্তিপূর্ণ দৃঢ় স্বীকারোক্তি ভারতীয় ধর্মের অতিব্যাপ্তি ও উদারতার কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এক কথায় বলা চলে মানবের দেবত্বে উন্নীত হবার যে সোপানাবলী ভারতীয় ঋষিগণ জীবন চর্যার মধ্য দিয়ে একদা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন তার মধ্যে কোনও ফাঁক বা ফাঁকি ছিলনা, সেই জীবনচর্যা পার্থিব কোনো বস্তুকেই বাদ দেয় নি। সব কিছুকে নিয়েই তার অমৃতের পথে জয়যাত্রা। তাই তার অপর নাম "ধর্ম" ধারণ করে আছে সমানভাবে সব কিছুকেই। (ধৃ+মন্ প্রত্যয় করে "ধর্ম" কথার উৎপত্তি হয়েছে।)

ভারতব্রহ্মচারীবাবার দিব্যজীবন সেই অনন্তের সুরে বাঁধা। তাঁর নিত্যপ্রয়োজনীয় অতি সামান্য কার্যাদিও ভগবদাদিষ্ট হয়েই অনুষ্ঠিত হত। আশ্রম পরিচালনার নানাবিধ কার্যাদি হতে শুরু করে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রবিষয়ক ব্যাপক ও গভীর চিন্তাও তাঁর জগন্মাতার আদেশেই পরিচালিত হত। তিনি দৃঢ়ভাবে শুধু বিশ্বাস করতেন না, জীবনের সকল সত্তা দিয়ে তিনি অনুভব করতেন যে, ভারতমাতা সাক্ষাৎ জগন্মাতারই চিন্ময়ী রূপ। তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এই কথা জানতেন যে ইংরেজ ভারতবর্ষে আর বেশিদিন রাজসিংহাসনে সমাসীন থাকবে না। তিনি জানতেন যে তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে যে তীব্র জাতীয়তাবোধ, জ্বলন্ত স্বাধীনতাস্পৃহা, অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগ এবং দৃঢ় চরিত্রবলের (যা যে কোনো স্বাধীন দেশের গৌরবের বিষয় বলে নিঃসন্দেহে অভিহিত হতে পারতো) প্রকাশ দেখা গিয়েছিল তা জগন্মাতার ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়েছিল। এবং তিনি আরো জানতেন যে, একদিন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য স্বমহিমায় স্বাধীন ভারতেই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তবে ভারতের সেই সত্যিকারের সুদিন স্বাধীনতালাভের ঠিক কোন মুহূর্তে আসবে সেই সম্বন্ধে তাঁর নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গীকার ছিল না। তিনি যা একান্তভাবে বুঝেছিলেন তাঁর ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে, যা অনুভূতির মধ্য দিয়ে একান্তভাবে

উপলব্ধি করেছিলেন তা হল, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদই আসুরীশক্তির বিনাশ ঘটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনবে এবং স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষেই ভারতীয় সনাতন ধর্ম বা মানুষের ধর্মের জয়গান উদ্গীত হবে ভারতের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে। বিশ্বের দিগন্তরেখাও সেই নব ভাবের জ্যোতিতে একদা সমুদ্ভাসিত হবে। সেই সুদিনের আগমন সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীবাবার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।

তিনি অধ্যাত্মচর্চাকে শুধু পর্বতকন্দরে সীমাবদ্ধ রাখতে আদেশ দেন নি। তিনি মনে করতেন, 'বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়' এই ধর্মচর্যা—যা সত্যিকারের ভারতীয় সনাতনধর্মের চিরাগত আদর্শ। ভারতব্রহ্মচারীজীর আবির্ভাব লগ্নে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুন্দুভি বেজে উঠেছিল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। তিনি নিস্পৃহ সন্ন্যাসী হয়েও ভারতমাতার বন্ধনদশায় একান্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। অধ্যাত্মচর্চার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ-জনকে ভারতের তৎকালীন পরাধীনতার গ্লানির কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং নিজে সেই স্বাধীনতা সমর-যজ্ঞের সমিধ্ আহরণের নিমিত্ত চরিত্রবান্ বিবেকবান্ ত্যাগী সন্তানদল গঠনের দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। ব্রহ্মচারীজী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে স্বদেশসেবা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ভগবৎসেবাই হয়ে থাকে। দেশের আপৎকালের কথা স্মরণ করে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে ভারতবাসীকে আহ্বান করেছিলেন এই বলে—"আজ থেকে আগামী পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত দেশমাতৃকাই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হোক্।" তিনি বুঝেছিলেন যে, ভারতের এই দুর্দিনে দেশ-মাতৃকার বন্ধনদশা মোচনই ভারতবাসীর একমাত্র কর্তব্য। ভগবদারাধনা এই মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়েই সাধিত হবে। কুরু-ক্ষেত্রযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সেই বীর্যময়ী বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের অন্তরে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রূঢ়কণ্ঠে হতাশানিমজ্জিত অর্জ্জুনকে বলেছিলেন :

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্ব্যযুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণ বজ্রকণ্ঠে যুদ্ধে বিরত অর্জ্জুনকে বললেন:

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥"

তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে হে অর্জ্জুন। মৃত্যু হলে স্বর্গলাভ, যুদ্ধে জয়ী হলে রাজ্যলাভ। কাজেই এই অপরিহার্য পরিণামে যুদ্ধই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীজীও তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সন্তানগণকে ভারতের আসন্ন মুক্তিসংগ্রামের দিকে বারংবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে বলেছেন। তিনি তাদের মনকে ঐ ব্যাপারে প্রস্তুত করিতে বলেছেন। ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে, ভারতমাতার বন্ধন-দশা মোচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সম্ভব না হলেও অন্ততঃ পরোক্ষ-ভাবে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান করেছেন। স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি কোনোকালে উদাসীন ছিলেন না। বরং অধ্যাত্ম-মার্গের একজন সিদ্ধ সাধকের পক্ষে দেশের মুক্তি সাধনার চিন্তায় এতটা ব্যাকুল হতে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের পর আমরা আর কোন বাঙ্গালী সাধককে এমন দেখেছি বলে মনে হয় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধ মহাত্মার লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

"অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনো গতর্ব্যথঃ।"

অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে থাকবেন সদা শুচি। প্রতিটি ব্যক্তির সহিত আচার আচরণে থাকবেন নিত্য নিরপেক্ষ এবং একান্ত ঈশ্বর নির্ভরত্ব হেতু বাস্তব জগতে থাকবেন যথার্থই নিস্পৃহ ও উদাসীন। 'আকাশ-বৃত্তি'ই তাঁর জীবনের হবে মূলমন্ত্র। সেই বিচারে আমরা শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীজীকে গীতোক্ত ঐ সূত্রের জীবন্ত বিগ্রহ বলে অভিহিত করতে পারি। প্রতিটি কার্যে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ দৃষ্টি ছিল। ভারত-

ব্রহ্মচারীজীর নিজহস্তে লিখিত বহু চিঠিপত্রই তাঁর এই কর্মকুশলতার যথেষ্ট সাক্ষ্য দেয়।

"এ জীবন কর্মময়।
মরিলে বিশ্রাম হয়॥"

এই প্রাচীন নীতিবাক্যটির যথার্থ উদাহরণ যেন ব্রহ্মচারীজী নিজ জীবনে আদর্শরূপে দেখাবার জন্যই তিনি শত সহস্র কার্যে যুগপৎ সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। আশ্রম পরিচালনা, নূতন ভাবাদর্শে নূতন নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা, সংঘগুরু হিসাবে নিয়ত গুরুভ্রাতাভগ্নীগণকে অধ্যাত্মপথে পরিচালনা করা এবং উপরন্তু স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্র চিন্তা, স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিবিধি অনুযায়ী নিজেকে ও নিজ অন্তরঙ্গগণকে নিত্য প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্যে তাঁর বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না। তদীয় চিঠিপত্রাদিই তাঁর দুর্বার কর্মস্রোতের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অথবা শ্রীকৃষ্ণের সেই শাশ্বত উপদেশের কথা মনে পড়ে যায় যেখানে তিনি অর্জ্জুনকে সম্বোধন করে বলেছেন, "নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং"। হে অর্জ্জুন, তুমি ফলত্যাগী হয়ে শুধু কাজ করে যাও। আত্মার কল্যাণকর কার্যে নিয়ত নিজেকে ব্যস্ত রাখ! অন্য কোনো দিকে তাকাবার তোমার প্রয়োজন পর্যন্ত নেই। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীজীও যেন সেই জাহ্নবীধারাবৎ দুর্বার কর্মস্রোতে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। কাজ কাজ শুধু কাজ। কাজের শেষে আবার এসেছে নূতন কাজের আহ্বান। তাঁর জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছে বহুবার। সেই কর্মযজ্ঞের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে এখনও যে কয়জন তাঁর বর্ষীয়ান্ শিষ্য জীবিত আছেন তাঁদের মুখে আমরা বহুবার সে কথা শুনেছি।

অথবা বলবো, সিদ্ধমহাত্মাগণের জীবনধারা বুঝি এরকম ভাবেই প্রবাহিত হয়ে থাকে। "জীবনে জীবন যোগ করা" কবিগুরুর এই বাণী ব্রহ্মচারীজীর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। জীবন জাগাবার জন্য একহাতে কর্ম ও অন্যহাতে যোগ ও ভক্তির প্রদীপ নিয়ে তিনি

ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্রহ্মচারীজীর সরল ভাষায় লিখিত চিঠিপত্রাদি হতে তাঁর এই দ্বিবিধ ভাবধারার সাক্ষ্য আমরা পেয়ে থাকি।

ব্রহ্মচারীজীর চিঠিপত্রের ভাষা যেমন সরল, ভাবও তেমন সহজ। পৃথিবীর আলো বায়ুর মতোই তা সহজে বোধগম্য ও উপভোগ্য। কোনোপ্রকার জটিল ব্যাখ্যা বা তত্ত্বের অবতারণা তিনি কোনদিন করেন নি। অথচ মানবজীবনের কঠিন জটিল দুঃখযন্ত্রণার উপশমের কতো সহজ ব্যবস্থাই না তিনি ঐ সকল চিঠিপত্রের মাধ্যমে দিয়েছেন। সভাসমিতিতে বক্তৃতা, সাধুমণ্ডলীর সভায় যোগদান কিংবা ঐ সকল সমিতির কোনো উচ্চপদ অলঙ্কৃত করা এই সকল ব্যাপারে তিনি চিরকাল উদাসীন ছিলেন। সহজের উপাসক তিনি। জীবনের সকল সুখদুঃখ, ভালোমন্দ, সবকেই তিনি সহজ ও শান্তভাবে গ্রহণ করে তার মধ্যেই বিধাতার কল্যাণরূপটিকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মাতৃভাবের প্রেরণায় জগন্মাতার সবই লীলাখেলা, সবই মায়ের দান এইভাবে জীবন ও জগতের তিনি সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীকেও ঐভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে উপদেশ দিতেন।

"আমি আছি আর মা আছেন—
ভাবনা আছে কি আমার।
আমি মায়ের কোলে খাই পরি
মা নিয়েছেন আমার ভার॥"

মাতৃসাধকের এটি উপযুক্ত গান। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের এই গীতি। ভারতব্রহ্মচারীবাবাও তাঁর জীবনের সকল কর্ম, সকল চিন্তা ঐ জগন্মাতার প্রেরণাতেই করতেন। মা ছাড়া তাঁর নিজের জীবনে দ্বৈত কোনো সত্তা ছিল না। মাতৃস্তন্যে যেমন শিশু পুষ্ট হয় তেমনি মাতৃভাবরসে তাঁর নিজের জীবনের সকল কর্মধারা পুষ্টিলাভ করতো। এক কথায়—"মায়ের ছেলে ছেলের মা জগৎ-জীবন তাঁহার ছা।" এই ভাবের ভাবনায় তাঁর সমগ্র জীবন ব্যয়িত হয়েছিল।

তাই, ভারতমাতার বন্ধনদশাতে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন নি। মায়ের কষ্ট সন্তানের মর্মমূলে বিদ্ধ হয়েছিল বলেই অধ্যাত্মপথের পথিক হওয়া সত্বেও তৎকালীন স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কর্মাদি তাঁর সমর্থন পেয়েছিল। বার বার সেই কথা তিনি বহু চিঠি-পত্রাদিতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ত্যাগী সন্তানগণের মধ্যে তিনি জগন্মাতার প্রতিভূস্বরূপা এই ভারতমাতার দুর্দশার কথা উল্লেখ করে তার প্রতিবিধান নিমিত্ত নানা উপদেশাদি বিতরণ করতেন।

ভারতব্রহ্মচারীজীর অধ্যাত্মচিন্তা ও স্বদেশচিন্তার নমুনাস্বরূপ তদীয় হস্তলিখিত কতিপয় চিঠিপত্রের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হল। এর মধ্য দিয়েই আমরা তাঁব যথার্থ মনোগত ভাবের একটি সুষ্ঠু পরিচয় পাবো।

(ক) শরৎচন্দ্র ব্রতাচারীকে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ—

অভিমন্যুর মত এই দেহরূপ ব্যূহে প্রবেশ শিখিয়াছ, বাহির হইবার কৌশল জান না। চৈতন্যাবস্থায় অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্বাবস্থায় বন্ধন নাই। জীবন্মুক্ত ঋষিগণ এই অবস্থায় থাকিয়া জগতে বিচরণ করেন।···আত্মশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে চতুর্দলে থাকিয়া "হং-সঃ" জপ করিতেছেন, ইহাকেই অজপা গায়ত্রী বলে। ইহা দ্বারাই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েন।···তাই লিখি ক্রিয়া করিতে থাক, কুণ্ডলিনী আপনিই জাগিবেন। ১৩।৪।১৩২৯

(খ) পর্যটক শ্রীমান মোক্ষদানন্দকে (কাশ্মীর) লিখিত পত্রের অংশবিশেষ—শাস্ত্রালোচনা সাধনার পৃষ্ঠপোষক রাখিয়া স্থিরভাবে ক্রিয়া করিতে করিতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবে, ইহাই প্রণালী।

২৮।৭।১৩২৯

(গ) শ্রীমান শান্তিদানন্দকে লিখিত পত্রের শেষাংশ :—

জগৎটা মায়ের প্রতিমা। প্রাপ্ত বস্তু মায়ের দেওয়া। সন্তোষ মায়ের কৃপা, অসন্তোষ অকৃপা। শান্তি মায়ের অভয় কোল—অশান্তি

মায়ের অসির তাড়না। আশীর্বাদ করি তোমরা মায়ের কোলে থাকিয়া মায়ের বৈভবরূপ স্তন পান করিয়া আনন্দ-স্বরূপ হও।

২৮।৮।১৩২৮

(ঘ) অন্যত্র লিখছেন শ্রীমান সুশীলানন্দকে—

এমন জোরে কাজ করিবা যে, এক বৎসরের মধ্যে উক্ত সাব-ডিভিসনের লোক কাপড়ের জন্য অন্য সাবডিভিসনে না যায়।—২১। ২।১৩২৮

(ঙ) ময়মনসিংহ জেলার বিখ্যাত উকিল শ্রীমহিমচন্দ্র রায় স্থানীয় স্বদেশী চিন্তানায়করূপে বৃটিশের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ভারতব্রহ্মচারীজীর নিকট থেকে যে পত্র পান, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্‌ধৃত করা হল ঃ—

আপনি যদি আবদ্ধ থাকেন তবে এ অঞ্চলের কাজ ভাল চলিবে না, তাই ভগবৎ ইচ্ছায় আপনি ফেরৎ হইয়াছেন। তাই লিখি, স্বরাজ অতি নিকট, এই বারেই আমাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। আর গৌণ করিবেন না, এখন আবার কাজে অগ্রসর হইলে আপনার দ্বারা খুব কাজ হইবে। মা'র আদেশ—এবার কলিকাতা ইত্যাদি স্থানে যে খেলা চলিয়াছে, এই আন্দোলন আর না কমিয়া আরও ভীষণ আকার ধারণ করিবে এবং ইহার ভিতরই স্বরাজ লাভ হইবে। আপনি শীঘ্র দেশের ছেলেদের পশ্চাৎ রক্ষক হইয়া দাঁড়ান, নচেৎ মায়ের কাজে আংশিক রকমের হইলেও সাময়িক অঙ্গ ভঙ্গ হইবে। ১২।৮।১৩২৮

(চ) অন্যত্র এক পত্রে লিখছেন ঃ—

আমার সিদ্ধিলাভের পর, মা আমাকে কৃপা করিয়াছেন পরেই বলিয়াছেন—আমি ইউরোপের শক্তি হ্রাস করিবার জন্য মহাসমরের সংঘটন করিব ; পরে ভারত স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে সত্যধর্ম স্থাপন করিয়া ভারতে দেবতা মানবে অপূর্ব লীলা করিব। ১৫।৯।১৩২৮

ভারতব্রহ্মচারীজীর অধ্যাত্মসাধনা তাঁর স্বদেশচিন্তার পরিপূরক

হয়েছিল। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে জগন্মাতার সুযোগ্য সন্তান বলেই তিনি ভারতমাতার ত্যাগী সৈনিকরূপে তৎকালীন জনসাধারণের নিকট প্রতিভাত হয়েছিলেন।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মন্ত্রটি ভারত-ব্রহ্মচারীজীর জীবনের মূল কথা ছিল। সমগ্র জীবন সাধনা দ্বারা তিনি এই মন্ত্রটিকে জাগ্রত করে রাখতে পেরেছিলেন। ভারত-ব্রহ্মচারীজীর অধ্যাত্মসাধনা তাঁর স্বদেশচিন্তা ও স্বরাজচিন্তাব সঙ্গে এমনভাবে জড়িত ছিল যে, একটি আব একটির সম্পূরক বা পবিপূরক বলে নিঃসন্দেহে অভিহিত করা যেতে পারে। ব্রহ্মচারীজীর জীবনে তাঁর অধ্যাত্মসাধনা ও স্বদেশচিন্তা একই বৃক্ষের দুই শাখারূপে, একই বৃন্তের দুটি পুষ্পরূপে অথবা একই পুষ্পের দুটি দলরূপে সম্যকভাবে বিকশিত হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।

—০—

শ্রীভারত চরিতামৃত

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদভট্টাচার্য

শ্রীমৎভারতব্রহ্মচারী ১৮৭৫ সালের ২৭ জুলাই (১২ শ্রাবণ ১২৮১) ময়মনসিংহ জেলার মহকুমা সহর কিশোরগঞ্জের নিকটবর্তী জগদল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামরতন দেব এবং মাতার নাম দীনমণি। তাঁর জন্মের দুই বছর আগে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাঁর জন্মের এক বছর পরই শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে জাতীয় সংহতি ও

আন্তর্জাতিক সহাবস্থানের মন্ত্র 'যত মত তত পথ' উচ্চারণ করে এবং সেই বছরেই শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের গুপ্তসমিতি 'সঞ্জীবনী-সভা' গঠন করেন তার পরের বছর ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ভারতসভা গঠিত হয়। এই ভারতসভার উদ্যোগে আবার ১৮৮৫ সালে রামতনু লাহিড়ির সভাপতিত্বে নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন হয়। ১৮৮৫ সালে দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর এই সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, এই সময় নবীনচন্দ্রের মহাভারত কাব্য রচনা শুরু হয়। প্রথমখণ্ড 'রৈবতক' ১৮৮৭ সালে দ্বিতীয় খণ্ড 'কুরুক্ষেত্র' ১৮৯৩ সালে এবং শেষ খণ্ড 'প্রভাস' ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই রৈবতক-এর পর খৃষ্টকে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে-র পর বুদ্ধকে নিয়ে এবং প্রভাস-এর পর শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে তিনি আরও তিনটি কাব্য লিখলেন। ভারতবর্ষ তখন নিজেকে এবং সেই সঙ্গে জগৎকে আবিষ্কার করতে উদ্যোগী। শ্রীভারতের জন্মগ্রহণের কাল থেকেই ভারতবর্ষে এক নবযুগের সূচনা হয়।

১ ৮৯ সালের সূচনাকালে (১৫ মাঘ ১২৯৫) শ্রীভারতের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তিনি সাড়ে চৌদ্দ বৎসরের বালক, বিদ্যা পাঠশালা পর্যন্ত। সম্বলের মধ্যে জগদল-এর পৈত্রিক ভদ্রাসনে জীর্ণ কুটির, সমান্য কিছু জমি আর হোসেনপুর বাজারে পিতার রেখে যাওয়া ছোট এক মনোহারী দোকান, এই বয়সেই সংসারের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হল। সংসারে তাঁর বিধবা মা, বিধবা দিদি নিত্যময়ী আর দুই ভাগিনেয়ী কুসুম ও কুমুদিনী। এই গুরুদশার বছরেই তিনি উস্থির শ্রীশিবকান্ত তর্কালঙ্কারের কাছ থেকে রা মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে গুরুসঙ্গতে মত্ত হলেন, দোকান সামলায় তাঁ বাল্যবন্ধু মহিম পাল। অল্পকালের মধ্যে এই গুরুকে হারালেন।

এই সময় গ্রামের গোপালচন্দ্র দত্তের 'লক্ষ্মীজনার্দন' শালগ্রাম শিলা স্বেচ্ছায় শ্রীভারতের পূজা নিতে এলেন। শ্রীশঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী 'শ্রীগুরু প্রসঙ্গে' লিখেছেন [শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায় সম্পাদিত মাসিক 'সোনার ভারত' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৮]ঃ '৺জয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে ৺ঠাকুরঘর ছিল। উক্ত ঠাকুরঘরে নিত্য পূজার বিগ্রহ ছিল, সেই সেই বিগ্রহের সঙ্গে গোপাল গোস্বামী গচ্ছিত শালগ্রামচক্রও নিত্য পূজিত হইতেন। ভারতব্রহ্মচারীবাবা সমস্ত রাত্রি একাসনে বসিয়া উপাসনা ও ধ্যান ধারণা করিতেন। একদিন নিশি রাত্রিতে তিনি যে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন সেই আসনে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন শালগ্রামচক্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মচারীবাবাকে ডাক দিয়া বলিলেন, ভারত! আমি আসিয়াছি। তুই আমাকে পূজা কর।' গোপাল গোস্বামী ও জয়চন্দ্র চক্রবর্তী বারবার শ্রীভারতকে ঠাকুর-চুরির জন্য তিরস্কার ক'রে ঠাকুর ফেরৎ নিয়ে যান, আর বারবার ঠাকুর একইভাবে শ্রীভারতের কাছে ফিরে আসেন। অবশেষে গোপাল গোস্বামী বললেনঃ 'এই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন চক্র আমার, আমি এই বিগ্রহ আমাদের পুরোহিত জয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে রাখিয়াছিলাম। ....অতএব যেহেতু ঠাকুর তোমাকে কৃপা করিয়া নিজে নিজে আসিয়াছেন, এই লক্ষ্মীজনার্দন বিগ্রহ তোমাকে দান করিয়া গেলাম।' এই গোপাল-গোস্বামীর কাছে শ্রীভারত দ্বিতীয়বার দীক্ষা নিলেন। শ্রীইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী 'শ্রীশ্রীভারতলীলা-মাধুরী'তে ['সোনার ভারত' পত্রিকা কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৮] বলছেনঃ 'সর্বপ্রথম উস্থিগ্রাম নিবাসী শুদ্ধ শান্ত স্বভাব—শ্রীমৎ শিবকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের নিকট হইতে 'রাম' মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তৎপর দ্বিতীয়বার স্বগ্রামবাসী শ্রীমৎ গোপালচন্দ্র দত্ত গোস্বামী মহোদয় মন্ত্র প্রদান করেন। ...শুভদিন দেখিয়া গোপাল গোস্বামীর নিকট হইতে তারকব্রহ্ম হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হন। গোপাল গোস্বামী জয়দেবের মন্ত্রধারামতে সস্ত্রীক

সাধন করিতেন।' কিন্তু এই দীক্ষার অব্যবহিত পরেই এই দ্বিতীয় গুরুও ইহধাম ত্যাগ করলেন। এবার জন্মভূমির কাছাকাছি হরিশ্চন্দ্রপট্টি নিবাসী শ্রীঅভয়াচরণ ভট্টাচার্যের সঙ্গ শুরু করলেন। ইনি ছিলেন শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর শিষ্য। তাঁর কাছে ব্রহ্মগায়ত্রী ও সোঽহং মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কঠোর সাধনা শুরু করলেন। পাঠশালার শিক্ষা তাঁর নামমাত্র ছিল, দীক্ষাগুরুর জ্ঞানাঞ্জনশলাকাতেই তাঁর চোখ খোলে। তাঁর এই দীক্ষাগ্রহণের সমকালেই তাঁর পরমগুরু শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ১৮৯০ সালে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭) দেহরক্ষা করেন ১৬০ বৎসর বয়সে।

পরমগুরু লোকনাথ :

১৭৩১ সালে (১১৩৭ বঙ্গাব্দ) শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বারাসত টাকির পথে কাঁকড়া-কচুয়া গ্রামে রামকানাই ঘোষালের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি উপনয়নঅন্তে আচার্যগুরু ভগবান গাঙ্গুলীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। শ্রীলোকনাথের বাল্যবন্ধু বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। গুরু ভগবান শিষ্যদ্বয় সহ হিমালয়ে দীর্ঘকাল সাধনা ও সশিষ্য সিদ্ধিলাভের পর কাবুলে যান। এই সম্পর্কে শ্রীরমেশচন্দ্র সরকার প্রণীত 'বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৮) বলা হয়েছে : 'কাবুল মুসলমান রাজ্য। সেখানে তখন মোল্লা সাদী (জন্ম ১১৭৪—মৃত্যু ১২৯২) বাস করিতেছিলেন। শেখ সাদী সুবিখ্যাত পারস্য দেশীয় সাধক কবি। গুরু ভগবান ও শিষ্যদ্বয় কাবুলে পৌছিয়া মোল্লা সাদীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং যথাযথভাবে তাঁহার নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা ও কোরাণ শাস্ত্র পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মের মূল তত্ব সংগ্রহ করিয়া লইলেন।'

শিষ্যদ্বয় সহ কাশীতে প্রত্যাবর্তনের পর গুরু ভগবান মণিকর্নিকা ঘাটে দেহরক্ষা করেন। এই সম্পর্কে উক্তগ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৮-৩০) বলা হয়েছে : 'কাবুল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কাশীধাম অভিমুখে

যাত্রা করিলেন। পথে হিতলাল মিশ্র নামে এক মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎলাভ ঘটে। এই হিতলাল মিশ্রই কাশীধামের খ্যাতনামা মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গস্বামী। ...গুরু ভগবান হিতলাল মিশ্রকে নির্ভরযোগ্য জানিয়া, তাঁহার হস্তে শিষ্যদ্বয়ের ভার সমর্পণ করিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন,—মিশ্রঠাকুর, আমার এই বালক দুটিকে আমি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম, তুমি ইহাদের ভার গ্রহণ কর। —মিশ্রঠাকুর সন্তুষ্টচিত্তে রাজি হইলেন। গুরু ভগবান ভাবনামুক্ত হইলেন। ...দেড়শত বৎসর বয়ঃক্রমকালে গুরু ভগবান তাঁহার গুরু-লীলা সাঙ্গ করিলেন। তখন লোকনাথের বয়স একশত বৎসর।' তখন ১৮৩১ সাল।

তারপর শুরু হল তাঁদের পরিব্রাজক জীবন। 'যথাসময়ে বেণীমাধবকে লইয়া ব্রহ্মচারী লোকনাথ পদব্রজে পশ্চিমাঞ্চল অভিমুখে রওনা হইলেন। আফগানিস্থান ও পারশ্যদেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আরবদেশে উপনীত হইলেন। মুসলমানদের তীর্থস্থান মক্কা ও মদিনানগরী দর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। মক্কা হজরত মহম্মদের জন্মস্থান, আর মদিনায় তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করিয়া প্রথম তাঁহারা মক্কায় উপস্থিত হইলেন। এখানের বিশিষ্ট মুসলমানগণ এই দুই হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে এক ফকির-দর্শন প্রবীণ মুসলমান লোকনাথের নিকট অগ্রসর হইয়া প্রস্তাব করিলেন,—আপনারা নিজে রসুই করিয়া খাইতে ইচ্ছা করিলে আমরা সিধা দিতেছি, গ্রহণ করুন। নতুবা আদেশ করিলে আমরাও রসুই করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।— মহাপুরুষ লোকনাথ জাতিবিচারের উর্দ্ধে। তিনি উক্ত ফকিরের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করিলেন।' (পৃষ্ঠা ৩১)।

জেরুসালেমে তাঁরা মহাপুরুষ আব্দুল গফুরের দর্শন লাভ করেন। তিনি ছিলেন চার জন্মের জাতিস্মর। কাশীর হিতলাল মিশ্র ছিলেন

তিন জন্মের জাতিস্মর আর স্বয়ং লোকনাথ ছিলেন দুই জন্মের জাতিস্মর। এই প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪) বলা হয়েছে ঃ 'কি অপূর্ব মিলন! ব্রহ্মচারী লোকনাথ দুই দিনের লোক, মিশ্রঠাকুর হিতলাল তিনদিনের, আর সাধক আবদুল গফুর চার দিনের! কোথায় হিমালয়, কোথায় কাশীধাম, আর কোথায় বা আরবদেশ! ইহাও আবার পদব্রজে। এই মিলন পারস্পরিক আধ্যাত্মিক আকর্ষণ। জগতের বিভিন্নস্থানে এরূপ মহাপুরুষ যে কত আছেন, তার ইয়ত্তা কে রাখে? মহাপুরুষগণ এক পরিবারভুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে লৌকিক জাত-বিচার নাই। পরবর্তীকালে বারদীতে শিষ্য সমাবেশে এই মহাপুরুষ আবদুল গফুর সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী লোকনাথ বলিয়াছেন,— আমি মক্কায় আবদুল গফুর নামে একজন ব্রাহ্মণ দেখেছি।—ব্রাহ্মণ শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিতেন,—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।...আরব দেশ হইতে স্থলপথে তাঁহারা এশিয়া-মাইনর, তুরস্ক, গ্রীস, ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ড অতিক্রম করিয়া ফ্রান্স দেশে উপস্থিত হইলেন।...এই সময় ফ্রান্স দেশে রাজনৈতিক গোলযোগ চলিতেছিল। সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি।'

ইউরোপ থেকে স্থলপথে হিমালয়ের বদরিকা আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পর হিতলাল মিশ্র তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই যাত্রার বিবরণ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪২-৪৩) বলা হয়েছে ঃ 'সাইবেরিয়া হইতে মঙ্গোলিয়া আসিতে তাঁহাদিগকে বহু পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী অতিক্রম করিতে হইল। অবশেষে তাঁহারা চীন দেশে উপস্থিত হইলেন।...চীন কারাগারে কতক কাল কাটিল।... মিশ্রঠাকুর পূর্বাভিমুখে পথ ধরিলেন। লোকনাথ বেণীমাধব সহ দক্ষিণে চলিতে লাগিলেন।'

ব্রহ্মচারী লোকনাথ যখন বেণীমাধব সহ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে

চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আসেন এবং দাবানল দ্বারা বেষ্টিত হন। লোকনাথ তাঁকে এই দাবানল-ব্যূহ ভেদ্ করে উদ্ধার করেছিলেন। এই চন্দ্রনাথ থেকে বেণীমাধব কামরূপ যাত্রা করেন আর লোকনাথ আসেন ঢাকার বারদীতে। এই বারদী-শ্মশানে আশ্রয়-প্রতিষ্ঠার পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেখানে আসেন এবং লোকনাথের নির্দেশে ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী ত্যাগ ক'রে গেণ্ডারিয়াতে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন। বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর সংসারত্যাগী খুল্ল-পিতামহের জন্মান্তর গণ্য ক'রে শ্রদ্ধা করতেন।

গুরু ভগবান বলেছিলেন, তিনি জন্মান্তরে লোকনাথেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে উদ্ধার লাভ করবেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কে সেই গুরু ভগবান, এ সম্পর্কে বিভিন্ন কিম্বদন্তী আছে। লোকনাথের শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র রামকুমার চক্রবর্তীকেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করান। লোকনাথের দেহত্যাগের প্রাক্‌কালে অকস্মাৎ তিনি বারদীতে আসেন এবং গুরুর মুখাগ্নি করার পর কাশীতে গিয়ে যে মণিকর্নিকা ঘাটে গুরু ভগবান দেহত্যাগ করেছিলেন সেখানেই দেহরক্ষা করলেন। রামকুমার চক্রবর্তীই কি সেই গুরুদেব? অপর শিষ্য তারাকান্ত গাঙ্গুলী, নামান্তরে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নিজেকে গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর জন্মান্তর গণ্য করতেন। অপর শিষ্য রজনীকান্ত চক্রবর্তী পূর্বজীবনে ভগবান গাঙ্গুলী ছিলেন, এই বিষয়ে রজনীকান্তের শিষ্য কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত তার যুক্তি প্রকাশ করেছেন। আবার এখনও হতে পারে, ··লোকনাথ তাঁর অপর শিষ্য অভয়াচরণ চক্রবর্তী দ্বারা গুরু ভগবানের জন্মান্তর ভারতব্রহ্মচারীকে দীক্ষা-দান দ্বারা উদ্ধার করার সঙ্গে-সঙ্গেই ১৮৯০ সালে দেহরক্ষা করেছিলেন। এই সবই অনুমান, কোনটাই প্রমাণ নয়। শ্রীলোকনাথের আরও তিন প্রাচীন শিষ্য : অখিলচন্দ্র সেন (নামান্তরে সুরথ ব্রহ্মচারী), যামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় এবং মথুরামোহন চক্রবর্তী।

গুরু অভয়ঃ

শ্রীলোকনাথের শিষ্যদের মধ্যে যিনি ভারতব্রহ্মচারীকে দীক্ষাদানের জন্য চিহ্নিত ছিলেন সেই অভয়ব্রহ্মচারী সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৯৮-১০৪) বলা হয়েছেঃ 'যথাসময়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া অভয়াচরণ ময়মনসিংহ রেজিষ্টারী অফিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন।...অবশেষে একদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও না জানাইয়া স্ত্রীপুত্রাদি রাখিয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করিলেন।...সতের বৎসর পর তিনি পুনরায় ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসেন। —প্রতি শিব-চতুর্দশী উপলক্ষে অভয়াচরণ চন্দ্রশেখর দর্শনে চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইয়া থাকেন।...অভয়াচরণ নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত রেলগাড়ীতে আসিলেন এবং সেখান হইতে অভয়াচরণ পদব্রজে বারদী অভিমুখে রওনা হইলেন। সেই দিনই শিবচতুর্দশী। জীবন্ত শিব দর্শন করার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত আকুলিত।...তখন লোকনাথ স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী বেষ্টনে অভয়াচরণের ডান হাতের মণিবন্ধের উপরভাগে ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন,-যার জন্য ঘুরেছিস, তা তোর হাতে বেঁধে দিলাম, আর ঘুরতে হবে না। ঘুরলে কি হবে রে, কর্মই ব্রহ্ম।...দীক্ষাদান ও দীক্ষা গ্রহণ মণিবন্ধ-বন্ধনে সমাধা হইয়া গেল।" অভয়াচরণ দীক্ষাগ্রহণের পর স্বগ্রাম কিশোরগঞ্জ মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপট্টিতে ফিরে এলেন। ১৮৯০ সালে তিনি শ্রীভারতকে দীক্ষাদানের অব্যবহিত পরেই শ্রীভারতের তৃতীয় গুরু অভয়াচরণ স্বগ্রাম হরিশ্চন্দ্রপট্টিতে দেহরক্ষা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীঅরবিন্দঃ

নবীনচন্দ্রের মহাভারত কাব্যের দ্বিতীয়খণ্ড 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশের বছর ১৮৯৩ সালে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বাণী সিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভাতে বহন ক'রে নিয়ে গেলেন এবং সেই বছরেই শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্যে শিক্ষা সমাপন ক'রে ভারতের বরোদায় চলে আসেন। নবীনচন্দ্রের মহাভারত কাব্যের তৃতীয় তথা শেষ খণ্ড 'প্রভাস' প্রকাশের বছর ১৮৯৬ সালের অক্টোবরে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে দেওঘরে এসে মাতাসহ রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা

ক'রে বরোদায় ফিরে যাবার পর র্যাণ্ড এবং আয়ার্ষ্ট নিহত হল। এই সূত্রে ১৮৯৭ সালে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হবার পর ১৮৯৮ সালের তেসরা জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ দেওঘরে এসে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এতদিনে নতুন ভারত মাথা তুলে দাঁড়ালেও তার সর্বাঙ্গে সর্বস্তরে নতুন রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় নি। হিন্দু নিজেকে অহিন্দুর কাছ থেকে সন্তর্পণে সরিয়ে রাখছে, নিজেরাও কুলগুরুদের দেওয়া মন্ত্র আর ইষ্ট নিয়ে অগণিত গণ্ডীতে বিভক্ত হয়ে আছে, নিজের পূজার জন্যও পুরোহিতের উপর নির্ভর ক'রে থাকে ; বোঝে না যে, দেশের মুক্তি ও বিশ্বের কল্যাণ যাতে হয় না, তাকে ধর্ম বলে না। শ্রীভারতের সমস্ত ভাবনা এই নিয়ে। তিনি পথ খোঁজেন, কিন্তু গুরুদেব অভয়াচরণ তখন দেহরক্ষা করলেন। পথের সন্ধান কার কাছে পাবেন এই চিন্তায় তিনি যখন আকুল তখন সাধন-কালে প্রাপ্ত আদেশ অনুযায়ী তিনি রোজ তামার টাটে চন্দন দিয়ে প্রণব লিখে পাঁচটি তুলসীপাতা দিয়ে অর্চনা করেন এবং মধ্যরাত্রিতে তুলসীতলায় বসে প্রণবধ্বনিতে ভগবানকে আহ্বান করেন। আড়াই বছর এমনি আহ্বানের পর আকাশ উদ্ভাসিত ক'রে এক জ্যোতি নেমে এসে ক্রমশ ছোট হয়ে তামার টাটের প্রণবে এসে মিলে গেল। এরপর থেকেই তিনি প্রথমে ভগবানের স্বপ্নাদেশ, তারপর বাক্যাদেশ এবং অবশেষে কৃষ্ণরূপে তাঁকে দর্শন করলেন। কোথায় তবে সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্ব !

এই সময় তাঁর লক্ষ্মী-জনার্দন নামের শালগ্রাম থেকে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে এই শিলাতেই অন্তর্ধান করতেন। এমনিভাবে সব দেবদেবীর মূর্তিকেই একে-একে এই শিলায় তিনি প্রবেশ করতে দেখলেন। কোথায় তবে ইষ্ট-মূর্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব !

একদিন পেছন থেকে এক বিশাল সাপ এসে ছোট হয়ে এই শিলাতেই ঢুকে গেল। কে ইনি ? ইনি কি জীবের মেরুদণ্ডের মূলের কুলকুণ্ডলিনী কিম্বা বিশ্বের মহাশক্তি অনন্তনাগ অথবা বিশ্বনাথের

শিরোভূষণ ? জীব, বিশ্ব ও বিশ্বনাথ এই তিন তত্ত্বের শক্তিই তো মূলত এক। ব্রহ্ম, জগৎ ও জীব এই ত্রিতত্ত্বকে খৃষ্টানরা যথাক্রমে ফাদার, হোলি ঘোষ্ট ও সান বলেন,—মুসলমানরা যথাক্রমে বয়তল মকমুর, বয়তল মুহরম ও বয়তল মুকদ্দস বলেন।

শ্রীভারতের সংসারে নতুন ঘটনা ঘটল, দুই ভাগনীর বিয়ে। কুসুম গেল কালডোয়ার-বাট্টা শ্বশুরবাড়ীতে। কুমুদিনীর বিয়ে হল শ্রীভারতেরই ভক্ত গোবিন্দের সঙ্গে। ভারতবর্ষের সংসারেও নতুন ঘটনা ঘটল। গুপ্ত 'সঞ্জীবনী সভায়' কিশোর বয়সে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা ক'রে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন পত্রিকা আবার প্রকাশ করলেন। পরের বছর ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের তিন মাস আগে রাজনারায়ণ বসুর প্রতিষ্ঠিত এই সঞ্জীবনী সভা ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে অনুশীলন সমিতি নামে পুনর্গঠিত হল, তার সহ-সভাপতি পদে রইলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন এবং নিজে অনুশীলন সমিতির ট্রাষ্টবডিতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে সহ-সভাপতি পদে বরণ করলেন।

১৯০৬ সালে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে জাতিকে সংহত করার জন্য বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় চলে আসেন। বরোদার গাইকোয়াড় আমেরিকাতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের স্থলাভিষিক্ত স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের দুদিন পরেই স্বামীজী কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে কলকাতার মিনার্ভাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বছরই শ্রীভারত সর্ব সমর্পণের আদেশ পান, তুলে দেন মনোহারী দোকান, জমি-জমা, থালা বাটি সব একে একে বিক্রী হ'তে থাকল। মা চলে যান তাঁর দৌহিত্রী কুসুমের কাছে কালডোয়ার-বাট্টাতে। অপর ভাগনী কুমুদিনী তার স্বামী গোবিন্দের সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামে মাধুকরী

করতে বেরোলেন। দিদি নিত্যময়ী রইলেন শ্রীভারতের কাছে আর শ্রীভারত রইলেন তাঁর শালগ্রাম শিলার কাছে। তারপর ১৯০৭ সালে জানুয়ারী মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে শালগ্রাম শিলা থেকে ভারতমাতা সিংহবাহিনী, আকাশবর্ণা দ্বিভুজা মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে দর্শন দিলেন। শালগ্রাম-বিষ্ণু থেকে ভারতেশ্বরীর এই আবির্ভাব এক অপূর্ব লীলা।

ভারতেশ্বরী ঃ

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থে তিনটি চরিত্রের ইতিকথা আছে। প্রথম চরিত্র মহাকালী, ইনি মধুকৈটভ বধ করলেন, দ্বিতীয় চরিত্র মহালক্ষ্মী, ইনি মহিষাসুর বধ করেন, তৃতীয় চরিত্র মহাসরস্বতী, ইনি শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেন। এই ভারতেশ্বরী তিনটি চরিত্রের সমন্বিত শক্তি। প্রথম চরিত্র মহাকালীর বিবরণে দেখি, বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শায়িত, আর 'হরিনেত্র কৃতালয়া' অর্থাৎ বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা নিদ্রা-ভগবতী মহাকালী উঠে দাঁড়ালেন বিষ্ণুর চোখ-নাক, বাহু-হৃদয় ও বুকের ওপর। তাই এই মহাকালী বিগ্রহ যুগপৎ শাক্ত ও বৈষ্ণব বিগ্রহ। বিষ্ণুপ্রেম, মহাকালী শক্তি। প্রেম ছাড়া শক্তি অন্ধ, আবার শক্তি ছাড়া প্রেম বন্ধ্যা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ-এ এমনি সমন্বয়ের সাধনা চেয়েছিলেন। তাই সন্ন্যাসীরা সেখানে যুগপৎ শাক্ত 'সন্তান' এবং বৈষ্ণব 'গোস্বামী'। তাদের কণ্ঠে যুগপৎ 'বন্দেমাতরম্' এবং 'হরে মুরারে মধু-কৈটভ হারে'।

বিষ্ণুর বুকে কালী, এইটিই প্রামাণ্য মূর্তি। অথচ সর্বত্র দেখি শিবের বুকে কালী মূর্তি, কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তার কোনো সমর্থন নেই। অবশ্য বিষ্ণুর অনন্তশয্যাকে বিষ্ণুর শিব-অবস্থাই বলা চলে। বিশ্বের ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু সর্বশক্তিমান, তাই চতুর্ভুজ। তাঁর সেই শক্তি নিত্যা। বিশ্বের সাগরশায়ী অবস্থা বিষ্ণুর অনন্তনিদ্রা, তাঁর এই অবস্থার শক্তি নিদ্রা-ভগবতী। নিরাকারা বিশ্বাতীতা এই বিশ্বের মধ্যে আকার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এঁকে-বেঁকে আকার এঁকে-এঁকে চলছে নিরাকার'।

জগতের মধ্যে নিবর্তনের পর শুরু হয় বিবর্তন। ইনভল্‌ভড্‌ হবার পর 'ইভলভড্‌' হওয়া। এই বিবর্তন চলে ব্যষ্টি আধারগুলি আশ্রয় ক'রে, আবার বিশ্বাতীতার পরম জাগ্রত, পরম পরিপূর্ণতার দিকেই। তাই জড়-আধারগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ প্রাণ ফুটেছে, প্রাণীরা এসেছে। প্রাণী-আধারগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ মন ফুটেছে, মনুষ্যরা এসেছে। মানুষের মধ্যে আবার বিজ্ঞানময় কোষ উন্মোচিত হয়ে অতিমানসকে দেহগত করবে। এরই নাম 'উল্টা-সাধন'। এ যেন রথ-যাত্রা ও উল্‌টারথের উৎসব। জগন্নাথ রথযাত্রায় 'মাসি বাড়ী'তে এসে উল্টোরথে ঘরে ফিরছেন। কে এই মহাশক্তি? ইনি বিশ্বের অতীত নিত্যশক্তি, আবার অনিত্য জগতেও মূর্তিমতী এবং সেই সঙ্গে এই সমষ্টি-জগতের মধ্যে উদ্ভূত সব ব্যষ্টি-ব্যক্তিও তিনি। ইনি যুগপৎ বিশ্বাতীতা, সমষ্টি-গতা ও ব্যষ্টিগতা;—ট্র্যান্সেণ্ডেণ্টাল, ইউনিভার্সাল ও ইন্‌ডিভিডুয়েল। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভাষায় 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্‌'। ইনি যুগপৎ নিত্য, জগন্মূর্তি এবং সর্বমিদং।

উল্টো-রথে ঘরে ফেরার এই গতিতে প্রেরণা ও পিছুটান দুইই আছে। জড় শুধু জড় হয়েই থাকতে চায়, এইটি তার পিছুটান; আবার তার কিছু অংশ প্রাণে উজিয়ে উঠতে চায়, এইটি তার প্রেরণা। প্রাণ আবার প্রাণীই থাকতে চায়, কিন্তু একটা অংশ মনে উজিয়ে যেতে চায়। মন আবার মনুষ্য আধার নিয়েই খুশি থাকে, কিন্তু একটা অংশ অতি মানসে উজিয়ে যাবার জন্য আকুল। এই পিছুটান জড়ের ক্ষেত্রে পিশাচ, প্রাণের ক্ষেত্রে রাক্ষস আর মনের ক্ষেত্রে অসুর,—এদেরও সার্থকতা আছে, এরা নিজ-নিজ ক্ষেত্রকে পুষ্ট করে, সংরক্ষণ করে, কিন্তু তার আতিশয্যের দরুণ তা আবার উদ্বর্তনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রের ইতিকথায় উদ্বর্তনের শক্তিকে ব্রহ্মা এবং প্রতিবন্ধক শক্তিকে মধু-কৈটভ বলা হয়েছে। এই জগৎ-শায়ী বিষ্ণুর নাভিতে সৃজনীশক্তির ব্রহ্মা

উদ্বর্তনে সাড়া দেন, আর সেই উদ্বর্তনের আহ্বানে বধির থাকতে চায় মধু-কৈটভ, তাই তারা বিষ্ণুর কর্ণমল।

শ্রীভারতের ভারতেশ্বরী দর্শনের পরের বছর ১৯০৮ সালে শ্রীঅরবিন্দ কিশোরগঞ্জে ময়মনসিংহ জেলা সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ দিয়ে ফিরে যাবার পর ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে আর সেই সঙ্গে কলকাতার ঠিকানা থেকে শ্রীঅরবিন্দ এবং মুরারিপুকুরে তাঁর পৈত্রিক বাগানবাড়ী থেকে অনেক বিপ্লবী ধরা পড়লেন; অনেক বিপ্লবী পালিয়ে চলে গেলেন আমেরিকার স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ওলিবুল তথা ধীরামাতার আশ্রয়ে। আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দের বাসুদেব-দর্শন হল।

১৯০৯ সালের জুন মাসে শ্রীভারত কিশোরগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানালেন, ভগবতীর আদেশে তিনি তাঁর ভাগনী কুমুদিনীর দ্বিতীয় পুত্র ছয়মাসের শিশু অধীরকে আগামী পূর্ণিমায় মায়ের কাছে বলি দেবেন, ফলে শ্রীভারত এক সপ্তাহ কারারুদ্ধ থাকলেন, জেল থেকে বেরিয়েই তিনি জানলেন মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করার নামই বলি। তিনি চার মাস পর অক্টোবরের অমাবস্যায় মায়ের প্রসাদে অধীরের অন্নপ্রাশন দিলেন। এমনিভাবে অধীরের বলি হল।

আলিপুর জেলে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ও সত্যেন বসুর ফাঁসী হয়ে যাবার পর শ্রীঅরবিন্দ কারামুক্ত হলেন এবং ভগবানের নির্দেশে চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের আশ্রমে কিছুকাল অজ্ঞাতবাস ক'রে পণ্ডিচেরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই সময় অধীরের বাপ মা গোবিন্দ ও কুমুদিনী গ্রাম থেকে গ্রামে মাধুকরী করতে করতে ১৯১০ সালে লক্ষ্মীয়াগ্রামে পৌঁছালেন এবং উকীল গুরুচরণ দাসের পিতৃ-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত পাগলনাথ দেবালয়ে বাস করতে থাকলেন। গুরুচরণ দাসের বালবিধবা বোন অমৃতময়ীর প্রার্থনায় এই বছরেই গোবিন্দ এসে শ্রীভারতকে ঐ গ্রামে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে এই

গ্রামের ঘরে-ঘরে শ্রীভারতের দীক্ষাদান শুরু হয়ে গেল, গ্রামে উৎস লেগে গেল। জঙ্গলবাড়ীর তালুকদার যোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুনে জয়কালী যাত্রা-দল এলো মহেশচন্দ্র দাসের বাড়ী। যাত্রা-দলে প্রধান গায়ক রাধানাথ সরকারও দীক্ষা নিলেন, বালক অভিনেত্ সুরেন্দ্র দীক্ষা নিয়ে আশ্রমেই থেকে গেল, সন্ন্যাসান্তে যিনি পরে হয়েছিলেন শান্তিদানন্দ। লক্ষ্মীয়ার এই পাগলনাথ দেবালয় এমনি ভাবে সিদ্ধাশ্রমে পরিণত হল।

এবার স্বহস্তে সেবাপূজার অধিকার দেবার জন্য তিনি ১৯১০ সালের শেষদিকে নগুয়া গ্রামে আউল সমাজের মাথা সনাতন সাধুর বাড়ীতে রক্ষাকালী মূর্তি আর ১৯১১ সালের প্রথম দিকে জঙ্গলবাড়ী যোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুনের বাড়ীতে জয়কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ১৯১২ সালের মার্চে (২৬ ফাল্গুন, ১৩১৮) লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রম থেকে নবদ্বীপ যাত্রা করলেন। সঙ্গে চললেন উঠে-যাওয়া জয়কালী যাত্রা-দলের প্রধান গায়ক রাধানাথ সরকার আর তার বালক অভিনেতা সুরেন্দ্র এবং লক্ষ্মীয়া গ্রামের শিষ্য সূর্যকান্ত দাস। নবদ্বীপে শ্রীভারত আড়াই দিন 'হত্যা' দিয়ে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সম্মতি লাভ করলেন।

ষড়ভুজ শ্রীচৈতন্য ঃ

শ্রীভারত পিতৃবিয়োগের পরই শিবকান্ত তর্কালঙ্কারের কাছে 'রাম' মন্ত্রে এবং গোপালচন্দ্র দত্ত গোস্বামীর কাছে 'কৃষ্ণ' মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে শ্রীচৈতন্য একাধারে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিরূপে ষড়ভুজ হয়ে নবদ্বীপে একবার নিত্যানন্দের সম্মুখে, পুরীতে আরেকবার সার্বভৌমের সম্মুখে আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে তিনি একবার মাত্র সার্বভৌমকে সেই মূর্তি দেখিয়েছেন। মুরারি গুপ্ত-র কড়চায় আবার বলা হয়েছে, সেই মূর্তি সার্বভৌমকে নয়, রাজা প্রতাপরুদ্রকে দেখানো হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য আবার ভক্ত-লীলায় যুগপৎ রাম ও কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতেন। দাক্ষিণাত্য পর্যটন কালে তাঁর নামকীর্তনে তাই দেখি: 'রাম রাঘব রক্ষ মাম্, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্'। কৃষ্ণ-ভক্তদের কীর্তনে 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ' শুনলে শ্রীচৈতন্য যত খুশি হতেন, রাম-ভক্তদের রাম-কীর্তনেও তিনি ততখানিই খুশি হতেন। রাম-ভক্ত মুরারি গুপ্তের মুখে 'রামাষ্টক' শুনে মহাপ্রভু তাঁর মাথায় চরণ স্থাপন করে বলেছিলেন: 'শুন গুপ্ত, এই তুমি আমার প্রসাদে। জন্ম জন্ম রামদাস হও নির্বিরোধে॥ ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়। সে হো রাম-পদাম্বুজ পাইবে নিশ্চয়॥' (চৈতন্য ভাগবত ৩।৪)। রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের মৃত্যু-সংবাদে মহাপ্রভু তাঁর প্রশংসা করে শ্রীসনাতনকে বলেন: 'তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি। ভাল ছিল, রঘুনাথের দৃঢ় তার ভক্তি॥' (চৈতন্য-চরিতামৃত ৩।৪)। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত তারক-ব্রহ্ম নামেও যুগপৎ রাম ও কৃষ্ণ আছেন, তাতে সম্বোধন করা হচ্ছে: হে হরি তথা কৃষ্ণ, হে হরি তথা রাম। কিম্বা এভাবেও ব্যাখ্যা করা চলে: হর বা শিবের মধ্যে কৃষ্ণ, হর বা শিবের মধ্যে রাম। তবু মতুয়ারী বুদ্ধির সাম্প্রদায়িকরা রাম শব্দেও কৃষ্ণ-প্রতিপাদন করতে ব্যস্ত!

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সম্মতি লাভ করার পর শ্রীভারত গয়াযাত্রা করেন। এই গয়া ধামেই শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গয়াতে বারোদিন অবস্থান কালে শ্রীভারত তাঁর পরলোকগত অপুত্রক দ্বিতীয় গুরু শ্রীগোপালচন্দ্র দত্তের পিণ্ড দান করেন। এই গোপাল গোঁসাই জয়দেবের মন্ত্রধারামতে সস্ত্রীক সাধনা করতেন।

জয়দেবের উত্তরাধিকার:

জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের আখ্যান প্রকাশ করেন নি। তাঁর কৃষ্ণ এই বিশ্ব-বৃন্দাবনের অন্তর্যামী ঈশ্বর।

বিবর্তনের দোল-পীড়ি ধাপে-ধাপে উঠছে। জগতের অন্তর্যামী কৃষ্ণের ফুটে ওঠার শেষ নেই, তাই তিনি চিরশিশু বালগোপাল, নওয়ল-কিশোর। সেই চিরতরুণ অন্তর্যামী নানা রূপ ধারণ করতে করতে, নানা রূপ সম্ভোগ করতে-করতে শেষ বিবর্তনের দিকে অভিসার করছেন। এই বিশ্ব-বৃন্দাবনের অচেতন মাঠে-গোঠে অবচেতন নিকুঞ্জবন ও গবাদি পশুরা বিবর্তিত হয়েছে, সচেতন মানুষ রাখালেরাও এসেছে, বোধি-চেতনার নন্দ-প্রমুখ গোপী-গোপিনীরাও জেগেছে, কিন্তু জগতের অন্তর্যামী কৃষ্ণ এত ধাপ পেরিয়ে এলেও সৎ-চিৎ-আনন্দময়ী রাধিকাকে এখনো পান নি। তাই তার শৈশব-দশা আজো ঘোচে নি। তাঁকে যদি ঘরে ফিরতে হয়, সেই পূর্ণ চৈতন্যের ব্রহ্মসত্তায় আবার যদি উত্তীর্ণ হতে হয়, তবে সেই উৎসের শক্তি রাধার হাত ধরেই উঠতে হবে। প্রবুদ্ধ মানুষ নন্দ তাই অন্তর্যামী কৃষ্ণকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য রাধাকেই অনুরোধ জানালেন: 'রাধে গৃহং প্রাপয়।' জগতের অন্তর্যামী জগন্নাথ কৃষ্ণের আত্ম-উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক বিবর্তন ঘটে। এমনভাবে জলচর মীনের পর সৃষ্টিতে উভচর কূর্ম, তারপর কর্দমাক্ত ভূমির বরাহ, তারপর নৃসিংহ বনমানুষ, তারপর অপূর্ণ মানুষ বামন, তারপর পাথরের কুঠারধারী ভৃগুরাম, তীর-ধনুধারী শ্রীরাম, কৃষিযুগের বলরাম, বিশ্ব-মৈত্রীর বুদ্ধ। সবার শেষে অখণ্ড বিশ্ব প্রতিষ্ঠার কল্কির অভ্যুদয় হবে, যখন রাধা এসে এই জগতের অন্তর্যামীকে পরম পরিপূর্ণতার মধ্যে তুলে নেবেন। বসন্তের রাসলীলা হল সেই লীলা যেখানে জগতের প্রতিটি সত্তা তার অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে আলিঙ্গন করছে, তার বুকের মাণিক, মনের মানুষকে চুম্বনে-চুম্বনে উদ্দীপিত করছে। একা কৃষ্ণই প্রত্যেকের বক্ষ-বিহারী ভিন্ন-ভিন্ন কৃষ্ণ।

আমাদের অন্তর্যামীও পূর্ণতা চান, আর পূর্ণতার আরেক নাম রাধা। কিন্তু রাধা যে মান ক'রে আছেন। আমাদের অন্তর্যামী কৃষ্ণ মানব-দেহ ধারণ করেও কুব্জা-প্রাণের চিহ্নগুলি মুছে ফেলতে

পারছেন না, নীচের থাকের প্রাণী লক্ষণ এখনো তার সর্বাঙ্গে। রাধিকার মুখেও তাইঃ 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু ঐখানে থাকো।' আমাদের অন্তর্যামী কৃষ্ণকে নিষ্কাম প্রেমে উজিয়ে উঠতেই হবে, নইলে সে তার পূর্ণতার আলিঙ্গন পাবে কী ক'রে? নিজের শক্তিতে যদি উঠতে না পারে, চাইতে হবে সেই পূর্ণতারই করুণা: 'দেহি পদ পল্লবম্ উদারম্'।

শ্রীচৈতন্যও জয়দেবের এই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য গ্রহণ করেছিলেন। তারকব্রহ্ম নামে ইতিহাসের পুরুষোত্তম রাম ও কৃষ্ণের কীর্তন করা হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত রাধা-ভাবকেই পুরুষার্থরূপে ঘোষণা করেছেন। রথযাত্রায় যদি বিশ্বে ঈশ্বরের অবতরণ বা ধারাপাত হয়, তবে বিবর্তনের উল্টোরথে আমাদের প্রার্থিত পূর্ণতা অর্থাৎ ধারার বিপরীত রাধা। তাই নতুন জপমন্ত্র হল: 'জয় রাধে'। সব সংকল্পের নিয়ামক 'রাধারাণীর ইচ্ছা'।

উপনিষদ ব্রহ্মকে বলেঃ রস। 'রসো বৈ সঃ'। শ্রীচৈতন্য বললেনঃ সেই রস আদি রস। তাঁর সাধ হল নিজেকে জানার। তাই তিনি তাঁর পঞ্চমুখে নিজেকে আস্বাদ করছেন। তাঁর এক মুখ রাধা, যে-মুখে তিনি কান্তা-প্রেমের স্বাদ; আরেক মুখ যশোদা, যে মুখে তিনি বাৎসল্য; অন্য মুখ তাঁর সুদাম, যে মুখে তিনি সখ্য প্রেম; আরেক মুখ অক্রূর, যে-মুখে তিনি প্রভু-ভক্তি; অন্য মুখ তাঁর বিদুর, যে মুখে তিনি শান্ত ভক্তি। তাঁরা একযোগে পঞ্চানন আদিরসের পঞ্চমুখ।

এই পঞ্চমুখ্যা আদিরসেরই বিকাশ, বাকী সাতটি রস,—যা দিয়ে জড় জগৎ গঠিত। এই জগতের ঋতুবৈচিত্র্যে বীর, রৌদ্র, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, বিস্ময় ও হাস্যরসের সমাহার।

শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টিতে এই যদি ঈশ্বর ও জগৎ—জীব তবে কি? শ্রীচৈতন্য বলেন, জীব সেই আদি রসেরই কণা,—প্রাণীর স্তরে সে 'সাধারণী কুব্জা',—মননশীল মানুষের স্তরে সে 'সমঞ্জসা রুক্মিণী',—

প্রজ্ঞা বা বোধির স্তরে সে 'সমর্থা গোপী'। কিন্তু ঈশ্বরের অঙ্গাঙ্গীস্তরে সে আর জীব কোটির নয়, সে তখন ঈশ্বরের অঙ্গাঙ্গী রাধিকা।

গয়াতে বারোদিন বাস ক'রে শ্রীভারত সিদ্ধাশ্রমে ফিরে এলেন। ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। ব্রহ্মপুত্রের পূব পাড়ের অংশের দক্ষিণাঞ্চল কিশোরগঞ্জ মহকুমা আর উত্তরাঞ্চল নেত্রকোণা মহকুমা। এই নেত্রকোণার উত্তর প্রান্তবর্ত্তী গারো পাহাড়টি আসামের দেয়াল হয়ে আছে। সিদ্ধাশ্রমবাসী সুরেন্দ্রর বাড়ীও নেত্রকোণা মহকুমার কেন্দুয়া থানার বৈরাটীতে। শ্রীভারত এবার নেত্রকোণাতেও তাঁর লীলাস্থান প্রসারিত করলেন। বৈরাটী গ্রামের অনেককে সপরিবারে দীক্ষা দেবার পর এ গ্রামের কায়স্থ তালুকদার পত্রনবীশদের পূর্ব-পুরুষদের শ্মশানে 'হরগৌরী' বটগাছের তলায় গৌরী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল। সিদ্ধাশ্রমের পর এইটি হল দ্বিতীয় আশ্রম। এই আশ্রমে দিদি নিত্যময়ী, তাঁর কন্যা জামাতা কুমুদিনী ও গোবিন্দ, তাদের তিন ছেলে সুধীর, অধীর ও গোপাল এবং তিন মেয়ে সুমতি, বনবাসী ও নির্মলাকে রেখে শ্রীভারত ফিরে এলেন সিদ্ধাশ্রমে।

এই সময় বৈরাটীর সরলানন্দ, সুশীলানন্দ এবং পাতুয়াইয়ের অবলানন্দ সংসার ত্যাগ করে শ্রীভারতের পরিকর হলেন। তাঁরা কখনো নওয়ার রক্ষাকালী মন্দিরে, কখনো জঙ্গলবাড়ীর জয়কালী মন্দিরে, কখনো লক্ষ্মীয়ার সিদ্ধাশ্রমে প্রায় বৎসরকাল বাস করে আবার বৈরাটী গৌরী আশ্রমে ফিরে গেলেন এবং কাছাকাছি আমতলা, সাজিউরা, কান্দীউরা, আদমপুর প্রভৃতি গ্রামেও দর্শন দিলেন। সেদিনের বালক সুরেন্দ্র এখন সন্ন্যাসী শান্তিদানন্দ।

রামেশ্বরের পথে :

১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে বৈরাটী গৌরী আশ্রম থেকে শান্তিদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীভারত চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ ধামে গেলেন। সেখান থেকে নবদ্বীপ হয়ে কালীঘাটে এলেন। এই সময় অন্নদা

ঠাকুর ইডেন গার্ডেনের ঝিলে আদ্যা মা-র মূর্তি লাভ করেন। সেইদিন ছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দের বাসন্তী নবমী। শ্রীভারত রথযাত্রায় পুরী যান এবং সেখান থেকে রামেশ্বর যাত্রা করেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন পণ্ডিচেরীতে ইঙ্গ-ফরাসী দোভাষী পত্রিকা 'আর্য' সম্পাদনা শুরু করেছেন। তাঁর সহযোগী সম্পাদক ফ্রান্সের রিশার দম্পতি। অধ্যাপক পল রিশার কিছুকাল আগে একা ভারতে এসে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষার অধ্যাপনা করছিলেন, সেখান থেকে পণ্ডিচেরী এসে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করার পর তিনি তাঁর স্ত্রী মীরা রিশারকে জানালেন, তুমি যার স্বপ্ন দেখছিলে, মনে হয়, আমি তাঁর দর্শন পেয়েছি। মীরা রিশার এসে দেখলেন, ইনিই তিনি। শ্রীভারত বেশি পথ পদব্রজেই পর্যটন করেছেন, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে রান্না করা ভাত তরকারী ভিক্ষা করে ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদ পেয়েছেন। মুসলমান গ্রামের এমনি প্রসাদে মুরগির মাংসের টুকরাও পেয়েছেন আর প্রসাদ বলেই গ্রহণ করেছেন। ১৯১৪ সালের শেষ দিকে তিনি ফিরে আসেন বৈরাটীর গৌরী আশ্রমে। ওদিকে বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাওয়ায় রিশার দম্পতি প্রথমে ফ্রান্সে ফিরে যান এবং কিছু দিনের মধ্যেই জাপানে গিয়ে অবস্থান করতে থাকেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাঁচটি বছর শ্রীভারত বৈরাটির গৌরী আশ্রম থেকে কয়েকবার লক্ষ্মীয়ার সিদ্ধাশ্রমে গেলেন। ১৯১৬ সালে সিদ্ধাশ্রমে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ধরের বাড়ীতে শারদীয়া দুর্গাপূজা সাঙ্গ করে ফিরলেন। ১৯১৮ সালের শেষদিকে আবার সিদ্ধাশ্রমে গেলেন; সেবার কাঁঠালতলীর উপেন্দ্রকিশোর রায় মুমুরদিয়ার কৈলাসচন্দ্র দত্ত-রায়ের সহধর্মিণীর কুলবিগ্রহ শালগ্রাম ও বৃহদাকার শিবলিঙ্গ এই সিদ্ধাশ্রমে নিয়ে এলে ১৯১৯ সালের সূচনাকালে শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে সিদ্ধাশ্রমে এই বিগ্রহ দুটি প্রতিষ্ঠা করে ফিরে এলেন। ১৯১৯ সালের অক্টোবরে ঘূর্ণীঝড়ের পর দুর্ভিক্ষের সূচনা হলে বৈরাটী গৌরী আশ্রমে আকাশবর্ণা, দ্বিভুজা, সিংহবাহিনী ভারতমাতার মৃণ্ময় মূর্তি সুন্দাইলের

কালাচাঁদ আচার্যকে দিয়ে গড়িয়ে দীপান্বিতাতে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং আশ্রমের সংস্কার কার্য করালেন। শ্রীভারত জানালেন, রুস্তু নামে এক মুসলমান পীর অদৃশ্য থেকে এই আশ্রমের সংস্কার করিয়েছেন। এই সময় অন্নদা ঠাকুর কলকাতার উত্তর শহরতলীর আড়িয়াদহতে তাঁর প্রাপ্ত আদ্যাদেবীর সিদ্ধপীঠ স্থাপন. করেন ১৩২৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংক্রান্তিতে।

শ্রীভারত ভারতেশ্বরী মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর ১৯২০ সালের সূচনাকালে লক্ষ্মীয়ার সিদ্ধাশ্রমে গেলেন এবং ৮ থেকে ১২ বছরের জনা পঁচিশেক বালক নিয়ে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় খুললেন। তারপর শিবচতুর্দশীর উৎসবান্তে বৈরাটী গৌরী-আশ্রমে ফেরার আগে কাঁঠালতলীতে উপেন্দ্রকিশোর রায়ের বাড়ীতে কয়েকমাস বাস করেন। কাঁঠালতলীতে থাকাকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য গাচিহাটার নিদান সাধু (হরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত রায়), ময়ূরমুকুটবাবার শিষ্য নিশিভূষণ দত্তরায়, দয়ানন্দ স্বামীর শিষ্য কাঁঠালতলীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত ছয়নার দেবেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, যোগজীবন গোস্বামীর শিষ্য বিধুভূষণ দত্তরায়, ব্রাহ্মভাবাপন্ন মুমুরদিয়ার প্রাণদাশংকর দত্তরায় সবাই শ্রীভারতের সঙ্গ করতে এলেন ১৯২০ সালের শেষের দিকে গৌরী আশ্রমে ফিরে এসে দীপান্বিতায় ভারতেশ্বরীর দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব সম্পাদন করালেন। ওদিকে রিশার দম্পতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানে যখন অবস্থান করছিলেন তখন ঐ পথ দিয়েই বৈদেশিক অস্ত্রসাহায্য বালেশ্বরে বাঘা যতীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, কিন্তু পৌঁছাতে পারে নি। চন্দননগরের শ্রীমতিলাল রায়ের দীক্ষিত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সিপাহী বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে তিনিও পি-এন্-ঠাকুর ছদ্মনাম নিয়ে জাপানে পালিয়ে গেলেন। ঐ জাহাজেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপরিজন জাপান-যাত্রার কথা ছিল, কিন্তু বোম্বাই পর্যন্ত এসেও ভাগ্নের অসুস্থতার জন্য যাত্রা স্থগিত রেখে ফিরে আসেন, আর ঐ জাহাজেই রাসবিহারী চলে যান ঠাকুরবাড়ীর কেউ হিসাবে। ২০ সালে মীরা

রিশার পণ্ডিচেরী ফিরে আসেন। ইনিই হন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম-জননী।

১৯২৭ সালের সূচনায় শ্রীভারতের নির্দেশে বৈরাটী গৌরী আশ্রম থেকে শান্তিদানন্দ (সুরেন্দ্র) ও সরলানন্দ আর লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রম থেকে মোক্ষদানন্দ (মনোমোহন) ধীরানন্দ, শঙ্করানন্দ, বিরজানন্দ, (রজনী) যোগানন্দ (যতীন্দ্র) প্রভৃতি সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ভারত-পর্যটনে বেরোলেন। সুশীলানন্দ ও কুমুদানন্দ (কেদার সরকার) সিদ্ধাশ্রমের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পেয়ে কাজ শুরু করলেন, আর বৈরাটী গৌরী আশ্রমে অসহযোগ আন্দোলনের চৌদ্দজন স্বেচ্ছাসেবক আশ্রয় নিয়ে গ্রামের মতিরাম নাথের কাছে তাঁত চালানো শিখতে লাগল।

এই ১৯২১ সালেই শ্রীভারত কিছুকাল কালিয়ারা গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে, কিছুকাল নেত্রকোণার শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দেবের বাড়ীতে থেকে নেত্রকোণা সহরে বয়ন বিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় সংগঠন করেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মগরা নদীর ধারে মালনী গ্রামে চিত্রমোহন সাহারায় তাঁর পতিত বাড়িটি এই বিদ্যালয়ের জন্য দান করলেন এবং এখানেই প্রতিষ্ঠিত হল চিত্রধাম আশ্রম। কিছুকালের মধ্যেই হাসামপুরে নকুলচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে অজপানন্দকে (বুধপাশার অশ্বিনীকুমার ধর আয়ুর্বেদশাস্ত্রী) অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করলেন। এই বছরই ভারত সমাজ গঠন প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তখন গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন সম্পর্কে উদ্যোগ শুরু করলেন।

পত্রাবলী :

১৯২১ সালের ডিসেম্বরে (২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩২৮) শ্রীভারত শান্তিদানন্দকে এক চিঠিতে লেখেন: 'তারপর আমাকে উপলক্ষ

করিয়া নানা দেবতার আবির্ভাব, নানা ক্ষেত্রপীঠ হইতে শক্তি সহযোগে এবং পূর্ব পূর্ব বামন, রামাদি অবতার ও বুদ্ধ, শঙ্করাদি এমন কি পূর্ববঙ্গের লোকনাথ, রামকৃষ্ণাদি মহাপুরুষগণকে নিয়া মা জগতের মঙ্গল বিধানের জন্য ব্রতী হইলেন এবং ইউরোপের যুদ্ধ সমাধা করিয়া এই পুণ্যক্ষেত্র ভারত-ভূমে আবির্ভূতা হইয়া বদরিকাশ্রমের কর্তাকে সহায় করিয়া আজকাল যে খেলা আরম্ভ করিয়াছেন তাহা ত বর্তমানেই'।

ঈশ্বর ও জীবের দ্বৈত ভেদ এবং অদ্বৈত অভেদ, এই দুই-ই শ্রীচৈতন্যের দর্শনে যুগপৎ সিদ্ধ, তাই তাঁর দর্শনের নাম 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ'। ১৯২৩ সালের প্রথম ভাগে (৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) এই মর্মে শ্রীভারত সিদ্ধাশ্রমের ব্রতাচারীদের উদ্দেশ্যে লেখেন: 'এই যে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য নিয়া বিচার,---আমি সেই আর আমি তাঁহার,---ইহাতে সাধক অহং-তত্ত্বে থাকিয়া বুঝিবে যে, আমি অহং-তত্ত্ব না, আমি সেই পরতত্ত্ব অথবা আমি সেই পরতত্ত্বের। ইহাতে উভয় বাক্যেরই এক সিদ্ধান্ত লক্ষিত হয়। কারণ আমি তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া যেমন তাঁহার বলিতেছি, তদ্রূপ পৃথকত্ব হেতুই আমি সেই বলিতেছি।···সাধক অহংতত্ত্বে থাকিয়া আমি সেই বা আমি তাঁহার, যে যে-ভাবেই ভাবুক না কেন, ঐকান্তিক চিত্তে এক জ্ঞানে ভাবিতে-ভাবিতে যে অদ্বৈতাবস্থা আসে, তাহা অচিন্ত্য, অবিচার্য।' মাস দুই পর (১৩ শ্রাবণ, ১৩২৯) শ্রীভারত শরচ্চন্দ্র ব্রতাচারীকে লেখেন: 'এই তত্ত্ব দীক্ষার সময় ব্রহ্মগায়ত্রী ও অজপা গায়ত্রী দ্বারা সাধারণভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি। ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ এই----ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলিয়া জানি, পরতত্ত্ব জানিয়া ধ্যান করি, সেই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব আমাতে হউক বা প্রেরণ কর, অথবা প্রেরণ করেন। এই তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য অজপার সন্ধান লইয়া আত্মশক্তির আশ্রয়ে উপাসনা প্রভাবে উদ্গত হও। এই আত্মশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে

চতুর্দলে থাকিয়া হং-সঃ জপ করিতেছেন, ইহাকে অজপা গায়ত্রী বলে। শ্বাস নির্গমকালে হং-কার আর প্রবেশকালে সঃ-কার জপ হইতেছে। হং-কার পুরুষ, সঃ-কার প্রকৃতি। এই পুরুষ-প্রকৃতির অনন্ত নাম। উপাসক-ভেদে কেহ রাধা কৃষ্ণ, কেহ শিব-শক্তি বলিয়া থাকেন। শ্বাস প্রবেশে দেহ জীবিত বা শক্তিসম্পন্ন হয়, তাই সঃ-কার শক্তিরূপিণী। শ্বাস-নির্গমে পুনঃ প্রবেশ না করিলে দেহ নির্গুণ ও মৃত। পুরুষ নির্গুণ বলিয়া হং-কার পুরুষ। এই সঃ-কার রূপিণী শক্তিকে জপ, ধ্যান ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা আয়ত্ত করিলে সোঽহং হয়।' এই চিঠির পরের দিনই তিনি এক ভক্তকে লিখলেন: 'এককে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া কেহ পঞ্চকোষ বলে। যথা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় কোষ অন্নের দ্বারা পরিবর্ধিত হয় তাহাই অন্নময় কোষ। প্রাণের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সাহায্যে আছ বলিয়া অর্থাৎ যতক্ষণ থাক অর্থাৎ প্রাণবায়ুই প্রাণময় কোষ। প্রাণবায়ুর অতীত অর্থাৎ প্রাণবায়ু হইতে পৃথক হইয়া মনের আশ্রয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় প্রাণবায়ু থাকিলেও তুমি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পার, ইহাই মনোময় কোষ। এই অহংতত্ত্ব অতিক্রম করিবার সময় জাগ্রতাবস্থায় এই নিদ্রার মত ভুল হয় বা ভ্রম অবস্থার পর জ্ঞান হয় অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাবস্থা হয়। পূর্বতোবস্থায় আমি জ্ঞান বিরহিত মহাভাব হয়, ইহাকেই কারণ-দেহের অন্তর্গত জ্ঞানময় কোষ বা চিন্ময়াবস্থা বলে, অর্থাৎ খাঁটি চৈতন্যাবস্থা। চৈতন্যদেব এই অবস্থা জানিয়া জগৎকে বা সকলকে বুঝাইয়াছেন বলিয়া ভারতী গোঁসাই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম রাখিয়াছিলেন। এই জ্ঞানময় কোষের পর বিজ্ঞানময় কোষ—এই তোমার মুক্তির সোপান।' এই চিঠির মাস তিনেকের মধ্যে শ্রীভারত কাশ্মীরে পর্যটনরত মোক্ষদানন্দকে লেখেন (২৮ কার্তিক, ১৩২৯): 'এই সোঽহং তত্ত্ব নানা সম্প্রদায় ও নানা মতাবলম্বীগণ নানা ভাষায়

ব্যক্ত করিয়াছেন, যেমন ব্রাহ্মণ্য মতে ভূতশুদ্ধি ও বৈষ্ণবাদি খণ্ড মতাবলম্বীদের শিক্ষামন্ত্র হং-সঃ। এই মন্ত্রের তাৎপর্য সোঽহং অর্থাৎ আমি সেই। মুসলমানী মতে আয়নাল হক ইত্যাদি।'

পরের মাসে (১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) শ্রীভারত শচীন্দ্রচন্দ্র রায়কে লেখেন: 'বিদেহ-মুক্তি কি জান? স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিনদেহের অতীত (আজ্ঞাচক্রে) থাকিয়া জগদ্‌ব্রহ্মের লীলা দর্শন করা। এই অবস্থায় থাকিলে দেখিতে পাইবে, কেহ কিছু করে না। প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্য হেতু সৃষ্টি লয়াদি কার্য সুসম্পন্ন হইতেছে। তাই দেহ থাকিয়াও দেহাতীত অবস্থা।' এক সপ্তাহ পর ২৫ অগ্রহায়ণ সিদ্ধাশ্রমে প্রেরিত চিঠিতে লিখলেন: 'ক্রমে সর্বদা সর্বাবস্থায় সর্ব পদার্থে দ্রষ্টা থাকা অভ্যাস করিতে পারিলেই বুঝিতে পারিবে যে তুমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ভক্ত ভগবান, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ খেলার নিমিত্ত মাত্র। ইহাই অদ্বৈত জ্ঞান বা পরাভক্তি।' এই চিঠির মাস দেড়েক পর ৪ মাঘ শরৎচন্দ্র ব্রতাচারীকে লেখেন: 'আরও স্পষ্টভাবে লিখি—এ যে অজপা, শ্বাস বাহির হওয়ার সময় হং এবং প্রবেশ করিবার সময় সঃ উচ্চারণ হয়। সঃ-কার উচ্চারণ করিলেই জীব জীবিত থাকে বা শক্তি-সম্পন্ন হয়। অতএব ঋষিগণ,—সঃ কারে চ ভবেৎ শক্তি,—বলেন। আর হং-কার বহির্বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই হং যদি আর সঃ না হয় তখনই দেহ অচল হইয়া পড়ে অর্থাৎ মরে—দেহ নির্গুণ হয়। যদি সাধন প্রভাবে হং সঃ সোঽহং হয়, তবে নির্গুণ নির্বিকার হইয়া মুক্তিলাভের অধিকারী হয়, ইহাই সাধন পদ্ধতি।' মাস নয়েক পর (২ কার্তিক, ১৩৩০) শঙ্করচন্দ্র সরকারকে এক চিঠিতে লিখলেন: 'তুমিই লিখিয়াছ ব্রহ্মের বিকাশই জগৎ। আবার প্রশ্ন করিয়াছ, নির্বিকার ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইলেন কেন? ইহাতে বুঝা যায় যে নির্বিকার ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত হইলেন কেন? জগৎটা ব্রহ্মের বিকার নয়, বিকাশ অর্থাৎ লীলা। যাহা

স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিপরীত, তাহাই বিকার। জগৎ শব্দে গতিশীল, সৃষ্টিলয়াদি ক্রিয়াশীল অর্থাৎ অবস্থান্তর দেখা যায় বলিয়া জগৎ, ইহা ব্রহ্মের স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতির প্রকাশ।' এই চিঠির মাস দুই পর (২ পৌষ, ১৩৩০) ইন্দুভূষণ দত্তবায়কে লিখলেন: 'শুধু আমাব জন্যই নিদ্রারূপে মা, ক্ষুধারূপে মা, তৃষ্ণারূপে মা, ভ্রান্তিরূপে মা, পুষ্টিরূপে মা, দয়ারূপে মা, ক্ষমারূপে মা। আবার আকাশরূপে মা, বাতাসরূপে মা, তেজোরূপে মা. জলরূপে মা। এমন কি কেবল আমার জন্যই মা আমার একেবারে মাটি হয়ে গেছে। এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহাও আমার জন্য। জগৎটা আমার খেলা। যেমন শিশু থাকিলেই লোলাকাঠি, বাঁশী ইত্যাদি খেলনার দরকার হয়। আমি আমি আছি তাই জগৎটা দরকার। আমার মা আছেন তাই আমি আছি। আমার মা না থাকিলে আর আমি থাকিতাম না। আমাকে লইয়া মা বাবার নিকট গেলে, আমার আবেগে (আনন্দাবেগে) মায়ের আর অস্তিত্ব থাকে না, আমারও অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থাকে তোমরা নির্বিকল্প বা জড় সমাধি বলিয়া থাক।' এই চিঠির মাস দুই পর (৩ চৈত্র, ১৩৩০) মোক্ষদানন্দকে লিখলেন: 'তোমাকে কে বলিল যে, ব্রহ্মের ভিতর বাহির সম্ভবে? ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। তবে সাংখ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্লেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রকৃতি পুরুষ বিভাগ করিয়াছেন, যেমন সক্রিয় অবস্থাকে প্রকৃতি এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে পুরুষ বলিয়াছেন।' এমনিভাবে শ্রীভারত তাঁর শিষ্যবর্গের সত্য জ্ঞানের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁর পত্রাবলীর মাধ্যমে।

বৃন্দাবনের পথে:

১৯২৪ সালের প্রথম ভাগে বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়ায় আমতলা গ্রামে দশরথের বাড়ীতে মাতৃপূজার জন্য শ্রীভারত গেলেন,—

লগ্ন অতিক্রম হবার পর মূর্তি নির্মাণ সমাপ্ত হয়। দুইটী সমাধান মাত্র সম্মুখে ছিল, একটি নির্দিষ্ট লগ্নে নিরাকার উপাসনা, অপরটি মূর্তি সহ ভিন্ন লগ্নে উপাসনা। উপাসনার ক্ষেত্রে দুয়েরই তুল্যমূল্য তিনি দেখিয়ে দিলেন। পরের দিন চতুর্থীতে মূর্তিসহ পূজা হল। তারপর নেত্রকোণা চিত্রধাম আশ্রমে কয়েকদিন থাকার পর ১৯২৪ সালের আগষ্টে উত্তর ভারত পর্যটনে গেলেন শ্রীভারত। কুমুদিনী, গোবিন্দ, তাদের কন্যা সুমতি আর ধীরানন্দকে (উমেশ দাস) নিয়ে তিনি কাশীতে দু'দিন. প্রয়াগে একদিন থেকে বৃন্দাবনের বেলবনে পৌঁছালেন। সেখানে মহালক্ষ্মী মায়ের মন্দিরে ১৮ দিন 'হত্যা' দিয়ে মায়ের আবির্ভাবের আদেশ পেলেন। ভারতেশ্বরী বিশ্বশক্তি, বিশ্বের আসন থেকে তাঁর অভ্যুদয় হয়েছিল। কিন্তু মহালক্ষ্মী বিশ্বাতীতা শক্তি—তাঁকে বিশ্বে অবতীর্ণ করার তপস্যা করেন শ্রীভারত। বৃন্দাবনে মহালক্ষ্মীর ধাতুমূর্তি ও কৃষ্ণের প্রস্তর মূর্তি সংগ্রহ করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে ১৯২৪ সালের অক্টোবরে নেত্রকোণা চিত্রধাম আশ্রমে ফিরলেন। শারদীয়া পূজায় দশভূজা দুর্গার মৃণ্ময় মূর্তি আর লক্ষ্মী পূর্ণিমায় মহালক্ষ্মী-কৃষ্ণ যুগল মূর্তি এই আশ্রমে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বছরের শেষভাগে জেলা কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রচার করার জন্য তিনি কুমুদানন্দকে দিয়ে সত্যযুগাঙ্কুর ও যোগানন্দকে দিয়ে 'কংগ্রেস ও পল্লীসংস্কারে আমাদের কথা' পুস্তিকা দু'টি রচনা করালেন। বিতরণ করার ভার পড়ল অজপানন্দের ওপর। তারপর ১৯২৫ সালের জানুয়ারীতে শ্রীভারতের নির্দেশে কুমুদানন্দ পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে চিঠি লিখে উত্তর পেলেন,—জানলেন শ্রীভারত ও শ্রীঅরবিন্দ একই সত্যের সংকেত দিয়েছেন। ১৯২৫ সালের অক্টোবরে হাসামপুর নকুল সরকারের বাড়ীতে নকুলবাবু স্বয়ং শারদীয়া দুর্গাপূজা করলেন, আর এই পূজায় তন্ত্রধারক ছিলেন অজপানন্দ। শ্রীভারত এই পূজায় উপস্থিত থাকলেন, জানালেন

ভগবানের আদালতে উকিল লাগে না, পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। তিনি তারপর চিত্রধাম আশ্রমে লক্ষ্মীপূর্ণিমা উৎসব শেষ করে কাওরাইদে মুরারিমোহনের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজায় উপস্থিত হলেন এবং সেখানেই ভারত সমাজ গঠন প্রতিষ্ঠানের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন করালেন। ১৯২৬ সালের প্রথম ভাগে দোলপূর্ণিমার পূর্ব পর্যন্ত এখানেই থেকে চিত্রধাম আশ্রমে এসে দোলযাত্রা সম্পন্ন করলেন এবং আশ্রম, পত্রিকা ও মাতৃভাণ্ডার পরিচালনার জন্য ভারত সমাজ গঠন প্রতিষ্ঠানেব সমিতিকে আহ্বান করলেম। সমিতির সব ভার সমর্পণ ক'বে নিজে থাকলেন উপদেষ্টা। মাসিক 'সোনার ভারত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাও আত্মপ্রকাশ করল অরূপানন্দের সম্পাদনায়। সন্ন্যাসী শিষ্যদের অনেকে আবার গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে পর্যটনে বেরিয়ে গেলেন। ঝুলন উৎসবে আবার সমিতিকে ডেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবার পর সবাই ঘরে ফিরে গেলে ১৪ সেপ্টেম্বর রাধাষ্টমীর দিন শ্রীভারত দেহ-রক্ষা করেন। এই বছরের ২৪ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ সিদ্ধিলাভ করেন এবং পণ্ডিচেরী আশ্রমের সকল ভার শ্রীমার হাতে অর্পণ করেন।

চিত্রধাম থেকে নিত্যধামেঃ

১৩৬৯ বঙ্গাব্দে কলকাতা হতে প্রকাশিত 'সোনার ভারত' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীপূর্ণেন্দু ভূষণ দত্তরায় 'শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী'-তে এই শেষ দিনটি সম্পর্কে লিখেছেনঃ '১৩৩৩, ভাদ্র মাস। রাধা অষ্টমীর দুই সপ্তাহ পূর্বে নিকটবর্তী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ী হইতে পঞ্জিকা আনাইয়া একটী দিন দেখিলেন—কিসের দিন কেহ জানিল না। ক্রমে তাঁহার নির্দিষ্ট দিনটি আসিল—২৮শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, রাধাষ্টমী তিথি।....সপ্তমীর তিথি অতিক্রান্ত হইয়া অষ্টমীর মহালগ্ন সমুপস্থিত। বাবা প্রশান্ত চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি

বিস্ফারিত করিয়া একবার দেখিয়া লইলেন। ধীরে উঠিয়া বালিশটি দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে রাখিলেন, আবার আস্তে আস্তে শয়ন করিলন। ক্ষণ পরেই সুস্পষ্ট কণ্ঠে তিনবার উচ্চারিত হইল —নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ! শান্ত মুখমণ্ডলের উপর যেন ক্লান্ত আঁখিযুগল চিরতরে নিমীলিত হইল—ভারতের মহাযোগী মহা সমাধিতে মগ্ন হইলেন।'

১৯২৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর রাধাষ্টমীর দিন শ্রীভারত মর্ত্ত্য থেকে অমৃতলোকে মহাযাত্রার দিন ধার্য করেছিলেন। দুই বছর আগে ১৯২৪ সালের রাধাষ্টমীতেই বৃন্দাবনের বেলবনে মহালক্ষ্মী রাধারাণীর আবির্ভাবের আদেশ লাভ করেছিলেন। প্রতি বছর এই রাধাষ্টমীতে এই মর্ত্যে সেই অমৃতময়ীর শক্তি-সম্পাতের দিন। ১৯২৪ সালে যে শক্তি-সম্পাত হল শ্রীভারত তাকে ১৯২৫ সালের লক্ষ্মীপূর্ণিমায় চিত্রধাম আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জগৎটাই তো চিত্রধাম,—অরূপ ব্রহ্ম তো এই জগতেই অপরূপ ও বিচিত্র। তারপর এই চিত্রধামেই ১৯২৬ সালে দোল পূর্ণিমা উৎসব তিনি করলেন। মর্ত্যের সবকিছুকে সেই অমৃতময়ীর রঙে রাঙিয়ে দেবার দিন এই দোল-পূর্ণিমা। শ্রীচৈতন্য এমনি দিনেই ৪৪১ বছর আগে নবদ্বীপের মাটীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং রাধা-ভাবকে পুরুষার্থরূপে ঘোষণা করেছিলেন। তারপর ১৯২৬ সালের ঝুলন পূর্ণিমাতে এই চিত্রধামেই শ্রীভারত তাঁর পরিকরদের সঙ্গে মিলিত হন। ঝুলনের এক পালা রথযাত্রা, অপর পালায় উল্টোরথ। উৎস থেকে সরে আসার নাম বিরহ,—উৎসে ফিরে যাবার নাম অভিসার। ঝুলনের এক সীমা অমৃতময়ী রাধিকা, অপর প্রান্তে মর্ত্যের অন্তর্যামী কৃষ্ণ। আর মধ্যবর্তী অঙ্গনে প্রাণময়ী কুব্জা, মনোময়ী রুক্মিণী ও প্রজ্ঞাময়ী গোপীর স্তর। তার পর ১৪ সেপ্টেম্বর রাধাষ্টমীতে তিনি এই চিত্রধাম থেকে নিত্য-ধামে পাড়ি দিলেন। দোলপূর্ণিমা, ১৩৮০

—০—

শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীবাবার কথা

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

আমাদের দেশ সাধু সন্ন্যাসীদের দেশ। কোন কোন সাধু গেরুয়া ধারণ করেন, তীর্থ ভ্রমণ করে জীবন কাটান, কেউবা গেরুয়া ধারণ না করে গৃহবাসে থেকেও কঠোর সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন, তাঁদের কাছে গৃহই আশ্রম হয়ে উঠে। গৃহী হয়েও যে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তা' কেবল আমাদের দেশেই দেখা যায়।

একটি সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি পালন করলেই যে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তা' কখনোই নয়, আচরণ-বিধি বাইরের বিষয়, প্রকৃত সন্ন্যাসের প্রেরণা আসে মানুষের মনে। সুতরাং বাইরে যে যা-ই করুক না কেন, অন্তরে যার সন্ন্যাসের প্রেরণা থাকে এবং সেই প্রেরণা অনুযায়ী যিনি নিজের জীবনের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রিত করেন তিনিই সন্ন্যাসী। সেই জন্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নানা গোষ্ঠী ও নানা মত এবং পথে বিশ্বাসী হয়েও অন্তরের দিক থেকে সকলেই এক অখণ্ড ঐক্য অনুভব করে ভারতের বিশাল সন্ন্যাসী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। প্রত্যেকের মনের মধ্যেই সন্ন্যাসের প্রেরণা বীজাকারে অবস্থান করে বলে, একজন সন্ন্যাসের বহির্মুখী আচার আচরণ স্বীকার না করেও সন্ন্যাসীর বাণী উপলব্ধি করতে পারে, সন্ন্যাসের দিকে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। তার ফলেই একদল গৃহে থেকেও সন্ন্যাসীর মতই জীবন যাপন করে, আর একদল সর্বস্ব ত্যাগ করে একাগ্র মনে সন্ন্যাসের সাধনায় জীবন যাপন করেন। উভয়েই সমাজের নমস্য।

আমরা জন্মান্তরবাদী এবং এ কথা বিশ্বাস করি যে পূর্ব-জন্মের কর্ম দ্বারা পরবর্তী জীবনের কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। সন্ন্যাসের

সাধনাও এক জীবনের সাধনা নয়—বরং জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার মধ্য দিয়েই সন্ন্যাস-জীবনে সিদ্ধি এসে থাকে।

তাই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের দেশে অনেকেই জন্ম-সিদ্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। তার অর্থ পূর্ববর্তী বহু জন্ম ধরে এই সাধনার পথ অনুসরণ করে তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং নবজন্মে তারই প্রেরণা অনুভব করে সিদ্ধি লাভ করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে এ কথা মনে হয়, তা' বুঝি কোন ঈশ্বর-কৃপার ফল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষকে নিজের সাধন ভজনের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কৃপা লাভ করতে হয়। যে ভজন বিমুখ, যার দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে ন্যস্ত নয়, সে কখনো অকারণ ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে পারে না। কারো কৃপায় কেউ কিছু লাভ করতে পারে না। সংসারের সব জিনিসই নিজের শক্তি এবং সাধনা দিয়ে অর্জন করতে হয়। বহু জন্মের সাধনার ভিতর দিয়ে যখন নবজন্ম লাভ করে কেউ জন্ম থেকেই সিদ্ধি লাভ করে, তখন তার পূর্ব জীবনের সাধনার কথা আমাদের অগোচরে থেকে যায় বলে তার সিদ্ধি-লাভ করাকে আমরা ঈশ্বর-কৃপা কিংবা গুরু-কৃপা বলে মনে করি। কিন্তু আগেই বলেছি, কৃপা দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না, সাধন দ্বারা সব কিছু লাভ করতে হয়। এক জন্মের সাধনা দ্বারা বিশেষ কোন বিষয়-মুখী কর্মে সিদ্ধি লাভ করা গেলেও আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধির জন্যে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার প্রয়োজন হয়।

এমনি একটি জন্মসিদ্ধ চরিত্র শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীবাবা। তাঁর বাল্য জীবনের কাহিনী পড়লে জানতে পারা যায় যে, বিষয়-মুখী লেখাপড়ার দিকে বাল্যকালে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। অর্থাৎ যে শিক্ষা আমাদের ঐহিক জীবনের সুখ সমৃদ্ধির উপায় মাত্র, তা' তাঁর অনুরাগ আকর্ষণ করতে পারে নি। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য যাঁর মন উন্মুখ হয়ে থাকে, তিনি কখনো বৈষয়িক সুখ

ভোগের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না। পূর্ব জন্ম-সংস্কার বশতঃ তিনি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার প্রভাব তাঁর জীবনে সর্বজয়ী হয়ে যাবার ফলে বাইরের জগতের সকল প্রলোভন তিনি জয় করেছিলেন।

সাধন ভজনের পথে মনকে সুদৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত করবার জন্য তিনি জীবনে নানা দুঃখ কষ্ট ও বৈষয়িক অভাবের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছেন। এ' সবই পরীক্ষা মাত্র। কারণ, সন্ন্যাস এক অতি কঠিন পথ, কঠিন পথে চলবার ক্ষমতা অর্জন করবার প্রয়োজন হয়, সে শক্তি আপনা থেকে আসে না। এমন কি যাঁরা জন্মসিদ্ধ তাঁরাও তাঁদের পূর্বজন্মের অভ্যাস বশতঃ বৈষয়িক দুঃখ কষ্টের পথই অনুসরণ করে থাকেন। তাঁদের দৈহিক দুঃখ বলতে প্রকৃত কিছু নেই, তবে সংসারী লোক নিজেদের দুঃখ কষ্টের মানদণ্ডে বিষয়-মুক্ত সন্ন্যাসীকে সব সময় বিচার করে থাকে ব'লে তারা সন্ন্যাসীর বিষয়-দুঃখকেও দুঃখ বলেই মনে করে।

সর্বমুক্ত সন্ন্যাসীর পথ সংসারীর পথ নয়, সেই জন্য সন্ন্যাসীর ধারা তারা বুঝতে পারে না। তাদের আচার আচরণকে তারা অলৌকিক ব'লে মনে করে। কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে অলৌকিক ব'লে কিছু নেই, সবই তাদের কাছে স্বাভাবিক। যার যা সাধনার ধারা তার কাছে সেই পথই স্বাভাবিক। সংসারীর পক্ষে তা' স্বাভাবিক নয় বলেই তা' অস্বাভাবিক এবং অলৌকিক মনে করে সে বিস্ময় প্রকাশ করে।

ব্রহ্মচারীবাবার জীবনও নানা অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে তা' কদাচ অলৌকিক নয়, তা' সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সংসারীর কাছে তা' অলৌকিক বলে গণ্য হয়ে থাকে।

সন্ন্যাসীর নিজস্ব ধর্মীয় সাধন ভজনের একেকটি ধারা থাকে। তবু সাধারণ মানুষের মত তাঁকে নানা লৌকিক ধর্মীয় আচার

আচরণ পালন করতে হয়। ব্রহ্মচারীবাবার মনে সাধনার যে লক্ষ্য ছিল, তা' তাঁর নিজস্ব অনুভূতির বিষয় ছিল, তা' বাইরের থেকে কেউ উপলব্ধি করতে পারত না, তবে সাধারণ লোককে বুঝাবার জন্য তিনি সত্যনারায়ণ, মনসা, কালী কার্তিকেয়, এমন কি নানা লৌকিক দেবদেবীরও উপাসনা করবার পরামর্শ দিয়েছেন, এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। নিজের বিশ্বাসই সত্য, আর কিছু সত্য নয় ব্রহ্মচারীবাবা এ'কথা কোনদিন ভাবতে পারেন নি। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে নিজের একটি বিশিষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসকেও অস্বীকার করতেন না, এই বিষয়ে তাঁর কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বোধ ছিল না। ধর্মীয় সাধনের নানা বিরোধী ধারার মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ এবং কালী, শিব ও শক্তি এঁদের মধ্যে তিনি কোনো বিরোধের ভাব দেখতে না পেয়ে বরং ঐক্যের সন্ধান করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগের জন্যই তিনি দেবদেবীকে প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। অনুরাগ এবং নিষ্ঠা থাকলে জীবনে যে কতদূর কি হতে পারে এ' তার প্রমাণ। শুধু তাই নয়, আমি আগেই বলেছি, পূর্ব জন্মের সুকৃতিকে আমরা বিশ্বাস করি। সেই সুকৃতির ফলেই মানুষের ভাগ্যে পরবর্তী জন্মে দেবদর্শন ঘটে থাকে, তা' কেবলমাত্র এক জন্মের সাধনার ফলে কখনো সম্ভব হতে পারে না।

জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীর আচার আচরণ গৃহস্থ নর-নারী কিছুই বুঝতে পারে না, তাঁদের সব কাজেই তাদের বিস্ময় বোধ হয়। ব্রহ্মচারীবাবার জীবনও সাধারণের নিকট অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু আগেই বলেছি, সন্ন্যাসীর আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁদের সুখ-দুঃখ ও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ এক তুলাদণ্ডে বিচার করা যায় না। সংসারের দুঃখ কষ্ট সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করতে পারে না, অথচ

তাঁরা সংসারের আত্মভ্রষ্ট জীবের কল্যাণেই দেহ ধারণ করে থাকেন, কেবল আত্মকল্যাণে সাধন ভজন করেন না। তা' হলে তাঁদের আবির্ভাবের অর্থই বৃথা হতো। ব্রহ্মচারীবাবাও জীবের কল্যাণে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং জাতি বর্ণ নির্বিশেষে জীবের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য নিজের জীবন নিয়োজিত করেছিলেন। সেই জন্য তাঁর কথা আজো আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

—০—

শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারীবাবার সাধন কথা

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পৃথিবীর মানুষের কাছে এক মহাপুণ্যধাম বলিয়া সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছে। ভারতের প্রতি তীর্থেতীর্থে, প্রতি ধর্মস্থানে অসংখ্য মানুষ সংসারের অনিত্য সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের তপস্যার প্রভাবে মঠ মন্দির পর্বতের গহ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের আকাশ বাতাস ভূমি জলকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। শুধু যে তীর্থস্থান তাহা নহে ভারতের গ্রামাঞ্চল অসংখ্য সাধুসন্ত মহাজনদের পবিত্র চরণ-স্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়া মানুষকে ধন্য করিয়াছে। এই মহাজনদের কঠোর তপস্যায় শ্রীভগবানকেও যুগে যুগে এই পবিত্র দেশে আবির্ভূত হইয়া জনজীবন ধন্যতায় পরিপূর্ণ করিতে হইয়াছে—ইহা আমাদের গৌরবের ও আনন্দের বার্তা, ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রদেশেই এই সেদিন

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর আবির্ভূত হইয়া এক অভিনব নামপ্রেম ধর্ম প্রচার করিয়া মানুষকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শে বাঙ্গালা বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ নিরতিশয় ধন্যতা লাভ করিয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পূর্ববাঙ্গালার কথা তঁ'হার বিস্মরণ হয় নাই। তাই তাঁহার চরণস্পর্শে ধন্যা হইয়া এই ভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তাই এই দেশে বহু মহামণীষী আবির্ভূত হইয়া জনমানবকে ধন্য'ধন্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ এক মহাত্মা বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জগদল গ্রামে আবির্ভূত হন ১২৮১ সনের ১২ শ্রাবণ; নাম শ্রীভারত ব্রহ্মচারী, পিতা শ্রীরামরতন দেব এবং মাতা দীনমণি দেবী। উভয়েই পরম ভক্তিমান ও দেবদ্বিজে বিশেষ নিষ্ঠাবান ছিলেন। মাতা দীনমণি দেবী ইহাকে সাধারণ নিয়ম অতিক্রম করিয়া একাদশ মাসে প্রসব করেন। ১৪ বৎসর বয়ক্রম কালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষণ বিশেষ অর্জন করিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই ইহার মতিগতি ছিল ধর্মপরায়ণ এবং তিনি অধিকাংশ সময়ই ধ্যান ও বাবার নামমন্ত্র জপে আসক্ত ছিলেন। ইনি ছিলেন আকুমার ব্রহ্মচারী।

ইহার সাধন জীবন অনন্য সাধারণ। কুমার বয়সেই তিনি শ্রীশিবকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন 'রামমন্ত্রে'। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে সাধন দিয়া অল্পকাল পরেই দেহত্যাগ করেন। দৈবযোগে অশেষ ধর্মপরায়ণতায় ইহার সাক্ষাৎ হয় বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার প্রসিদ্ধ শিষ্য শ্রীমৎ অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সহিত। ইহার নিকট হইতেই ব্রহ্মচারীবাবা "ব্রহ্মগায়ত্রী" ও "সোঽহং" মন্ত্র পাইয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু এখানেও ভারত ব্রহ্মচারীজীর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই।

ব্রহ্মগায়ত্রী সাধনা করিয়া বিপুল উদ্যমে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় শ্রীমৎ অভয়ানন্দজীরও তিরোভাব হইল।

ভারত ব্রহ্মচারীজী পরে গুপ্ত সাধক ও সিদ্ধপুরুষ শ্রীমৎ গোপাল গোস্বামী হইতে তারকব্রহ্ম নামের বীজমন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন ও কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন।

ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ভোগমুখী মানুষ মহাপুরুষদের সাধনা ধরিতে পারে না। ভারতব্রহ্মচারীজী আড়াই বৎসর কাল অদম্য উৎসাহে তামার টাটে ওঁ মন্ত্র সাধন করিয়া জ্যোতিদর্শন করেন। এই জ্যোতি দেখা দিয়া টাটেই বিলীন হইয়া যাইত। ইঁহাকে তিনি বাবা বলিয়া ডাকিতেন এবং পরে আশ্চর্যরূপে এই জ্যোতি তাঁহাকে কৃষ্ণরূপে দর্শন দেন। আনন্দে ভরপুর ভারত ব্রহ্মচারীজী প্রায়ই ধ্যানস্থ থাকিতেন, কখন কখনও একাদিক্রমে ৫।৬ দিন সমাধি অবস্থা চলিত।

গোপাল গোস্বামী তাঁহাকে যে শালগ্রাম শিলা দিয়াছিলেন তাঁহার নাম "লক্ষ্মীজনার্দন"। ইঁহাকেই তিনি ব্রহ্মগায়ত্রী লাভের পর হইতেই পূজা করেন। কখন কখনও দেখিতেন মহাফনা বিস্তার করিয়া অনন্তদেব আবির্ভূত হইয়াছেন, আবার অত্যল্পকাল মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছেন। এই পূজা ধ্যান ও বিচিত্র দর্শন লইয়াই তাঁহার সময় কাটিত।

আকুমার ব্রহ্মচারী ভারতজী বিবাহ করেন নাই, কোনও ধনের সংস্থান নাই। তিনি নিজ হস্তে নারায়ণশীলা পূজা করিতেন। তাঁহার দিদি মহা পুণ্যশীলা রমণী, তিনি অত্যন্ত পবিত্রতার সহিত সেবাকার্য চালাইতেন। বাবার আদেশে গৃহের যাবতীয় তৈজসপাত্র বিক্রয় করিয়া সেবা চলিত; যেদিন চলিত না, ধর্ণা দিয়া থাকিতেন, প্রভুর কৃপায় সবই সংগ্রহ হইয়া যাইত।

ভারত ব্রহ্মচারীজী শ্রীকৃষ্ণের আসনেই দেবীপূজা, নারায়ণ পূজা, ভারতেশ্বরী মায়ের পূজা প্রভৃতি করিতেন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ছিল

"সচ্চিদানন্দ লাভ। সাক্ষাৎ দর্শনও তিনি পাইতেন ইঁহাদের। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী জনার্দন শিলার উপর দেবীপূজা করিতে করিতে ত্রিনয়নী মহামায়ার দর্শন পান—দ্বিভূজা সিংহবাহিনীরূপে ঐ শিলার উপরেই। তিনি শক্তি পূজা ও জয়কালী মূতি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করেন এবং শিষ্যবর্গকেও ঐ পূজার উপদেশ করেন। এই দেবীদর্শন ও সচ্চিদানন্দ লাভের পর তাঁহার শিষ্য প্রকরণ ও তীর্থ যাত্রা আরম্ভ হয়।

তিনি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সকল তীর্থই ভ্রমণ করেন ও পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে আড়াই দিন হত্যা দিয়া আদেশ পান—"সব ভাবেই আমার পূজা করা যায়-তাই তাঁহাব মতে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব একই ভজন-তরুর বিভিন্ন শাখা মাত্র। তীর্থযাত্রার বহু কষ্টে নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন। চন্দ্রনাথ, সীতাকুণ্ড কালীঘাট, তারপর পুরী এবং তথা হইতে ৮ মাস পদব্রজে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া সেতুবন্দ রামেশ্বর দর্শন করেন। রামেশ্বরজী তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইবার আদেশ করেন, তারপর তিনি বৃন্দাবন গিযা শ্রীকৃষ্ণ লীলাক্ষেত্র দর্শন করিয়া বেলবনে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মায়েব মন্দিরে আঠার দিন হত্যায় থাকিয়া আকুল প্রার্থণাদি করিলে অহেতুক কৃপাময়ী শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বলেন, — 'ভারতের তথা সমগ্র জগতের মঙ্গলার্থে প্রকাশিত হইব।"

ব্রহ্মচারী মহারাজ যখন যেখানে যাইতেন, যে গ্রামে বাস করিতেন সেখানেই তিনি সকলকে মাতাইয়া তুলিতেন; এমন কি স্কুলের ছাত্ররাও তাঁহাকে ছাড়িত না। তিনি তাহাদের ব্রহ্মচর্য উপদেশ করিতেন। ১৩২৬ সালে তাহার তিরোভাবের ৭ বৎসর পূর্বে তিনি ভারতেশ্বরী মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন, অত্যন্ত উদ্যম এবং অসখ্য লোকের সহানুভূতিতে। এই দেবী-প্রতিষ্ঠা তাঁহার একটি পরমাদ্ভুত কীর্তি। দীপান্বিতা, কালীপূজা, শিবচতুর্দ্দশী এমন কি শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন করবার উপদেশ করতেন।

ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরীভজন ও সহজিয়া সম্প্রদায় বলিয়া আউল, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি কয়েকটি বহিরঙ্গ বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছেন। ব্রহ্মচারীজী তাহাদের আপন করিয়া নেন এবং কিশোরী ভজন ও সহজিয়া ভজন পরিত্যাগ করিয়া অনেকেই আসিয়া তাঁহার আশ্রয় নেয়। তাঁহার আশ্রয়ে তাহারা পবিত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে আসক্ত হয়। তিনি ইহাদের মধ্যে হরিসভা তুল্য "আসন-প্রতিষ্ঠা" করিয়া তাহাদের পবিত্র পথে নিয়া আসেন।

ব্রহ্মচারীবাবার কয়েকজন শিষ্য নির্গুণ ব্রহ্মবাদী হইয়া পড়িলে, তাহাদের ভ্রম সংশোধনের জন্য পর্যটনে পাঠাইয়া দেন। কয়েক বৎসর ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ও বহু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া তাহারা সকলেই পুনরায় গুরু সন্নিধানে ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীগুরুদেবের আদর্শে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন।

সংক্ষিপ্ত জীবন এই ব্রহ্মচারীবাবার—মাত্র ৫২ বৎসর তিনি প্রকট দেহে ছিলেন, ১২৮১ সনের ১২ শ্রাবণ হইতে ১৩৩৩। ২৮ ভাদ্র রাধাষ্টমীর দিন তিনি তাঁহার সাধনোচিত নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। আরও দীর্ঘ জীবন লাভ হইলে বহু মানুষ তাঁহার কৃপায় কল্যাণের পথ দেখিতে পাইতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "সোনার ভারত" বাংলা মাসিক পত্রিকা অনেককে আলোক-বর্তিকা দ্বারা মহাকল্যাণের পথের সন্ধান দিয়াছে। তিনি গিয়াছেন বটে, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সাধন-জীবনের আদর্শ। আজ সেই আদর্শের সম্মুখে শতশত মানুষ নতজানু হইয়া পথের সন্ধান যাচ্ঞা করিবে এবং তাঁহার প্রদর্শিত জীবন যাপন করিয়া ধন্য হইবে। ভারতের—শুধু ভারতের নয় বিশেষ করিয়া বাংলার এই কৃতি সাধক-সন্তান যে অমর-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার আলোকে যুগেযুগে মহান্ আদর্শ মানুষের চোখে ফুটিয়া উঠিবে। তাই আমাদের

নিতান্ত আপনজন এই মহাপুরুষের শতবার্ষিকী তিথিতে আমরা সমবেত হইয়া তাঁহার চরণে আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

জয় ভারত ব্রহ্মচারী, জয় অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, জয় ভারতের পরম গুরু বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী।

—০—

ব্রহ্মচারীবাবা ভারতচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার জগদল গ্রামে রামরতন দেব ও দীনমণি দেবী নামে এক ধর্মপরায়ণ দম্পতি বাস করিতেন। ভারত ব্রহ্মচারীবাবা ইঁহাদেরই সুসন্তান। ব্রহ্মচারীবাবা ১২৮১ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই উক্ত জগদল গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। ব্রহ্মচারীবাবার তিরোভাব ঘটে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৮শে ভাদ্র অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর। ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার এই ৫২ বছর ১ মাস ১৬ দিনের জীবনে বঙ্গের তথা ভারতের তথা জগতের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর যে দিব্য আলোক ফেলিয়া গিয়াছেন তাহা প্রত্যেক সমাজসেবী, প্রত্যেক ধর্মসেবী, প্রত্যেক রাজনীতিবিদ্ ও প্রত্যেক অর্থনীতিবিদ্‌কে গভীর-ভাবে আকর্ষণ করিবে। ব্রহ্মচারীবাবার সময়োচিত এই দিব্য আলোকের বার্তা এ পর্যন্ত বঙ্গ-ভাষাভাষী কিছু মানুষ মাত্র অবগত হইয়াছেন। যাঁহারাই ইহা অবগত হইয়াছেন তাঁহারাই মনে প্রাণে বুঝিয়াছেন ব্রহ্মচারীবাবার এই আলোক অখিল

মানবের অশেষ মঙ্গল সাধনে সমর্থ—ইহার কথা জগতের সকল ভাষায় প্রচারিত হওয়া বিশ্বমানবের কল্যাণকল্পে একান্ত আবশ্যক।

ব্রহ্মচারীবাবার বহু পত্র সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পত্রগুলির প্রত্যেকখানিই এক একখানি গ্রন্থবিশেষ। পত্র-ব্যতীত ব্রহ্মচারীবাবার আর একখানি গ্রন্থ পাইবার ভাগ্য আমাদের হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম সত্যযুগাঙ্কুর। ব্রহ্মচারীবাবা এই গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া যান নাই। এই অসমাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় ব্রহ্মচারীবাবা যাহা বলিয়াছেন প্রত্যেক সমাজসেবী, প্রত্যেক ধর্মসেবী, প্রত্যেক রাজনীতিবিদ্ এবং প্রত্যেক ধর্মনীতিবিদের তাহা গভীর অনুধ্যানের বিষয়। ভূমিকাটি এই—

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥" (গীতা ৩।৩৫) মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অমিতব্যয়িতা, অলসতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ইত্যাদিতে স্বধর্মচ্যুতি হওয়াতেই বর্তমান সমাজ ঋণ, রোগ, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব প্রভৃতিতে উৎসন্ন হওয়ার পথে চলিয়াছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমোচিত শিক্ষালাভে হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় পরোপকারী, সত্যপরায়ণ, চিন্তশীল, আত্মনির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাসী, ঈশ্বরানুরাগী হইলে স্বধর্ম পালন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা হইবে। নিবেদক —ভারত" ব্রহ্মচারীবাবার এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটির ভাব সম্প্রসারিত করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে গোষ্পদের জলে প্রতিবিম্বিত অনন্ত আকাশের ন্যায় উহা অখিল মানব জাতির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত এক মহতী বার্তা। অসংখ্য অবতারের উৎস অকুণ্ঠমেধা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের বলা গীতার কর্মযোগ নামক ৩য় অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশ শ্লোকটি যাহা ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার ভূমিকার মূল উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—বাংলায় অনূদিত হইলে যে রূপ পরিগ্রহ করে তাহা এই—বিগুণ স্বধর্ম সুষ্ঠু

অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে অধিক প্রশংসাযোগ্য। স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিতে গিয়া যদি মৃত্যু ঘটে তাহাও মঙ্গলকর কিন্তু পরধর্ম ভয় বহিয়া আনে। ব্রহ্মচারীবাবা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাণীটির যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অমিত-ব্যয়িতা, অলসতা, বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতি অধর্ম বর্তমান ভারতীয় সমাজকে স্বধর্মচ্যুত করিয়াছে তাই আজ ঐ সমাজ ঋণ, রোগ, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব প্রভৃতিতে উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। অধর্ম আশ্রয় করিয়া জগতের যে কোন মানব বা মানবগোষ্ঠী এইরূপ ভাবে উৎসন্ন হইবে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমোচিত শিক্ষালাভ করিয়া হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া সদাচারী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, সত্যপরায়ণ, চিন্তাশীল, আত্মনির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাসী ও ঈশ্বরানুরাগী হইলেই মানবের পক্ষে স্বধর্মানুষ্ঠান সম্ভব। অধর্ম ত্যাগপূর্বক স্বধর্মানুষ্ঠানই মানুষকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ঋণ, রোগ, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, প্রভৃতি হইতে অর্থাৎ ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করে। অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশিত শ্রীযোগানন্দ ও শ্রীগণেশ কর্তৃক সঙ্কলিত "ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী" হইতে জানা যায় জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীবাবাকে জগজ্জননীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং জগজ্জননীর আদেশ মত চলিতে বলিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহারই শরণ লইতে বলিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে উহা করিলে তিনি অর্জ্জুনকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। ব্রহ্মচারী-বাবার জীবনে আমরা শ্রীকৃষ্ণশরণাগতির চরম উদাহরণ দেখিতে পাই। ব্রহ্মচারীবাবার চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণ-প্রোক্ত গীতাধর্ম প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মচারীবাবা ভগবদ্গীতার জীবন্ত ব্যাখ্যা স্বরূপ। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী অনুধ্যান করিলে তাহার প্রতিটি অক্ষর আমরা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অখিল মানবের—মুসলমান,

খ্রীষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, হিন্দু, নিগ্রো, কোল, ভীল, সাঁওতাল, গাড়ো প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত অখিল মানব গোষ্ঠীর কল্যাণের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে প্রকৃতির মানুষ যে পথ অনুসরণ করিলে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবে গীতায় তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। ব্রহ্মচারীবাবার জীবন গীতার প্রতিধ্বনি স্বরূপ। অখিল জগতে এমন সাধু ব্যক্তি কে আছেন যিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের জনগণকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অমিতব্যয়িতা, অলসতা, বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া, হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া, সদাচারী জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, সত্যপরায়ণ, চিন্তাশীল, আত্মনির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাসী ও ঈশ্বরানুরাগী না হইতে বলিবেন? ধর্ম দ্বিবিধ—সাধারণ ও অসাধারণ। কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীকে পীড়া না দেওয়া, সকল প্রাণীর কল্যাণকল্পে বাক্য ও মনের যথার্থতা রক্ষা করা, কায়মনোবাক্যে পরস্ব হরণ না করা, বীর্যধারণ, দেহ রক্ষার জন্য যতটুকু ভোগ আবশ্যক কেবল ততটুকুমাত্র ভোগ স্বীকার করা, দেহ ও মনকে পবিত্র রাখা, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর চিন্তা এই দশটিকে পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে অখিল মানবের সাধারণ ধর্ম বলিয়াছেন। অসাধারণ ধর্ম প্রকৃতি ভেদে পৃথক্ পৃথক্। পঠন ও পাঠন, যজন ও যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এইগুলি কতকগুলি বিশ্ববাসীর স্বভাবিক কর্ম। জনরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং বিষয়ে অনাসক্তি এইগুলিও আবার কতকগুলি বিশ্ববাসীর স্বাভাবিক কর্ম। পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, এবং সুদে টাকা খাটান এইগুলি আবার তৃতীয় এক শ্রেণীর মানবের স্বাভাবিক কর্ম। উক্ত তিন শ্রেণীকে তাহাদের কাজে সহায়তা দান করা চতুর্থ এক শ্রেণীর মানবের স্বাভাবিক কর্ম। স্বাভাবিক গুণভেদে মানুষে মানুষে এই কর্মভেদ অখিল জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যে গুণভেদে কর্মভেদ ইহা অসাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মই এই অসাধারণ ধর্মের ভিত্তি। আমরা চার শ্রেণীর

মানুষ এই জগতে দেখিতে পাই। এই চার শ্রেণীর মানুষের স্বাভাবিক কর্ম একরূপ নহে। এক শ্রেণীর যাহা স্বধর্ম অপর শ্রেণীর তাহা পরধর্ম ; স্বধর্ম স্বভাব নিয়ত কিন্তু পরধর্ম স্বভাবনিয়ত নহে। যে ধর্ম স্বভাবনিয়ত নহে তাহার অনুষ্ঠানে নানারূপ বিপত্তি জন্মে। পাঠন যাঁহার ধর্ম তিনি যদি প্রজাপালনে রত হন বা প্রজাপালন যাঁহার ধর্ম তিনি যদি বাণিজ্যে রত হন তাহা হইলে পাঠনও সুষ্ঠু হইবে না, প্রজাপালনও সুষ্ঠু হইবে না, বাণিজ্যও সুষ্ঠু হইবে না। অথচ পাঠন, প্রজাপালন ও বাণিজ্য এই তিনটিই সাধারণ ধর্মের মুখাপেক্ষী। সাধারণ ধর্মে যিনি বলীয়ান্ তিনি প্রকৃতিভেদে যে কর্মই করুন না কেন তাঁহার সেই কর্মই সফল হইবে এবং জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে। পাঠন, প্রজাপালন ও পশুপালন এবং পাঠক, প্রজাপালক ও পশুপালকের সহায়তা সাধন, এই কর্মগুলি সাধারণ ধর্মে বলীয়ান্ ব্যক্তিকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে অখিলজগতে এক বিস্ময়াবহ অভ্যুদয় সাধন করিতে পারে। পাঠক প্রজাপালক ও পশুপালক এবং ইহাদের সহায়ক যদি সাধারণ ধর্মে অর্থাৎ দেবচরিত্রে বিভূষিত হন তাহা হইলে জগতে রোগ, দারিদ্র্য, অন্নাভাব বস্ত্রাভাব প্রভৃতি কোন অশুভই দেখা দিবে না। ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার দিব্য দৃষ্টিদ্বারা বাংলার তথা ভারতের তথা জগতের মনুষ্য সমাজের মূল ব্যাধি কি তাহা দেখিয়াছেন এবং তাহা দূর করিবার যে কি উপায় আছে তাহাও দেখিয়াছেন। ব্রহ্মচারী-বাবার জীবনের সাধনা ও বাণীর আলোকে আমরা গীতা পাঠ করিলে আমাদের কাছে ধর্ম, অর্থ, সমাজ ও রাজনীতির কোন সমস্যাই আর জটিল থাকিবে না। আমরা সকল সমস্যারই একটা সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছিয়া নিজেরা সুখী হইব এবং অপরকে সুখী করিতে পারিব।

ব্রহ্মচারীবাবা ভারতচন্দ্রকে কেবল ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেই আমার খুব ভাল লাগে। কবি গাহিয়াছেন, "আমি চাই এমন মানুষ,

আমি চাই এমন প্রাণ, বক্ষ যাহার স্নেহের খনি, হৃদয় যাঁহার আকাশ খান।" ব্রহ্মচারীবাবার মধ্যে কবির আকাঙ্ক্ষিত ঐ মানুষকে তো আমরা দেখি-ই, উহা অপেক্ষা অনেক বড় মানুষকেও দেখি। এত বড় মানুষকে দেখি যে তাঁহাকে মানুষ বলিব না স্বয়ং ভগবান্ বলিব তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহ পাঠ করিয়া আমরা দেবতার যে পরিচয় পাই তাহাতে ব্রহ্মচারীবাবাকে দেবতা বলিতে পারি না। দেবতা বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয় বলিয়া মনে করি। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তীন্দ্রং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥" এক সৎস্বরূপকে বিপ্রগণ বহু প্রকারে অভিহিত করেন। (তাঁহারা তাঁহাকে) ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, প্রসিদ্ধ দিব্য বিহঙ্গ গরুড়, যম ও মাতরিশ্বা বলেন। —এই মন্ত্রটি পাঠ করিলে দেবতা বিষয়ে আমাদের ধারণা অন্যরূপ ধারণ করে। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমরা বুঝি যে ইন্দ্র, যম, বরুণ, মাতরিশ্বা প্রভৃতি একই সৎস্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন" এই বেদান্ত বাক্য আমাদিগকে যে শিক্ষা দান করেন তাহা হইতে আমরা বুঝি যে সাধক উপাসনার দ্বারা সার্ষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য ও সালোক্যরূপ অনিত্যমুক্তি এবং জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তিরূপ নিত্যমুক্তি লাভ করেন। যাঁহারা মুক্তির সাধক তাঁহাদের দার্শনিক নাম মুমুক্ষু এবং যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম মুক্ত। যাঁহারা মুমুক্ষু বা মুক্ত নহেন শাস্ত্র তাঁহাদিগকে বদ্ধ বলিয়াছেন। মুক্ত পুরুষেরই অপর নাম সিদ্ধপুরুষ। মুক্ত-পুরুষগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—স্বভাবমুক্ত ও সাধনামুক্ত। স্বভাবমুক্তের অপর নাম নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধগণ জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবানের অংশাবতার, কলাবতার ও শক্ত্যাবেশ অবতারের ন্যায় এবং স্বয়ং ভগবানের ন্যায় ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয়-কালে জগতে আবির্ভূত হন।

ব্রহ্মচারীবাবা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পিতা এবং ভারতেশ্বরী দেবীকে তাঁহার মাতা বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীবাবার এই আত্মপরিচয় প্রকৃতপক্ষে জীবমাত্রেরই সত্যিকারের আত্মপরিচয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বলিয়াছেন "মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজ-প্রদঃ পিতা॥"—হে অর্জ্জুন, আমি আমার যোনি মহদ্‌ব্রহ্মে গর্ভাধান করি এবং উহারই ফলে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত জীবগণের উৎপত্তি হয়। দেব, নর, পশু প্রভৃতি সকল যোনিতে যে সকল দেহের উৎপত্তি হয় মহদ্‌ব্রহ্ম তাহাদের মাতা এবং আমি তাহাদের বীজ-প্রদ পিতা। কিন্তু আমরা কি ব্রহ্মচারীবাবার মত আত্মপরিচয় দিয়া থাক? দিই না। উহার কারণ আমাদের অনভিজ্ঞতা। ব্রহ্মচারীবাবা গুরুর উপদেশে তামার টাটে চন্দনের দ্বারা প্রণব লিখিয়া চন্দনচর্চ্চিত তুলসী দ্বারা উহার অর্চ্চনা এবং উদাত্তকণ্ঠে প্রণব জপের দ্বারা প্রণববাচ্য পরমেশ্বরের স্তুতি করিতেন। এই সাধনার ফলেই তিনি লক্ষ্মীজনার্দন শালগ্রামে সকল দেবতার প্রবেশ ও স্থিতি দর্শন করেন। যে শালগ্রাম আমাদের নিকট প্রস্তরখণ্ড মাত্র ব্রহ্মচারীবাবার নিকট তাহা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার নারায়ণ। ব্রহ্মচারীবাবা এই একই সাধনা আপামর সকল হিন্দুকে দিয়াছেন। প্রণব মন্ত্রে দীক্ষাদানের পূর্বে বাবা প্রত্যেককে যজ্ঞোপবীত দান করিয়াছেন। বাবা যজ্ঞোপবীত দানপূর্বক প্রণবমন্ত্রে দীক্ষা হিন্দু ভিন্ন অপর কাহাকেও না দিলেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানবের পক্কান্ন দ্বারা তিনি ভারতেশ্বরী মাতাকে ভোগ দিয়াছেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বাবার জননী দীনমণি দেবী কি'ভাবে বাবাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং বাবা মাতৃগর্ভে আসিলে জননী কি অনুভব করিতেন এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণীয়। জননীকে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে "দোহাই চন্দ্র" মন্ত্রে চন্দ্ররূপে তাঁহার ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন

এবং বলিয়াছিলেন তিনিই পুত্ররূপে তাঁহার কোলে আসিবেন। ব্রহ্মচারীবাবা যখন মাতৃগর্ভে তখন জননী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইতেন। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "নক্ষত্রাণামহং শশী"—নক্ষত্র মধ্যে আমি চন্দ্রমা। এই জন্যই জননী দীনমণিকে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্ররূপে তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন। বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান অমরার্থচন্দ্রিকায় কৃষ্ণবাচক শব্দ সমূহের মধ্যে বিধু একটি। সুতরাং দোহাই চন্দ্র মন্ত্রে চন্দ্রের ধ্যান করা আর দোহাই কৃষ্ণ মন্ত্রে কৃষ্ণের ধ্যান করা একই বস্তু। বিভূতিযোগ নামক শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে সকলভাবে তাঁহার চিন্তা বা ধ্যান করিতে বলিয়াছেন তাহার মধ্যে চন্দ্র একটি। মা দীনমণি সৎ পুত্র কামনায় ধ্যানযোগে কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ স্বপ্নযোগে জননীকে সৎ পুত্র লাভ করিতে হইলে যে মন্ত্রে যে দেবতার ধ্যান করিতে হইবে তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন সৎ পুত্ররূপে আমিই তোমার গর্ভে আসিব। মা দীনমণির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন-বাণীর অর্থ হইল এই যে ব্রহ্মচারীবাবা শ্রীকৃষ্ণের এক বিভূতি। সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা, সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত, বিষ্ণু, সূর্য, চন্দ্র, ব্যাস, শুক্রাচার্য, নারদ। সমুদ্র, গঙ্গা, অশ্বত্থ, নরপতি প্রভৃতি বিভূতিমান্, শ্রীমান্, ও উর্জ্জিত সত্ত্বসমূহের মত ব্রহ্মচারীবাবাও শ্রীকৃষ্ণের এক বিভূতি। ব্রহ্মচারীবাবা অপ্রকট হইলেও তাঁহার বাণীমূর্তি প্রকট রহিয়াছেন—ব্রহ্মচারীবাবার অমূল্য পত্রাবলীই তাঁহার বাণীমূর্তি। ব্রহ্মচারীবাবা কি বস্তু তাহা বুঝিবার একমাত্র অভ্রান্ত ও অমোঘ উপায় তাঁহার পত্রাবলী। গোষ্পদে বিম্বিত অনন্ত আকাশের ন্যায় ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলীর মধ্যে তাঁহার কোটিসূর্যসংকাশ, মহিমোজ্জ্বল জীবন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলীকে তাঁহার আত্মজীবনী বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না বরং উহাই তাঁহার আত্মজীবনীর যথার্থ স্বরূপ।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন "God is working for the freedom of India—ভগবান্ ভারতের মুক্তির নিমিত্ত কাজ করিতেছেন। প্রভু জগদ্বন্ধু, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রহ্মচারী লোকনাথ, ব্রহ্মচারীবাবা ভারতচন্দ্র, ময়ুর মুকুটবাবা, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষ, বালগঙ্গাধর তিলক, মদনমোহন মালব্য, মহাত্মা গান্ধী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ইহারা প্রত্যেকেই "যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্॥" —(হে অর্জ্জুন,) বিভূতিমান্, শ্রীমান্, এবং উর্জিত যে কোন সত্ত্বকেই আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে—গীতার এই মহাবাণী অনুসারে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। ইহাদের বাণী এবং আচরণ নানা জাতি, নানা ধর্মে আপাতত খণ্ডিত ভারতের মহান্ আত্মাকে অনৈক্যের মায়াপাশ হইতে মুক্ত করিয়া ঐক্যের অমৃত রসে অভিষিক্ত করিয়াছে, গুরু হইতে গুরুতর, মহৎ হইতে মহত্তর করিয়াছে, অনৈক্যের হীনতা, দীনতা ও দুর্বলতা বিদূরিত করিয়া তাহাকে মহামহিমান্বিত, মহামহেশ্বর ও মহাবলিষ্ঠ করিয়াছে।

ব্রহ্মচারীবাবা সর্বমানবের পক্কান্ন দ্বারা মা ভারতেশ্বরীর ভোগ দিয়াছিলেন। মা ভারতেশ্বরী নিশ্চয়ই ঐ ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ মা ভোগ গ্রহণ না করিলে ব্রহ্মচারীবাবার পক্ষে প্রসাদ পাওয়া সম্ভব হইত না। ব্রহ্মচারীবাবা লিখিয়াছেন ঐ ভোগের মধ্যে মুরগীর মাংসও ছিল। ভগবান্ গীতামুখে বলিয়াছেন—"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥" আমি অগ্নি হইয়া সর্ব প্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া আছি এবং প্রাণও অপান বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্বিধ অন্ন ভক্ষণ করিতেছি। ভগবানের এই মহাবাণীর সরল অর্থ এই যে মানুষ যাহা খায় ভগবানও তাহাই খান। খাদ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের যে সকল অনুশাসন আছে তাহা

মানিয়া চলিলে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরের সকল খাদ্য খাইতে পারেন না। কিন্তু ভগবান সর্বভুক্। ভগবানের শক্তি মা, ভারতেশ্বরীও তাই। মহেশ্বরী উমাই ভারতেশ্বরী। "উমা কাত্যায়নী গৌরী কালী হৈমবতীশ্বরা। অপর্ণা পার্বতী দুর্গা মৃড়ানী চণ্ডিকাম্বিকা॥" উমা, কাত্যায়নী, গৌরী, কালী, হৈমবতী, ঈশ্বরা, অপর্ণা, পার্বতী, দুর্গা, মৃড়ানী, চণ্ডিকা ও অম্বিকা তুল্যার্থক,—এই উক্তিটি অমরকোষ নামক সংস্কৃত অভিধানের। ব্রহ্মচারীবাবা মা ভারশ্বেরীর ধ্যানে "ধ্যায়েত্বমাং মহেশ্বরীম্"—মা ভারতেশ্বরীকে মহে-শ্বরী উমারূপে ধ্যান করিবে—এই কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মচারী-বাবার এই ভোগ নিবেদন এবং প্রসাদ গ্রহণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অখিল ভারতবাসীর মনে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই—কেবল ভারতবাসীর নহে জগদ্বাসীরও। ব্রহ্মচারীবাবার এই আচরণে আমরা প্রভু জগদ্বন্ধুর "আমি সমাজের বাঁধ ভেঙ্গে দেব," এই বাণীটি স্মরণ না করিয়া পারি না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অখিল মানবের পক্কান্ন গ্রহণ করা এবং অখিল মানবের পক্কান্ন দ্বারা মা দুর্গাকে ভোগ দেওয়া—এই দুইটি কাজের মধ্যে সুবিশাল পার্থক্য বর্তমান। প্রথম কার্যটি দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের দেশে গোপনে গোপনে এবং ভয়ে ভয়ে চলিতেছে। দ্বিতীয় কার্যটি ব্রহ্ম-চারীবাবার পূর্বে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। একজন অসাধারণ হিন্দু সাধক, মুসলমান বা খৃষ্টানের পক্কান্ন দ্বারা মা দুর্গাকে ভোগ দিয়াছেন এবং মা দুর্গা সেই ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সাধক মহাপুরুষ মা দুর্গার ঐরূপ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে একান্ত অভিনব।

ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার এই অসাধারণ আচরণের দ্বারা ইহাই দেখাইয়াছেন যে মা ভারতেশ্বরী জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্কান্নই ভক্তি সহকারে নিবেদিত হইলে গ্রহণ করেন। প্রকৃত অস্পৃশ্যতা বর্জন কাহাকে বলে ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার এই

ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ গ্রহণের দ্বারা অখিল জগৎকে তাহা দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার জীবন দর্পণে আমরা দেখিতে পাই যে কেবল মায়ের ইচ্ছাই সেখানে পূর্ণ হইতেছে। মায়ের ইচ্ছায় তিনি বাড়ী, ঘর, জমি, জায়গা, ঘটি, বাটী সব কিছু বিক্রয় করিয়া মায়ের পূজা করিয়াছেন। তাঁহার কর্তব্য তিনি সর্বদা মায়ের মুখ হইতেই শুনিয়া লইতেন। মা যাহা বলিতেন তাহাই ব্রহ্মচারীবাবা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ, আমার জীবন মাঝে।" জগদীশ্বরী ব্রহ্মচারীবাবার জীবন মাঝে নিরন্তর আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতেছেন—এই দৃশ্য আমরা সর্বদা সবিস্ময়ে দর্শন করি। ব্রহ্মচারীবাবা গুরুর নিকট হইতে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা এবং তামার টাটে চন্দনে প্রণব লিখিয়া চন্দনচর্চিত তুলসীপত্রে তাহার অর্চনা এবং উদাত্ত প্রণবধ্বনিতে প্রণববাচ্য পরমেশ্বরের উপাসনা লাভ করিয়াছিলেন। মায়ের আদেশে এই মন্ত্র ও সাধন তিনি নমঃশূদ্র শিষ্যকেও দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ হইতে নমঃশূদ্র পর্যন্ত তাঁহার সকল শিষ্যই মায়ের ইচ্ছায় তাঁহার নিকট হইতে ঐ একই মন্ত্র এবং একই সাধনা লাভ করিয়াছিলেন। প্রণবের উচ্চারণে এবং শালগ্রামের অর্চনায় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যই অধিকারী। শূদ্র প্রণব উচ্চারণ করিলে এবং শালগ্রামের অর্চনা করিলে চণ্ডালতা প্রাপ্ত হইবে—এ কথা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। অর্থাৎ ঐ দুইটি সাধনে শূদ্র উন্নতির পরিবর্তে চরম অবনতি প্রাপ্ত হইবে—স্মৃতির অনুশাসন ইহাই। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা মায়ের আদেশে শূদ্রকেও প্রণবে দীক্ষা দিয়াছেন। প্রণবে দীক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার শূদ্রশিষ্য উন্নতিই লাভ করিয়াছেন, অবনতি নহে।

ধর্মের গ্লানি ঘটায় ভারত পরাধীন হইয়াছিল। পরাধীন ভারতকে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম বিভূতি ব্রহ্মচারীবাবা সাধুজনের ত্রাণ এবং ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থে হত্যা দিয়া অর্থাৎ হে তীর্থদেব তুমি যদি দর্শন না দাও তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পসূচক অনশনের দ্বারা তিনি সেই সেই তীর্থে সেই সেই দেবতার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। গভীর রাত্রিতে উদাত্ত প্রণব ধ্বনির সাধন দ্বারা তিনি তাঁহার গুরু প্রদত্ত লক্ষ্মীজনার্দন শালগ্রামে অনন্ত নাগ, শিব, দুর্গা, নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাবৃন্দের প্রবেশ দর্শন করিয়াছিলেন। উদাত্ত প্রণব ধ্বনিতে আবির্ভূত শিব, দুর্গা, নারায়ণ প্রভৃতি দেববৃন্দ ব্রহ্মচারী-বাবার জিজ্ঞাসায় স্ব স্ব পরিচয় দিয়া লক্ষ্মীজনার্দন শালগ্রামের মধ্যে বিলীন হইয়াছিলেন। উদাত্ত প্রণব-ধ্বনির সাধনায় ব্রহ্মচারীবাবা অখিল দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সাক্ষাৎকৃতধর্মা হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ ব্রহ্মচারীবাবার ঘটে নাই বটে কিন্তু তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পরম ভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মচারীবাবা সাধনার অমোঘত্ব প্রদর্শনের জন্যই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। প্রণব সর্ব দেবময়। প্রণবধ্বনিতে আহ্বান করিলে সব দেবতারই যে আবির্ভাব ঘটে ব্রহ্মচারীবাবা তাহা দেখাইয়াছেন।

ব্রহ্মচারীবাবার কথা বলিয়া বা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বেদাদি সর্বশাস্ত্রের মূর্তিস্বরূপ। তাঁহার এক একখানি পত্রে নির্মল নিস্পন্দ হ্রদবক্ষে প্রতিবিম্বিত মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় অখিল শাস্ত্র দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র কথা প্রতিভাত।" ব্রহ্মচারীবাবা এই দুষ্কর কার্য অতি অবলীলাক্রমে করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় তখনই যখন আমরা একে একে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ প্রণিধান সহকারে লক্ষ্য করি। নিজেকে ধন্য করিবার জন্য আমি তাঁহার দিব্যজীবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে প্রয়াসী হইয়াছি। উপসংহারে তাঁহার অমূল্য পত্রাবলীর একখানি পত্রের আলোচনা করিয়া আমি আজ তাঁহার স্মৃতিতর্পণ সমাপ্ত করিব। আলোচ্য পত্রখানি ব্রহ্মচারীবাবা

পর্যটনক্রমে হৃষীকেশে আগত তাঁহার পর্যটক শিষ্য যোগানন্দের নিকট লিখিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার তিরোভাবের পর তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে আগত যোগদানন্দকে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা যোগানন্দ নাম দিয়াছিলেন।

আলোচ্য পত্রখানি ব্রহ্মচারীবাবা যোগানন্দের পত্র পাইবার পর দিনই লিখিয়াছিলেন। একান্ত অনুগত ভক্তিমান্ শিষ্য সংশয় নিরসনের জন্য গুরুর নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। শিষ্যের সংশয় দূর করিয়া তাঁহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে সহায়তা করা গুরুর পরম কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে ব্রহ্মচারীবাবার ক্ষিপ্রতা লক্ষণীয়।

পত্রখানি ছয়টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। ব্রহ্মচারীবাবা গৌরী আশ্রম হইতে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২১শে জ্যৈষ্ঠ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। পত্রান্তে যোগানন্দের প্রতি ব্রহ্মচারীবাবার আশীর্বাদ বাক্যটি এই —"আশীর্বাদক—তোমাদের একটা পাষাণে গড়া লোক।" বাবা পত্রে নিজের নাম লেখেন নাই নিজেকে একটা পাষাণে গড়া লোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। গৌরী আশ্রম হইতে আগত পত্রখানির এই পাষাণে গড়া লোকটি যে কে তাহা যোগানন্দ বোধহয় বাবার নিজ হাতে খামের উপর লেখা স্বীয় শিরোনাম হইতেই বুঝিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে ঐ পাষাণে গড়া লোকটি তাহার এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের একান্ত আপন জন এবং ঐ পাষাণে গড়া লোকটি নিরন্তর তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছেন। জ্যোতির্ময়-কমনীয়কান্তি ব্রহ্মচারীবাবা কর্তব্য সম্পাদনে স্বকীয় পাষাণের ন্যায় অবিচলতা এবং দৃঢ়তা বুঝাইবার জন্যই নিজকে "পাষাণে গড়া লোক" বলিয়াছেন। শিষ্যকে ইহা দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে তাহাকে তাঁহার উপদিষ্ট কার্য যথাবিধি সম্পাদন করিতে হইবে—এ বিষয়ে কোনরূপ ওজর আপত্তি চলিবে না। মহাকবি ভবভূতি লোকোত্তর পুরুষ রামচন্দ্রকে বজ্রাপেক্ষাও কঠোর এবং পুষ্পাপেক্ষাও কোমল বলিয়াছেন। নিজকে পাষাণে গড়া লোক বলিয়া

বাবা স্বীয় কঠোরতার দিক্‌টিকেই শিষ্যের নিকট পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। পাষাণে গড়া লোকের বিশেষণ অনুকম্পাসূচক "একটি" হইবে কেন, বিতৃষ্ণাসূচক "একটা" হইবে।

পত্রখানির প্রথম অণুচ্ছেদে অসহযোগ আন্দোলনে বাবার সক্রিয় সহযোগিতার পরিচয় পাই। সুবিশাল ভারতবর্ষে তখন মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে। বয়নশিল্পের বহুল প্রচলন হইলে ভারত বস্ত্রে স্বনির্ভর হইবে এবং বিশাল ভারতে বিলাতী কাপড় অচল হইবে। ফলে বাণিজ্যজীবী ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া যাইবে, ভারত স্বাধীন হইবে। দেশের নেতারা ১৩/১৪ জন ছেলেকে বয়ন শিক্ষার জন্য গৌরী-আশ্রমের নিকট প্রতিবেশী নিপুণ বয়ন-শিল্পী মতিরাম নাথের নিকট পাঠাইয়াছেন। বাবা এই ১৩/১৪ জন বয়ন-শিক্ষার্থীর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন গৌরী-আশ্রমে। এজন্য বাবা গৌরী-আশ্রম ছাড়িয়া সিদ্ধাশ্রম বা অন্যত্র যাইতে পারিতেছেন না। তিনি অন্যত্র গেলে ভিক্ষাজীবী আশ্রমে ১৩/১৪ জন বয়নশিক্ষার্থীর মাসের পর মাস আহারের ব্যবস্থা সম্ভব হইবে না। জীবন্মুক্ত বাবা লোকস্থিতি রক্ষার জন্য কাজ করিতেছেন। শ্রীভগবান্ গীতামুখে বলিয়াছেন "সক্তাঃ কর্মাণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত। কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্॥"—হে ভারত (অর্জ্জুন), অজ্ঞানেরা ফলাসক্ত হইয়া যেমনভাবে কাজ করে, জ্ঞানীরা ফলে অনাসক্ত হইয়া লোকস্থিতি রক্ষা করিবার জন্য সেই-রূপভাবে কাজ করিবেন। গৌরী-আশ্রমে বাবা স্বয়ং থাকায় সেখানে আশ্রমের মুখ্য কার্য জনগণের ধর্মশিক্ষণ এবং গৌণকার্য্য বয়ন-শিক্ষার্থিগণকে অন্নদান সুষ্ঠুভাবেই চলিবে কিন্তু "সিদ্ধাশ্রম" চলিবে কিরূপে? সিদ্ধাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেখানে শিক্ষা-কার্য যাহাতে সুনির্বাহিত হয় সেজন্য বাবা ঐ কার্যের ভারবহনের যোগ্য কেদার ও সুশীলকে সেখানে রাখিয়াছেন এবং যোগানন্দের ভ্রাতা যোগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র সেখানে লেখাপড়া করিতেছে।

পত্রের দ্বিতীয় অণুচ্ছেদে অন্তর্যামী বাবা ৺কাশীধামে যোগানন্দ-প্রাপ্ত আদেশ ও তৎকর্তৃক দৃষ্ট স্বপ্নের তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। বাবা লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণই ৺শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বররূপে স্বপ্নে যোগানন্দকে ঐ আদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সে লক্ষ্যে পৌছিবার সোজা পথই পাইয়াছে। সুতরাং হতাশ হইয়া পথহারার ন্যায় অশান্তি ভোগ যেন না করে।

যোগানন্দ হৃষীকেশে যে স্বপ্নাদেশ পাইয়াছিলেন বাবা পত্রের তৃতীয় অণুচ্ছেদে তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বাবা বলিয়াছেন স্বপ্নে যোগানন্দকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে তিনি যেন জগজ্জননীর কোলে শিশুর ন্যায় বসিয়া তাঁহার আদর পাইবার জন্য আবদার করেন, জ্ঞানের পথ অবলম্বন না করেন। ভক্তির পথ সুখের জ্ঞানের পথ দুঃখের। ভক্তির পথের দুঃখ ও তাপ সুমধুর। "কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।" গীতার ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন। ক্লেশোঽধিকতর স্তেসামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতি॥"—যাহাদের চিত্ত অব্যক্তে আসক্ত তাহাদের ক্লেশ বেশী। দেহিগণ দুঃখ পাইয়া অব্যক্তগতি লাভ করে।

পত্রের চতুর্থ অনুচ্ছেদে বাবা যোগানন্দকে বলিয়াছেন—নির্গুণ পরতত্ত্ব কেবল তোমার আমার নহে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেরই জননী। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড-জননীর কোলে তুমি বসিয়া আছ।

বাবা পত্রের পঞ্চম অনুচ্ছেদে যোগানন্দকে কৃষ্ণলীলায় অধিকার লাভের আশীর্বাদ করিয়াছেন। হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধার কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণলীলার অধিকার জন্মে না। "হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব, ভাবের পরমসার নাম মহাভাব। মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী" বাবা বলিয়াছেন ব্রহ্মাণ্ড কোটি জননীর কোলে বসিয়া ভক্তির ডাকে মাকে প্রসন্ন করিলে মা কৃপা করিয়া

যোগানন্দকে মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণীর হাতে তুলিয়া দিবেন এবং রাধাঠাকুরাণীর কৃপায় যোগানন্দ কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। মহামুনি মেধা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুরথ ও সমাধিকে যে তত্ত্ব বলিয়াছেন ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার এই কৃপাপত্রীর পঞ্চম অণুচ্ছেদে যোগানন্দকে সেই তত্ত্বই বলিয়াছেন। "সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি"—প্রার্থনা করিলে সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডজননী প্রসন্ন হইয়া বিজ্ঞান এবং ঋদ্ধি প্রদান করেন (চণ্ডী)। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"—এই সেই বরদায়িনী জগজ্জননী প্রসন্ন হইয়া মানবের মুক্তির কারণ হইয়া থাকেন (চণ্ডী)। যাঁহারা ব্রহ্মচারী বাবার তত্ত্ব জানিতে উৎসুক ব্রহ্মচারীবাবার এই কৃপাপত্রীর ষষ্ঠ বা অন্তিম অণুচ্ছেদটি বিশেষভাবে তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিবে। ব্রহ্মচারীবাবা যোগানন্দের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া উপসংহারে বলিতেছেন—তাঁহার উপদেশের কোন অংশ যদি যোগানন্দের হৃদয়ঙ্গম না হয় তাহা হইলে সে যেন ব্রহ্মচারীবাবার মত ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-দিগের নিকট উহা জানিয়া লয়। ব্রহ্মচারীবাবার এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতির ন্যায় তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছিলেন। এই প্রবন্ধে ব্রহ্ম-চারীবাবাকে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি বলিয়া আমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি ব্রহ্মচারীবাবার এই উক্তিটি তাহার নিতান্ত পরিপোষক। পত্রের অন্তিম বাক্যটিতে বাবা বলিয়াছেন—"আর বিবাহের মত কর্মপাশ আমিই ছেদন করিতে পারি।" বাবা যে কতবড় শক্তিধর পুরুষ এই বাক্যটিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। মা দীনমণির ভক্তিযোগে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিই যে তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—এই বাক্যটী তাহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। এই জগদ্‌গুরুকে, এই মহতোমহীয়ান্ পুরুষকে প্রণাম করিয়া আমার এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধী-সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

শীত, উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত সেই সদ্‌গুরুকে প্রণাম করি যিনি ব্রহ্মানন্দ, পরমসুখপ্রদ, কেবল, জ্ঞানমূর্তি, গগনসদৃশ, তৎত্বমসি প্রভৃতি বেদান্তের মহাবাক্যের লক্ষ্য এক, নিত্য, বিমল, অচল, সকল বুদ্ধির সাক্ষী, ভাবাতীত এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণশূন্য।

——০——

আমার দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারী

শ্রীসুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য

কলির প্রথম অবতার শ্রীকৃষ্ণ; ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীকৃষ্ণ। দ্বাপরের অন্তে কলির আরম্ভ সময়ে তিনি আসিয়াছিলেন জীবমুখী হইয়া ভগবানের পূর্ণাবতার রূপে। পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশ্রীশুকদেব রাস-লীলার প্রথম শ্লোকেই ভগবান ও শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

পূর্ববর্তী তিন যুগে কোন না কোন কার্যোদ্ধারের নিমিত্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবতার আসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই পূর্ণাবতার ছিলেন না। অবতার প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের অংশ ও পূর্ণাদির তুলনামূলক "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" শ্লোকাংশ হইতে স্পষ্টই জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপরাপর

অবতারের মত সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। আত্মারাম হইয়া জীবকে কৃষ্ণমুখী করিবার জন্য জাগতিক সর্বস্তরের লীলাই তিনি করিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্র, সমাজ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, অধ্যাত্ম চেতনা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। কলির প্রভাবে জীব দিশাহারা হইয়া যাইবে বলিয়া মুক্তির দিশারী হইয়া কলির প্রারম্ভেই তিনি আসিয়াছিলেন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য লইয়া। প্রতিজ্ঞাও করিয়া গিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আর এই প্রতিজ্ঞা কালে কালেই ভগবান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

ধর্ম কোন একটি গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে। জাগতিক সর্ব বিষয়েরই একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "সর্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি ভগবদুক্তি ধর্মের বিবিধত্ব নির্দেশ করে। যখন যে রূপে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে তখনই আমরা দেখিতে পাই কোন না কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহারাই সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ত পুরুষের জ্যোতির্ময় বিভূতি বলিয়া মণীষিগণ আখ্যা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের আবির্ভাবে জীবগণ স্বকীয় সংস্কারের প্রেরণায় তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইয়াছে। প্রতিটি জীবের একই রুচি বা সংস্কার থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু তাহারা মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া নিজের রুচি, সংস্কার ও অভীষ্টকে উপলব্ধি করিতে পারে। বিভিন্ন পন্থার পথিক এই একের মধ্যে নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া পায় এবং সংস্কার অনুযায়ী স্বীয় স্বীয় পন্থায় অগ্রসর হইয়া চলে মহাপুরুষের আলোক-বর্তিকায়। জাগতিক রেষারেষি এখানে মেশামেশিতে রূপান্তরিত হইয়া একটি সংঘেরও সৃষ্টি করে।

শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীর জীবনী ও পত্রাবলী পাঠের এবং তাঁহার শিষ্য ও ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাইয়া আমার এই প্রতীতি যে তিনিও ছিলেন সেই মহাত্ম-পুরুষের জ্যোতির্ময় বিভূতি। তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া, তাঁহার প্রেরণা ও নির্দেশনা পাইয়া অনেকে যেমন অধ্যাত্ম পথে অভীষ্ট লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তেমন অনেকে আবার পরাধীনতারূপ ধর্মগ্লানির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল এমন সময়ে যখন ভারতবর্ষের ধর্ম ছিল পরাধীনতার নাগপাশ হইতে দেশমাতৃকার উদ্ধার সাধন। তাঁহার পদপ্রান্তে আশ্রয়ও পাইয়াছিলেন দেশমাতৃকার বহু সন্তান; দিয়াও ছিলেন তিনি অভীষ্টের পথে প্রভূত অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা।

অধ্যাত্ম পথের যাত্রীদের জটিল সমস্যাবলীর সরল সমাধান, অহিংস, এবং অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থন, সমাজ সংগঠন, গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি পন্থায় দেশোদ্ধারের কর্ম প্রচেষ্টায় তাঁহার অবদান পাঠশালার গণ্ডী পার-না-হওয়া শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীর ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্যেরই পরিচায়ক। যে সময়ে স্কুল কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বিরল ছিল না, যে সময়ে স্কুল কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন, যে সময়ে স্কুল কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তিরাই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, সেই সময়ে অগণিত শিক্ষিত ব্যক্তির পথের দিশারী ছিলেন শ্রীশ্রীমাতা ভারতেশ্বরী মহাদেবীর অপার করুণালব্ধ সত্যদ্রষ্টা সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারী। মাত্র বাহান্ন বৎসর বয়সে তিনি নিত্যধামে প্রয়াণ করেন।

—০—

সিদ্ধপুরুষ শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারী স্মরণে প্রণাম

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ—কবিরত্ন

প্রসন্নসলিলা পুণ্যতোয়া সুরধনী যে তীর্থভূমি ভারতবর্ষের ওপব দিয়ে অনন্তস্রোতে প্রবহমানা সেই ধর্ম-সংস্কৃতির পীঠস্থানের বক্ষেই একদিন তপোবন ঋষিদের সাধনালব্ধ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল .ঔপনিষদ্ প্রজ্ঞাবাদ ঃ

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধীমানি দিব্যানি তস্থুঃ।

*　　*　　*

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে-তৎসুধান্তম্
তথাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতর্থো ভবতেবীতশোকঃ

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্)

—হিরণ্যগর্ভেব যে সকল সন্তান দিব্যধামে আছেন তাঁরা শ্রবণ করুন।···যে সুবর্ণাদি পিণ্ড পূর্বে মৃত্তিকার দ্বারা মলিন হয়েছে, তাই অগ্ন্যাদির দ্বারা বিশোধিত হলে যেমন উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পায়, ঠিক তেমনি আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হলে যোগী পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন, কৃতকৃতার্থ ও সর্বদুঃখ মুক্ত হন।

দুর্যোগপূর্ণ অমারাত্রির অবসানে যেমন আসে সূর্যরশ্মিহাস্যোচ্ছল দিবাভাগ, খরতপ্ত নিদাঘের পর যেমন আসে শৈত্যবিধায়ক প্রবল বর্ষণ—তেমনি সুদীর্ঘকাল পরে নব আশা, উদার ধর্মমত এবং সর্বজনীন কল্যাণের অনির্বাণ আলোক-বর্তিকা হস্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন সচ্চিদানন্দ শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী মহারাজ।

স্ব স্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত যখন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশীর্ষবৃন্দ ব্যতিব্যস্ত, তখন ভারতের ধ্যানসিদ্ধ ঋষিদের সার্থক উত্তরসূরী অমৃতবর্ষী কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি কীটাণু পর্য্যন্ত যত নাম ও রূপ সমস্তই এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ভাবিয়া হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগপূর্বক সকলকে সমভাবে ভালবাসিবে। ধর্মের উন্নতিকল্পে সুখ দুঃখ নিন্দাস্তুতিতে অবিচলিত থাকিয়া শান্তি, দয়া, সমতা, সরলতা ও নিঃস্পৃহতা প্রভৃতি সাত্ত্বিকগুণ সকল সহায় করতঃ সত্য রক্ষার জন্যে নিজের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইলেও তজ্জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে।" এ যেন সেই প্রাচীন ঋষিই বলছেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"।

মহাযোগী ভারতব্রহ্মচারীর দুশ্চর তপস্যার লক্ষ্য ছিল পৃথিবীতে ভাগবত জীবন রচনা করা। মানুষের সমষ্টি চেতনার আমূল পরিবর্তন ও নবরূপান্তর সাধনাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রৌঢ়ত্বে আজ আমরা দুটি পথের সম্মুখীন হয়েছি। একটি ধ্বংসের পথ, অপরটি নবজাগরণের পথ। আজ আমাদের, শুধু আমাদের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্মুখে একটি প্রশ্নই দেখা-দিয়েছে ; আত্মঘাতী হানাহানি ছাড়া কি বিশ্বশান্তির স্থায়িত্ব ও বিশ্ব-মৈত্রী লাভের কোনো উপায় আছে ? আজ এই প্রশ্নটি মানব সভ্যতার সামনে বিরাট আকারে দেখা দিয়েছে। শ্রীমদ্ ভারত-ব্রহ্মচারী এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন—"কোন চিন্তা নাই। সন্তানের অপার দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া এবার মা স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এবং জগতের সদ্ব্যক্তিগণের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মীশক্তি প্রকাশ করতঃ শান্তিস্থাপন কার্য্য সম্পাদন করিবেন। প্রতিকূল অবস্থা সকল মায়ের ইচ্ছাতেই অনুকূল হইয়া আসিবে।"

শান্ত, সমাহিত চেষ্টা ও কামনাবিবর্জিত সমতাই যোগীর সম্পদ। শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী যোগী, ঋষি, অলৌকিক তাঁর চিন্তা-

ষ্টি; তাঁর কর্মধারা ধরা দেয়নি সহসা, সাধারণ স্থূলভাবে, সূক্ষ্ম-
রে পাওয়া যায় তাঁর সৃজনী শক্তির অভ্রান্ত স্পর্শ। তিনি যোগ-
লে ভারতমাতাকে জগন্মাতার মূর্তিতে দর্শন করেছিলেন। অন্ত-
র্যামী শ্রীকৃষ্ণের আদেশে আদ্যাশক্তিকে আবির্ভূত করানোর জন্য
মা' নামে মহাশক্তির কঠোর আরাধনায় নিযুক্ত হলে ১৩১৪ সনের
শিব-চতুর্দশী নিশীথে আদ্যাশক্তি মা স্বয়ং ভারতেশ্বরী মহাদেবীরূপে
আবির্ভূতা হয়ে শ্রীমদ্ ব্রহ্মচারী মহারাজকে বলেছিলেন—

"জগতে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য সমুদয় দেবদেবী সমভি-
ব্যাহারে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। এবার দেবতা ও মানবের
সম্মিলনে অপূর্ব লীলা করিব।"

শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারী ভারতমাতাকে যে মূর্তিতে দর্শন করেন তার
এইরূপ—

ওঁ সিংহস্থার্দ্ধ-পদ্মাসীনাং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
রক্তাম্বর-পরিধানাং শ্বেত-কিরীট-শোভিতাম্॥
ত্রিনয়নীং দ্বিভুজাঞ্চ স্মিত-চারু চন্দ্রাননাম্।
অভয়-কর্ত্তরীং-করাং নীলাকাশ-সমপ্রভাম্॥
সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশিনীং সর্ব্ব-মঙ্গল-কারিণীম্।
মহাজ্যোতির্মহাশক্তিং ধ্যায়েত্ত্বমাং মহেশ্বরীম্॥

সিদ্ধমহাপুরুষের যোগ-দর্শন নেতিবাচক নয়—সংসার, সমাজ, দেশ, জাতি, জীব, জগৎ তাঁর যোগ সাধনায় উপেক্ষিত নয়। এ যোগের সার কথা ব্রহ্ম ও জগৎ দুই-ই সত্য, ব্রহ্ম উপলব্ধির সঙ্গে ভাগবতী শক্তির সহায়তায় পৃথিবীর সচ্চিদানন্দময় রূপায়ণ ও মানুষের জীবনে দেবতার জন্ম এ যোগের লক্ষ্য। পরবর্তীকালে শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী মহারাজের ধ্যানলব্ধ জগন্মাতার ভাবমূর্ত্তি এ মর্ত্ত্যধামে পণ্ডিচেরী আশ্রমের 'শ্রীমা'র মধ্যে সমাহিত হতে দেখি।

মানুষের চিন্তা ও কার্য্য সাধারণতঃ সত্য-মিথ্যার গ্রন্থি।

সত্যের অনুভূতি মিথ্যার অনুভূতির দ্বারা আচ্ছাদিত, সত্যের কল্পনা মিথ্যার কল্পনার দ্বারা বিকৃত। এক্ষেত্রে মন যখন শান্ত হবে, চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হবে, তখন প্রকৃতির বিক্ষোভের ওপর নেমে আসবে শান্তি, রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধ চেতনায় ফিরে আসবে শান্ত সমাহিত স্থির বুদ্ধির চেতনা। আর তখন সেই শান্ত চেতনায় সেই স্তব্ধতার মধ্যে ফুটে উঠবে আলো, এবং যে পবিত্র আলোকে বিচ্ছুরিত হবে সব ভ্রম ও প্রমাদ। বিক্ষুব্ধ এই নৈরাশ্যতার অবসান হলেই উর্ধস্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে যোগ সাধনার পরম শান্তি। মানব জীবনের সর্বাঙ্গীণ রূপায়ণে, মানব জাতির উর্ধায়ণ, যুগের সন্ধিস্থলে নরদেহধারিণী দিব্য-দিশারী 'শ্রীমা' মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে মহাবিজয়ের শুভ সূচনার অপেক্ষায় অরুণ-শঙ্খ বাজিয়ে চলেছেন। এ মহাজাগতিক চেতনায় দেশের যুবসমাজকে সচেতন হয়ে শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীর অধ্যাত্ম সাধনার বার্তাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের তপোবলকে উদ্বুদ্ধ করে বিশ্বমাতার সর্বাংগীন বিকাশের পথ উন্মুক্ত করাই ভারতের অন্তর-পুরুষের অভিপ্রেত।

সিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারীর আবির্ভাব স্মরণের এই পুণ্যলগ্নে, হে পথিক! হে স্বদেশ প্রেমিক! চক্ষু উন্মীলন কর, কর্ণ সজাগ কর। তাঁর অমোঘ বাণী তোমার ও আমাদের সকলের অন্তরের মর্মস্থলে প্রবেশ করুক। তাঁর আশীর্বাদ সহস্র ধারায় আমাদের উপর বর্ষিত হোক। ভারতমাতার অনন্য মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে আমরা যেন ত্যাগ ও সেবাব্রতে দীক্ষিত হয়ে একযোগে জীবনপথে এগিয়ে যাই।

—০—

শ্রীমদ্‌ ভারতব্রহ্মচারীজীর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে

শ্রীমৎ অনির্বাণজীর বাণী

শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীজীর অনুভব এবং বাণীতে ভারতেরই মর্মবাণীর স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। যাঁরা সত্যান্বেষী, এ-বাণী নিশ্চয় তাঁদের উদ্বুদ্ধ এবং উদ্দীপিত করবে।

—অনির্বাণ

শ্রীভারত জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

শিবাজীর গুরুদেব রামদাস ছিলেন যেমন,
সেইরূপ গুরু এক শ্রীভারত ব্রহ্মপুত্র-তটে ;
ভারতমাতার মূর্তি প্রাণবন্ত গারো-গিরি-পটে,
উনিশ-শো-সাত সালে ধ্যানে মাতা দিলেন দর্শন।
অরবিন্দ পরবর্ষে সেই দেশে করিয়া গমন
স্বচক্ষে দেখেন জেলা-সম্মিলনে যাহা কিছু ঘটে,
জাগিল যৌবন যেন ঘুমন্ত সায়রে পদ্ম ফোটে,
স্বাধীনতা সৌররশ্মি সর্ব অঙ্গে করে আহরণ।

জন্মস্থান জগদল, লক্ষ্মীয়ার সিদ্ধাশ্রম ঘর,
বৈরাটির গৌরীধাম, মালনীর চিত্রধামে জ্বলে
তোমার স্মৃতির শিখা, উচ্চারিত সেই কণ্ঠস্বর ;
—সেই আলো, সেই বাণী কাজ করে সব মর্ম্মতলে।
তোমার পায়ের চিহ্ন নবদ্বীপ পুরী রামেশ্বর
কাশী ও প্রয়াগ আর বৃন্দাবনে আজো কথা বলে।

ভারতব্রহ্মচারীজী স্মরণে

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

প্রণমি তোমারে ভারত ব্রহ্মচারী !
মুক্তিভাবনে ভাবলোক ভরি'
তুমি যে মূর্ত্তিধারী ।
তুমি এসেছিলে সংসারলোকে
মানবজীবনে দুখে আর শোকে
কভু সুখছায়া কভু মধুমায়া
গিয়াছে তোমায় ছাড়ি'
ভারত ব্রহ্মচারী ।

ধর্ম্মপথের হে চির পথিকবর
মিথ্যা ত্যজিয়া সত্যের ভরে
বাঁধিতে পরস্পর
আজীবন তুমি খুঁজিয়াছ পথ
পুরাইতে তব প্রিয় মনোরথ
ধর্ম্মে কর্ম্মে আপন মর্ম্মে
তুমি যে স্বয়ম্ভর,
হে চির শুভঙ্কর ।

ভক্তজনের নিত্য আকুতি লভি
আত্মসমর্পণের মন্ত্রে
ঈশ্বরে অনুভবি'
এসেছে তোমার মুক্ত দুয়ারে
পেয়েছে তাদের প্রাণ-উপচারে
ভক্তি উছল নয়ন যুগল
উঠিয়াছে আজ দ্রবি'
হেরি উজ্জ্বল রবি ।

এই ভারতের শুদ্ধ চেতন দিয়া
গীতা বেদ আর উপনিষদের
বাণীর মন্ত্র নিয়া
কত না ভক্তে দিয়াছ দীক্ষা
মনোবাসনার মিটাতে ভিক্ষা
তারা প্রবুদ্ধ পরম শুদ্ধ
আলোকে উদ্ভাসিয়া
উঠেছে উজ্জ্বলিয়া।

মহাভারতের মহর্ষি তুমি ছিলে
কত পাপী তাপী আর মূঢ়জনে
আলোকের দিশা দিলে।
পরশমণির পরশ লভিয়া
স্বর্ণ ঝলকে উঠি ঝলসিয়া
কত না জীবের সারা জীবনের
বেদনা হরিয়া নিলে;
নিজেরে সমর্পিলে।

তব জনমের শুভ শতাব্দী ক্ষণে
অযুত প্রাণের পুণ্যচেতনে
বাঁধিতে সর্বজনে
তব করুণার ক্ষীণতম কৃপা
মনোলোক ভরি' আলোকের বিভা
করিয়া দীপ্ত করেছ তৃপ্ত
প্রেমের উৎসরণে
জীবন সমর্পণে।

বিপ্লবী গুরু

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের মৈমনসিং চির পবিত্র ধাম
'ভারতব্রহ্মাচারীর জন্মভূমি।
বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ধন্য চন্দ্রনাথ
ভারতব্রহ্মাচারীর চরণ চুমি'।
নবদ্বীপের মাটি, কালিঘাট, পুরী ও রামেশ্বর
গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন—
ভারতব্রহ্মাচারীর চরণ-চিহ্ন অঙ্গে ধ'রে
নিরবধিকাল করবে তাঁকে স্মরণ।

মুসলমানের রান্নার ভোগ শালগ্রামকে দিয়ে
আর সে প্রসাদ নিজেও গ্রহণ ক'রে
জাতের সকল বজ্জাতি ভেঙে এই বিপ্লবী গুরু
হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী গড়ে।
তাঁর সাধনায় শালগ্রামেই জাগে ভারতেশ্বরী—
বৈষ্ণব আর শাক্তের সঙ্গৎ
তাঁর 'আনন্দমঠে' সকলেই বৈষ্ণব গোস্বামী
এবং শাক্ত সন্তান যুগপৎ।
তাঁর আশ্রমে সম উৎসাহে কীর্তন করা চলে
'হরে মুরারে' ও 'বন্দে মাতরম্'।
ভারতেশ্বরী ভারত-জননী, তাঁর বরাভয় কর
বিশ্ববাসীর আশ্রয় উত্তম।

—০—

নেপথ্য সারথী তুমি

(উৎসর্গ : শ্রীভারত ব্রহ্মচারী)

পরিমল চক্রবর্তী

নেপথ্য সারথী তুমি। 'মানুষের জীবন-আহবে
সবাই অর্জুন হ'বে'—এ-রকম প্রচণ্ড দুরাশা
পোষণ করি না আজো ; করিবার মতন সাহস
যথেষ্ট সঞ্চিত নেই দ্বিধা-দীর্ণ বক্ষের পঞ্জরে—
যেহেতু মানুষ আজো মানুষের হৃদয়ের ভাষা
অধিগত করে নাই অস্তিত্বের বিপন্ন প্রহরে ;
যেহেতু মানুষ আজো মানুষের অস্থি-মজ্জা-রস
ক্ষয় ক'রে আত্মমগ্ন আত্মঘাতী ঘৃণিত রৌরবে।

অথচ আশ্চর্য লাগে যখন তোমাকে ভেবে-ভেবে
তোমার জীবন-বীক্ষা আমারো জীবনে জেগে ওঠে
ধ্রুবতায় সত্য হয়ে, যখন তোমার মহাবাণী
আমাকে বজ্রের কণ্ঠে হাঁক দেয় ; (যেন বা ঈশানী
ঝড়ের প্রমত্ত বেগ ঈক্ষণের অক্ষৌহিণী স্রোতে
আমাকে নিক্ষেপ করে দ্বন্দ্বাবর্তে, অসুর ও দেবে।)

—০—

"ভারতেশ্বরী" বন্দনা

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভারতবিখ্যাত যোগীবর বারদীর বাবা শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রশিষ্য ময়মনসিংহবাসী সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারী বাবার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাহার শিষ্যগণ সমবেত হয়েছেন,—ইহা আমাদের অতীব আনন্দেব ও অভিনন্দনের উপযুক্ত ঘটনা। এই উপলক্ষে পণ্ডিচেবীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের লোকপ্রিয় শিষ্য যোগানন্দ ব্রহ্মচারী কলিকাতায় এসেছেন। ইহাও আমাদেব আনন্দকর বিষয়। যোগানন্দ বহু বৎসর পূর্বে ভারত ব্রহ্মচারীর শিষ্যরূপেই যোগদীক্ষায দীক্ষিত হন। পণ্ডিচেরীতে তাঁহার স্থায়ী বসবাস হওয়ার সময় শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর প্রথম গুরু ভারত ব্রহ্মচারী এক বিশেষ যোগী ও সাধনার বিষয়ে একটি দিকে অন্ততঃ তিনি শ্রীঅরবিন্দের আদর্শই অনুসরণ করেন।

ভারত ব্রহ্মচারী যোগসাধনায় বারদীর লোকনাথ বাবার পথ ধরলেও তিনি জগৎজননীর যে বিশেষ স্বরূপ ও রূপ দেখেছিলেন তা হল জগন্মাতার ভারতেশ্বরীর দেবী রূপ কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতির ন্যায ভারতেশ্বরী দেবীও জগন্মাতার একটি বিশেষ প্রকাশ। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র শতাধিক বৎসর পুবে এই দেবীরূপের দর্শন লাভ করেন এবং 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রকাশক সর্বপ্রথম ঋষি বঙ্কিমই ছিলেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্কিমের ঋষি দৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে জগত ও ভারতে ভারতমাতার যথার্থ আদর্শরূপ প্রচার করেন তাহার পরেই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। এবং এই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিম-প্রদত্ত 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের সাধনায় নিজে সিদ্ধিলাভ করে এই সাধনা সবাইকে দিয়ে গিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ অনুযায়ী ভগবতীর চার প্রকার প্রকাশ ও রূপ

হল—(১) মাহেশ্বরী, (২) মহাকালী, (৩) মহালক্ষ্মী ও (৪) মহাসরস্বতী। শ্রীঅরবিন্দ জগন্মাতা ভগবতীর এই চার প্রকাশ ও রূপ ভারতমাতা বা ভারতেশ্বরীর মধ্যে দর্শন লাভ করে ভারতকে শুধু আদর্শ দেশ বলে নয় ভারতকে জগন্মাতার এক প্রধান বিকাশ রূপে বর্ণনা করেছেন। ভারত ব্রহ্মচারী তাঁর সাধনায় ও ধ্যানে ভারতের মঙ্গলকামনায় ব্রতী ছিলেন। ভারত ব্রহ্মচারীর শতবার্ষিকী এ দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের আদর্শ যথোচিতরূপে উন্নীত করবে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভারতের সকল নেতাগণ যে সত্য দেখতে পতেন আজ-কালকার তরুণ সম্প্রদায় সেই আদর্শের প্রতি অনেকটা বিমুখ হয়েছে। ফলে ভারতের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই। তরুণ সম্প্রদায় যখন এ বিষয়ে অবহিত হবেন এবং ভারতকে শুধু একটি দেশ না ভেবে জগন্মাতার রূপজ্ঞানে বোধ করিবেন তখন ভারতের সুদিন আসবে। এজন্য ভারত ব্রহ্মচারী বাবার শিক্ষা দীক্ষা সকলেরই চিরস্মরণীয়। ভারতবাসীগণ ভারতেশ্বরীর যথার্থ ভক্তরূপে, দাঁড়াবে। তাদের উদ্‌যোগে শুধু ভারতের দুঃখ দূর হবে তাই নয় জগতে চিরশান্তির প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হবে।

শ্রীশ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারী মহাত্মন্ স্মরণে

শ্রীমোহিনীমোহন শাস্ত্রী

মহাভাবে বিভাবিত মহান্ মানব,
ভারত ব্রহ্মচারীরূপে বিশ্বের বৈভব।
বারশ একাশী সনের বারই শ্রাবণ
রামরতন ভবনে সুতরূপে হন।

দেবী দীনমণি গর্ভে সাধনার বলে,
পবিত্র করিতে জীবে উদয় ভূতলে।
বাল্যকালে নারায়ণ অর্চনা করিত,
তন্ত্র মন্ত্র জানিত কি ? ভাবে সমচিত্ত।

না করিয়া শিক্ষা দীক্ষা, পরাবিদ্যা বলে
জড়াবিদ্যা পরিহরি দিব্য জ্ঞান পেলে,
সদ্‌গুরু কল্পতরু সর্ব ফল ধরে
যে-বা যাহা চাহে তাহা প্রদানিতে পারে।

মহাগুরু কৃপাবলে মহাত্মন্ হন ,
জগজন ধন্য তরে ধরায় আগমন।
ব্রহ্মে যিনি নিত্য র'ন তিনি ব্রহ্মচারী,
অখণ্ড মণ্ডলাকারে গগন বিহারী।

---

*বারদীর শ্রীশ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারী
পবিত্র হইল বঙ্গ পাবন কৃপায়,
নাম পরিমল-রেণু সকলে বিলায়।
নব ভাবধারা জীবে, নব চেতনায়,
নিরুপম নির্মলতা তাহে শোভা পায়।

ত্যাগের প্রতীক ছিলেন তপনিষ্ঠ বলে,
তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি বিদিত সকলে।
আত্ম চেতনায় দীপ্ত, উন্নত হৃদয়,
সমজ্ঞানী সুখে দুঃখে আজীবন রয়।

সত্য শুদ্ধ মুক্ত চিত্ত নির্লিপ্ত নির্গুণ,
শাশ্বত শৌর্য সম্পদে রঞ্জিত জীবন।
অভিমান শূন্য দীন তৃণাদপি ভাব,
জীবে দয়া নামে রুচি উদার স্বভাব।

এমন দরদী ভবে আর কেহ নাই,
গুরুরূপে অবতীর্ণ যেমন নিতাই।
তাঁহার পবিত্র দিনে নিষ্ঠ ভক্তগণ,
স্মৃতি-তিথি মহোৎসবে ধন্য প্রাণমন।

যুগ প্রয়োজনে যুগাচার্য শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারী

শ্রীনিশিভূষণ দত্ত রায়

আমাদের গ্রামের পরম বৈষ্ণব ভক্ত রাধাবরণ গোঁসাই তাঁহার ভগ্নীর বাড়ী আসুজিয়া গ্রাম হইতে আসিয়া আমাদিগকে এক অপূর্ব সংবাদ দিলেন। আসুজিয়া নেত্রকোণা সাবডিভিসনের একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম। শুভ সংবাদটি এই—তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "এবার একজন প্রকৃত মহাপুরুষের সঙ্গ পাইয়া পরম কৃতার্থ হইয়া আসিলাম। উনি সাধারণ সাধু নহেন, অতি উচ্চস্তরেব সাধক, সিদ্ধ মহাত্মা, কীর্ত্তনে অপূর্ব ভাবাবেশ হয়।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম সাধু মহাত্মার নামটি কি? উত্তরে তিনি বলিলেন—"শ্রীমদ্‌ভারত ব্রহ্মচারী, বড়ই মধুর! বড়ই বিনয়ী পরম বৈষ্ণব বটে!"

মহাত্মার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই তাঁহাকে পাইতে, তাঁহার বিষয় জানিতে, সঙ্গ করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। মহাপুরুষের খোঁজ খবর নিতে খুবই প্রয়াসী হইলাম। খোঁজ নিতে নিতে জানিতে পারিলাম পার্শ্ববর্তী গ্রাম কাঁঠালতলীর উপেন্দ্র রায়, রজনী সরকার, অতুল দে প্রভৃতি মহাপুরুষের কৃপা পাইয়া সাধন ভজন ও কীর্তনাদিতে মাতিয়া উঠিয়াছেন। রজনী সরকার আমার সহপাঠী ছিলেন—বিশেষ বন্ধুলোক। আমাদের গ্রাম গাচিহাটা হইতে কাঁঠালতলী মাত্র মাইল খানেক পশ্চিম দিকে। ঐ গ্রামে যাইয়া উহাদের নিকট মহাত্মাব বিষয়ে অনেক কিছু জানিলাম। তাহারা বলিলেন, এই মহাত্মা ভারত

---

*৮৭তম আবির্ভাব তিথিউৎসবে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

বিখ্যাত মহাযোগী বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার প্রশিষ্য। নিজেও দীর্ঘ তের চৌদ্দ বৎসর কাল অতি কঠোর ভাবে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার কৃপা পাইয়া আমাদের জীবন ধন্য, কৃতার্থ বোধ করিতেছি। সহপাঠী ভাই রজনী সরকার আরও বলিলেন, সত্বরই আমরা কয়েকজন আপনাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা ও কীর্তনাদিতে যোগাযোগ করিব স্থির করিয়াছি।

আমাদের গাচিহাটা গ্রামে একটি কীর্তনীয়া দল দীর্ঘকাল যাবৎই ছিল। তাহাতে ছিলেন আমার খুল্লতাত দাদা, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত রায় (নিদাম সাধু), আমার ভাতিজা শ্রীবিধুভূষণ দত্ত রায়—গোস্বামীপ্রভুর পুত্র পরম ভাগবত শ্রীশ্রীযোগজীবন গোস্বামীজী হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত, এবং আমি নিজে গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ব্রজভাব সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীশ্রীময়ূর মুকুট মহারাজ হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত। আমাদের গ্রামের বৈষ্ণব গোস্বামী বংশের বড় কীর্তনীয়া ও খোলবাদক—বঙ্কু বিহারী গোস্বামী, মুকুন্দ গোস্বামী, রাধারমণ গোস্বামী, মথুর গোস্বামী প্রভৃতি এই কীর্তনের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাঁঠালতলীর শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী বাবার শিষ্য ভক্তবৃন্দ যোগদান করায় আমাদের কীর্তনের দল খুবই একটি নামজাদা কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। ক্রমে বনগ্রাম, সহগ্রাম, ধুনাদিয়ার ভক্তগণও এই দলে যোগদান করিলেন এবং নানা উপলক্ষ্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এই কীর্তন সম্প্রদায় সুমধুর কীর্তন-রসধারা পরিবেশন করিয়া জনসমাজে সবিশেষ সমাদৃত হইল।

এদিকে আমরা সেই মহাত্মার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া দিন কাটাইতেছি এমন সময় একদিন হঠাৎ উপেনদার চিঠি নিয়া একজন লোক আসিল। চিঠি পড়িয়া জানিলাম মহাপুরুষ কাঁঠালতলীর উপেনদার বাড়ীতে আসিয়াছেন। কি শুভদিন আমাদের! ভাতিজা বিধুভূষণকে নিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা হইলাম।

উপেনদার বাড়ী পৌঁছিলে তিনি আমাদের মহাপুরুষ যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে নিয়া গেলেন। কী অপূর্ব গৌরকান্তি! দেখিয়াই আমাদের অন্তর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; সুদীর্ঘ ঋজুদেহ, আজানুলম্বিত ভুজযুগল, প্রশান্ত বদনে স্মিত হাসি! আমাদিগকে দেখিয়াই আসন হইতে উঠিয়া যেন কত আপন জনের মত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আমাদের দুইজনকে এক সঙ্গে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপুরুষের শীতল অঙ্গ স্পর্শে আমরা যেন ভাবে বিহ্বল হইয়া গেলাম—ভাবাবেগে কোঁকাইয়া কোঁকাইয়া কান্না আসিতে লাগিল। মহাপুরুষেরও ভাবাবেগে দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। কী সুশীতল সুখ-স্পর্শ! ধন্য মানিলাম নিজেদেরে। মহাত্মার নিকট পরিচয়ের প্রয়োজন নাই, অন্তরের বস্তুই পরিচয় দেন. নিজ করুণা কৃপায় গ্রহণ করতঃ নিজ অন্তরের মধুরিমা ঢালিয়া দেন।

কতক্ষণ এভাবে কাটিল জানিনা, তবে মনে হয় বেশ কতক্ষণ ভাবাবেশ প্রশমিত হইলে কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া সাধন ভজন সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে কি না জানিতে চাহিলেন। মহাত্মাদের এই তো রীতি—প্রধান জিজ্ঞাসাই তো সাধন ভজনের কথা।

সেদিন আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মচারিজীর যে শক্তির মিলন ঘটিয়াছিল এবং সে শক্তির জোয়ার যুগধারায় দেশে দেশে যে প্লাবন ঘটিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়—তাহা ক্ষণস্থায়ী নহে, চিরস্থায়ী, স্থূলদৃষ্টির গ্রাহ্য নহে, অতি অপূর্ব অলৌকিক অন্তরের বস্তু!

যুগাচার্য শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারিজীর সাধনার মূলগত বীজ তাঁর পরমগুরু ভগবান শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ হইতে প্রাপ্ত—যিনি তৃতত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করত ষড়ৈশ্বর্যে ভগবানত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—যিনি কঠোর তপস্যালব্ধ বস্তু যাহা গুহায়িত ছিল তুষার ধবল বিরাট হিমালয় তাহা ভগীরথের মত ভক্তিগঙ্গা ধারায় প্রবাহিত করিয়াছিলেন জীবকল্যাণে সমতলের অনুর্বর ক্ষেত্রে।

এই দিনে আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মচারী-শক্তির যে মিলন ঘটিয়াছিল—ভাবধারায় যে প্লাবন আনিয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশক্ষম না হইলেও অন্তরের বস্তু চিরকাল অন্তরে চিদানন্দঘন আনন্দ সঞ্চার করিবে।

করুণাসাগর

রাণা বসু

দাপানো ঝাপটানো নিষ্ঠুর সেই পাপীর কথা মনে পড়ে
জীবনের পড়ন্ত বেলায়
ভয়ার্ততার বেদনায়
যে কাঁপতে কাঁপতে
তাঁর কাছে স্থিরচক্ষে করজোড়ে বলেছিল :
প্রভু, আমার সব অন্যায় ক্ষমা করুন ॥

অন্যেরা ঝলকিয়ে বলেছিল :
ওকে ক্ষমা!

আনন্দময় পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা ভুলে
সন্তানস্নেহে ক্ষমাপ্রার্থীকে আপন বক্ষপুটে স্থান দিয়েছিলেন
করতলে মুখ লুকিয়ে
অশ্রুপাতে সে শীতল হয়েছিল ॥

চোখ দুটোয় তার আশা-আশ্বাসের আলো জ্বলছিল।
সূর্যের কাছে অপরাধী-হৃদয় গচ্ছিত রেখে
অনুশোচনায় সে টুকরো টুকরো হচ্ছিল ॥

তাঁর সর্বাঙ্গে চন্দনের সুবাস,
চোখে প্রগলভ বিস্ময়,
মুখমণ্ডলে তিন ভুবনের ছবি।
আলোর অরণ্যে পরাজিত নায়ক চৈতন্যের প্রত্যূষে
প্রশান্তকণ্ঠে এই মধুর আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেছিল :
প্রভু, তুমি সত্যই করুণাসাগর ॥

শ্রীশ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী বাবা স্মরণে

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীযোগানন্দর একান্ত অনুরোধ ক্রমে আমাকে শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারী বাবার শত বার্ষিকী জন্মোৎসবের জন্য তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কয়েকটি মাত্র কথা লিখছি। ব্রহ্মচারী বাবাকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে ময়মনসিংহ জেলায় আমাদের যুগান্তর দলের বহু বিস্তৃত কর্মীদল মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মচারী বাবার শিষ্য কিম্বা ভক্ত হয়েছিলেন। ১৯২১ সন থেকে ব্রহ্মচারী বাবাকে জানিবার সুযোগ বেশী হয়েছিল। ময়মনসিংহ জেলায় কংগ্রেস কমিটি ভারত ব্রহ্মচারী বাবাকে তাঁত ও চরকা প্রচলন কার্যে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দান করেছিল।

MISSION & MESSAGE OF THE HOLY SAINT

Sri Sri Bharat Brahmachari

Dr. K. K. Sengupta

Srimad Bhatat Brahmachari attained the acme of perfection in yoga-sadhana and dedicated his life entirely to the cause of ethical and spiritual upliftment of his countrymen.

He carefully absorbed and mastered the teachings of the Vedas the Puranas and Tantras and applied them in his yoga-sadhana.

Thus he shook off the shackles of bondage and worked out the salvation of his own soul.

Yet he had the head and heart of a true national patriot and never remained indifferent to the problems of his country's political servitude.

I had never had the good fortune of his holy company but had the privilage of intimate association with Sri Purnendu Bhushan Datta Roy who edited the souvenir of his 88th birth anniversary and gave me access to the available literature on his life and sadhana, his teachings and activities for the good of his country and countrymen groaning under the jack boot of British sovereignty. I was deeply impressed with the study and wrote an article in the same souvenir,—which has revealed in fair details the part he played in the social, religious and political environs of the time. He mixed intimately with the masterminds who, with their subtle scientific and persuasive approaches, shaped and moulded the mass-mind to work out the country's political liberation.

In Sadhana India's approach, in the past, has always been one of intense and prayerful devotion.

She prayed—'Abirabir-ma-Edhi'—O Supreme power, reveal Thyself before us'—'Tamaso-ma-jyotirgamaya'—Lead us,

kindly Light, from darkness to spiritual illumination. Divine power has also fulfilled its assurance to descend and fight for deliverance from all hostile forces of Evil. The Divine Mother said in the Chandi-"Tatha-tatha abatirjyaham Kari-shamyari-Sankhayam".

History testifies to the fact that in moments of the country's crisis and cataclysm—God has sent his inspired messengers and emissaries such as Ramkrishna, Vivekananda, Rabindranath, Aravinda, Bijay Krishna, Bankim, Lokenath-Balananda and Bharat Brahmachries, Keshab Chandra, Ashwini Kumar, Deshabandhu, Lal-Bal-Pal,Surja Sen, Besant, Sarajini, Pritilati Malangin, Mahatmaji and Netaji. Loknath Brahmachari was the direct spiritual guide of Bharat Brahma chari Baba's Gurudeva—Abhaya charan of revered memory.

They made their foundation formidable and built their natural and political structure on the hard rock of Vedanta—which they transplanted from the solitude of forest to the crowded courtyard of city life

"Abhih"-or 'Fear not' was the great inspiration tha Rabindranath gave to our valiant youth in his 'Bandi Beer' (A Sikh hero in captivity)—'Rey putra Bhai nahi"—or "Never fear my son' and gave him the final 'Coup de grace'. The boy kissed the ground—shouting-'Gurujir-jai'—or Victory to the Cause of the master'. Many tender aged Kshudirams kissed the hangman's rope and hailed and unfurled the flag of National Victory.

Our great country, with her oldest civilization and large population was so long held under the sway of a small island-for want of cohesion and integration, arms and ammunition, leadership and command. We were steeped in ignorance and superstition.

Inspite of our pride in our ancient culture, we were blind and bigoted and burnt our 'satis' on the funeral, pyre, sacrficed living children and threw them into the estuary of the

Ganges, and cast out the major portion of our population as untouchables and cut them entirely out of the body politic of our society.

It is the great sons of India like Bharat Brahmachari and others named above that gave us light, removed the prejudices and superstition to a considerable extent, so that the people at last could feel like a nation and present a united national front against the foreign govt. and ask them to 'quit India' peremptorily in 1942.

Bharat Brahmchari was not one of those who used to teach and preach merely from the pulpit and the platform. He actually practised himself in his daily life, what he taught and inculated. His life was his message and he was himself a prototype of the Acharya as defined in the sloka--Achinoti cha shtrarthang

Achatey sthapayatyapi
Swayang acharatey chaiba
Acharyah sa prakirtitah.

He is a true Acharya or Spiritual preceptor,—who explains not only the letter but the spirit of the scripture,—adopts the teaching of scripture in his own personal life an habits. They are impostors--who preach one thing and practise another. Who shamefacedly say—'do what I say,--do not what I do'—who claim to belong to the previlaged class and have a licence for themselves from the rigours of ethical rules. Sastras say that what is offered to God should be considered not as ordinary food but as a sacred and sanctified article of food.

Once it so happened that he was given alms from a Muslim village. He offered them to God and while going to eat them as 'prasad'—or 'sacred offering',—he found particles of fowl meat mixed in them. He took them without the least scruple although he was very pure and selective in his food habits.

Purnendu Bhushan has shown with scholarly exposition how in his series of epistles, Brahmachari Baba has unfurled and opened, petal by petal, the thousand petalled lotus of his own life and wafted its perfume for the elevation and edification of the people in general and his disciples in particular and has dispensed fulfilment and joy, bliss and beautitude to those who flocked round him in their eagerness to learn the subtle truths of yoga and Vedanta.

He has proclaimed loudly to the people that to appear before the tribunal of God—no advocate or solicitor of priest-like intermediary is required. This is a most significant and unsophisticated proclamation from an unprejudiced and catholic mind who had the courage and sincerity of one who had a first hand experience of God's own revelation

The Gita unequivocally speaks of Him as "Sarbatah pani padang tat sarbatokshi—siromukham" and the Vadas describe Him as "Sahasra sirsha purusha sahasrakshah sahasrapat". Which mean that God is both immanent and transcendent in the universe. His hands and feet, eyes, head and face are present every where—viz. every particle of His creation,—which He created by Himself and out of Himself and yet retains His own Supreme and Transcendent Individuality. He can be approached and realized by the sincerest form of self-dedication and prayer.

He established quite a few ashrams, with temples and forms of the Supreme God Father or Maheswar and God Mother—His Sakti or attribute as Bhagabati. It is easier to comprehend the Infinite God in His Finite and limited configuration as icon or image. For,—'to think' is 'to condition'—the object of contemplation within the limits of our senses and sensorium.

God the Father and God the Mother are one and the same —as an object and its specific quality are one and inseparable. For example Fire and its heat,—Milk and its whiteness,—ice

and its coldness are always unified and inseparable. They are not a 'summation'—of one plus one making two', but a 'multiplication' making one into one as one and only one, without antagonizing the philosophy of Monism,—non-dualism, Unitarianism or monotheism—of Vedanta, Theosophy, or Religious philosophy. Once He is realized in the Finite form. He can be realized in His Infinite form. He is one as Creator but He is manifest in many multiple and infinite forms in His Creation. So the Gita says—'Ekatwen prithaktwena bahudha vishwatomukham —(Gita 9/15).

The icon or image of shape and form, as in our Indian conception of image worship, is not a fragile idol at the mercy of iconoclasts such as Aurangzeb or Kalapahar. They represent abstract attitudes and attributes of Divinity—depicting Him—as Father or Mother,—Lord or Beloved—with mercy, affection—renunciation—and love in concrete shape and form.

They are for ever ensconced in the heart of the devotees and cannot be destroyed as the Greek pantheon has been annihilated for want of a devotional philosophy that could be reconciled to the highest philosophy of Vedantic Monism

Gita has clearly pointed out that it is easier to comprehend the Infinite in the Finite form of worship. For 'Klesho-dhikatarastesang abyaktasakta chetasang.

Abyakta hi gatir dukkhang deha badbhirabapyatey"

(Geeta 12/5)

It is far more difficult for the untrained and unsophisticated mind to comprehend Him as an Absolute and Infinite Being defying all definition and qualifying attributes.

Brahmchari Baba has also preached Sri Chaitanya's cult of Nam Sankirtan and its great utility and application in universal prayer and devotion,

The Name of God is the same as God Himself and the

most direct means of communion and contemplation of Brahma or the Infinite Being.

As all the rivers of the world pour forth their contents into the reservoir of the Ocean, so all forms of prayers from people professing all faiths and religions meet in Him as we find it in the Mahimna stotram—

"Nrinang eko gamyas wamasi
payasam arnaba iba".

He was at once an active Karma yogi and an ascetic who renounced the world and all earthly possessions.

He used to work in a detached and selfless manner only for the good of his countrymen—their social, and spiritual upliftment and national integration

He was not content to work out and attain his own spiritual salvation but shared the sorrow and suffering of his erring brethren and wanted to have a share in their suffering as well, so that their own load of suffering might become less.

He was the friend, philosopher and guide of all who happened to come in contact with him.

To help his indigent neighbours to earn their bread and feed their hungry ones he founded weaving and spinning schools and established in 1921 the Bharat Samaj on the basis of liberal principles of hummanism-regardless of all distinction of caste, creed, community or religion.

In his temples, the symbols of Shakti Murti such as Durga, Lakshmi, and Saraswati were worshipped as well as the Vaishnab Symbols of Lord Krishna and Radha His eternal companion.

He cooperated with the Indian National Congress for rural upliftment works. His disciple Sri Kumudananda was placed in charge of the journal 'Satyajugakur' and Sri Joga nanda wrote books and bulletins on the Congress and rural reforms.

Ajapananda edited the journal 'Sonar Bharat' in 1926—establshed the Matribhandar to help the young wage-earners to scrape up an income by the sweat of their brow.

He shuffled off his mortal coils in the same year 1926 (1333 B S.) on the 14th September,—the holy day of Radhastami.

BHARAT BRAHMACHARI

Bharat was a man.
He became a God-Man.

John the Baptist proclaimed
The earth-pilgrimage
Of the Christ, the Compassion-King.

Bharat Brahmachari
In his own inimitable way
Became the supernal announcer
Of the human form
Of God the Mother
On the southern shore
Of Mother India.
Anol directceod his direct
Disciple-leaves
To place them selves
At the hallowed Feet of the Mother Divine.
The life-Reality
Of the ever-blossoming
And
Ever—transcending Beyond.

Mother Bharatavarsha
Through her son Bharat
Triumphantly smiles.

A TRIBUTE FROM SAN FRANCISCO

It is a great pleasure to have this opportunity for paying my homage to the hallowed memory of a great spiritual leader of Bengal—Srimad Bharat Brahmachari Baba. My sincere thanks are due to my friend and gurubhai Swami Yogananda for kindly inviting me to participate in the fsetival of Dharma yajna—thankful self-giving to the eternal truth for the earth's continuous spiritual nourishment through the agency of illumined gurus,

My personal destiny as determined by the Divine will brought me to San Francisco twenty-three years ago. Ever since I have been engaged in spreading the light of Indian culture. Our **San Francisco Ashram** serves the light of sanatan dharma two thousands or spiritual seekers. Our **East-West Research Center** focuses on in-depth research in incorporating the latest discoveries in modern science, psychology, psychotherapy and international politics into the all-comprehensive and nondualistic framework of the spiritual tradition of India. Our **California Institute of Asian Studies** awards the degrees of MA and Ph.D for original and creative research for historically relevant syntheses of the highest cultural values of East and West. Many of our ex-students are now teaching at different colleges and universities across the United States.

With the passing of the years my joyful communion with the evolving spirit of Mother India has reached many new depths of thrilling insight. With perfect clarity of vision, I see where India's unique contribution to the march of world civilization lies.

God has chosen different countries for specialization and perfection of expertise in different areas of human evolution and cosmic value. For instance, Germany has been specializing for centuries in the field of thorough scientific research and metaphysical speculation. England, France and other European countries have played a historical role in unifying divergent peoples of Asia and Africa into the creative dynamism of historical consciousness. The United States has been specializing in modern times in technological revolutions and large scale business enterprise, The USSR has been engaged in integrating occult and secular power and thereby in perfecting her international role as the champion of the masses of the people, especially of Asia, Africa and Latin America.

India has functioned throughout the ages as the trans-

cendent spiritual light and *Guru* of the world. In order to fulfil this function to perfection, her ever stirring impulse has been to integrate into more and more recomprehensive synthesis the multitudinous cultural and spiritual values pouring in from different portions of the world. The essence of her **Sanatan Dharma** consists in this all embracing synthesis, in holding forth the untellable light of all lights (Jyotisam Jyotih) to all people recognized as children of immorality.

The secret of this master-light, of higher spiritual truth is hidden in the fathomless depths of the human heart. Words do not reach there, thoughts do not shine there, all emotions are put to shame in the shrine of that Supreme Silence.

(Sanatan Brahman)

As a result of all kinds of experiments in the realm of spiritual truth Mother India found out long ago that the most effective way to convey spiritual light and realization to other people is by means of the concentrated light-energy of a self-realized or God-realized person, real guru or illumined soul. The living light alone can spread the light of truth and love. Otherwise, all talks of God and self knowledge and perfection will culminate in a perpetual confusion.

India therefore, aspires at enlightenment, at immortality.

The voice of India urges, mankind has only to turn towards the luminous soul in order to receive the full measure of light and the flood of light, will instantly descend upon—to enlighten, to enliven and to sustain it. It is through the real *Gurus* who are particularly designed by Providence that God is sending forth His merciful dispensations. Only those who draw near in prayer and devotion, and bring their souls under the refreshing showers of all-embracing Divine Love are saved and purified.

The life of man, mortal man with all his frailties and

short comings, is, as it were, a tiny vessel tossed on the tempestuous and perilous *waves* of the deep. All physical efforts to propel it are of no avail. But as soon as it comes under the favourable winds of heaven, it triumphantly dashes across the formidable obstacles and reaches its goal. So, India has been teaching through ages that instead of indulging in Ego and running after power, pelf and material prosperity, if the whole humanity gives in to the Divine order, it is sure to be led towards finality, towards God, across the tides of passion, sways of doubts and thrusts of trials.

Haridas Choudhuri
President
California Institute of Asian Studies

শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীবাবার স্মারকগ্রন্থ

উমেশচন্দ্র দাস

শ্রীশ্রী৺ভারত ব্রহ্মচারী বাবার জন্মভূমি জগদল। ব্রহ্মচারী বাবার বড় বোন নিত্যময়ী দেবী তাঁহার সাধন-ভজনের সাথী থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১৩, ১৪, কি ১৫ সালে নিত্যময়ী ও কন্যা কুমুদিনী ও জামাই গোবিন্দ সাধু ও নাতি সুধীর সকলকেই ব্রহ্মচারী বাবা দীক্ষা দিয়া ভজন-সাধনের সঙ্গী করিয়া নিয়াছিলেন। পববর্ত্তী কালে জগদলের তারক দত্ত ও তাঁর ভাই সেখানে দীক্ষা নেন। সাধনা ও সিদ্ধিলাভের পর তাঁহার ভাগিনী কুমুদ ও তৎস্বামী গোবিন্দ সাধু পুত্রকন্যাসহ পরিব্রাজক অবস্থায় ঘুরিতে ঘুবিতে লক্ষীয়া গ্রামে উপস্থিত হইলে সেই গ্রামের এক ধর্ম্মপ্রাণা বিধবা অমৃতময়ী সপরিবারে গোবিন্দ সাধুব (ব্রহ্মচারী বাবা হইতে শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত) সাধন-ভজন পূজা ভোগরাগ ইত্যাদি দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনা ও পর্য্যটন কাহিনীর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রহ্মচারী বাবার অলৌকিক সাধন-ভজনের কথা জানিতে পারেন এবং অমৃতময়ীর প্রাণে ব্রহ্মচারী বাবাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তখনকার দিনে মেয়েদের বাহিরে যাওয়ার সামাজিক বাধা-নিষেধ ছিল। তাই গোবিন্দ সাধুকে অনুরোধ করিলেন ব্রহ্মচারী বাবাকে আনিয়া তাঁহাকে দেখাইবার জন্য। এই জন্য অমৃতময়ীর ভৃত্য কৈলাসকে গোবিন্দ সাধুব সঙ্গে দিয়া জগদলে ব্রহ্মচারী বাবার নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারী বাবার নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত সকল কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, 'তোমরা আজ থাক, রাত্রে মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, মা যদি যাইতে বলেন অবশ্যই যাইব।' পরদিন প্রাতে ব্রহ্মচারী বাবা বলিলেন যে, মা যাইবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। বাবা লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম শিলা সঙ্গে নিয়া জন্মস্থান ও সাধনভূমি জগদল গ্রাম জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীয়া গ্রামে উপস্থিত

হইলেন। এখানকার গ্রামের লোকজন ব্রহ্মচারী বাবার দিব্যজ্যোতি-সম্পন্ন শরীরের কান্তি দর্শন করিয়া সকলেই শ্রদ্ধায় তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন। এই গ্রামের খ্যাতনামা তালুকদার ও কিশোরগঞ্জের উকীল গুরুচরণ দাস ও মোক্তার উমাচরণ দাস অমৃতময়ীর ভ্রাতা। তাঁহাদেব পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত এক দেবালয়, গ্রামের উত্তর প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের এক শাখা নদীর উপর পাগলনাথ দেবালয় ও তথায় বহু পুরাতন শ্মশানভূমি বিদ্যমান ছিল। সেই দেবালয়ে ব্রহ্মচারী বাবাকে থা‍কিব‍ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইল। তিনিও তাহাতে রাজী হইলেন। ঐ গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু তালুকদার ও ধনবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধর সস্ত্রীক ও ভ্রাতা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ধর ও শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ধর সস্ত্রীক সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও ব্রহ্মচারীবাবার জন্য কিষ্টবাবুর বাড়ীতে এক পৃথক ঠাকুর-আঙ্গিনা করিয়া দেন এবং ব্রহ্মচারীবাবা সেখানে ঠাকুরঘর, ভোগের ঘর, ইত্যাদি করিয়া যথারীতি সেবাপূজার কাজ করিতেন। সেই গ্রামের লোকের উৎসাহে বেশ কিছুদিন কিষ্টবাবুর একান্ত ভক্তিশ্রদ্ধায় এখানেই ব্রহ্মচারীবাবা বাস করিতেছেন। তখন ব্রহ্মচারীবাবার না চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল ও নানা জায়গা হইতে ব্রহ্মচারী-বাবাকে নেওয়ার জন্য লোকআসিতে লাগিল। লক্ষীয়া গ্রারেম শ্রীসূর্য-কান্ত দাস, শঙ্কর দে, হিজলিয়ার শিবচন্দ্র দে দীক্ষা নিলেন।

আমতলার গোবিন্দ সাধু জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরি করিতেন। তাঁহার সঙ্গে নিত্যময়ীর কন্যা কুমুদিনীর বিবাহ হয়। তাঁহাদের সন্তান (১) সুধীর (২) সুমতি (৩) অধীর (৪) বনবাসী (লক্ষীয়া কিষ্টবাবুর বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করে) (৫) নির্মলা (৬) গোপাল বৈরাগি (আশ্রমে জন্মগ্রহণ করে)। নিত্যময়ীর দ্বিতীয়া কন্যার নাম কুসুম, পূর্ব্বধলার নিকট এক গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। ব্রহ্মচারীবাবার কঠোর সাধনায় যখন মাসে ৬।৭ দিন ভোগ লাগিত তখন সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের কঠোর তপস্যার প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নাতনী জামাই-এর বাড়ীতে চলিয়া যান। আর ফিরেন নাই।

১৩১৬ সনের কথা। ব্রহ্মচারীবাবা নানা গ্রাম পর্য্যটন করিয়া বৈরাটি গ্রামে উপস্থিত হইলে সেই গ্রামের বিখ্যাত তালুকদার পত্রনবিশবাবুরা পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত হরগৌরী বটবৃক্ষতলে শ্মশানভূমিতে থাকিবার অনুরোধ করিলে তাহাতে সম্মত হইয়া গৌরী আশ্রম নামকরণে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া লক্ষ্মীয়ার কিষ্টবাবুর বাড়ী হইতে পিসিমা নিত্যময়ী ও গোবিন্দ সাধুর সপরিবার বৈরাটি গৌরী আশ্রমে নিয়া আসিয়া আশ্রমের সেবাপূজার কাজ চালাইতে লাগিলেন। ১৩১৮ সন ব্রহ্মচারী-বাবা লক্ষ্মীয়া ফিরিয়া আসিলেন।

১৩১৭ সনের কথা। জঙ্গলবাড়ীর শ্রীযোগেন্দ্র কারকুন মহাশয় জয়কালী যাত্রার দল নিয়া লক্ষ্মীয়া গ্রামে শ্রীমহেশচন্দ্র দাসের বাড়ীতে থাকিয়া ঐ গ্রামে ও আশেপাশের গ্রামে যাত্রাগান করিতে থাকাকালে দলের মালিক কারকুন মহাশয় ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা করিতে যান পাগলনাথ দেবালয় সিদ্ধাশ্রমে। তিনি কালীমায়ের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তখনও দীক্ষা নেন নাই। তাঁহার মনে তিনটি প্রশ্ন ছিল। সঙ্কল্প ছিল, ঐ প্রশ্নের যিনি মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহার কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র কথাপ্রসঙ্গে কারকুন মহাশয় তাঁহার তিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়া ব্রহ্মচারীবাবা অন্তর্যামী মহাপুরুষ বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তারপর ঐ যাত্রাদলের অনেকেই দীক্ষা নিলে সুরেন্দ্রনাথ নামক একটি ছেলে ব্রহ্মচারীবাবার পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা তাহাকে ক্রমশঃ বেদ বেদান্ত পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করিয়া শান্তিদানন্দ ব্রহ্মচারী নামকরণে সন্ন্যাস দান করিলেন। এই শান্তিদানন্দ রচিত 'উমা প্রেম' বা 'কলৌ কালী মঙ্গল' গ্রন্থ, লিঙ্গপূজা তত্ত্ব, সত্য গাথা, ধর্ম সম্মেলন গ্রন্থগুলিতে তাঁহার অগাধ অধ্যাত্ম জ্ঞানের নিদর্শন রহিয়াছে।

যাত্রাদলের এখানেই সমাপ্তি হইল। যাত্রাদলের শ্রীরাধানাথ সবকার (শালপুর), রাজকিশোর কর্মকার (জঙ্গলবাড়ী), উমেশ নট্ট

ও সমর নট্ট (ব্রাহ্মণকচুরী) এবং আরো অনেকে দীক্ষা নিলেন। রাধানাথ সরকার আরও কিছুদিন সংসার করিয়া পরে ব্রহ্মচারীবাবার পদতলে আশ্রয় নিলেন। ১৩১৮ সনে উক্ত সুরেন্দ্রের মার বিশেষ অনুরোধে ব্রহ্মচারীবাবা সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়া বৈরাটি গ্রামে যান। সেখানে যাওয়ার পর বৈরাটি গ্রামে বিশেষ সাড়া পড়ে এবং গ্রামের বহু লোক বাবার নিকট হইতে দীক্ষা নিতে শুরু করিলেন। বৈরাটির মতিরাম নাথ, সপরিবারে সুশীল নাথ, অশ্বিনী নাথ, সাধু নাথ, দুর্গাচরণ শীল, দুর্গাদাস সরকার, উপেন্দ্র সরকার, জ্যোতি পত্রনবিশ, ক্ষিতীশ পত্রনবিশ, রতীশ পত্রনবীশ, প্রভাত পত্রনবিশ, হরিবল মালী, রজনী মালী, সজনী দে, আবু মেস্তরি, হাচু মেস্তরি, হরিমোহন নাথ, মহেশ মাল, মহিম মাল ও অন্যান্য গ্রামের পরেশ বিশ্বাস, লালমোহন সরকার, মহেন্দ্র বিশ্বাস, বাদেনুল্লার মুকুন্দ দে, সাজিউরার যোগেন্দ্র সরকার প্রভৃতি, কান্দিউরা হাই স্কুলের অনেক ছাত্র, অগ্নিযুগের অগ্নিমন্ত্রে জীবন উৎসর্গীকৃত আটাশিয়ার নগেন্দ্র ধর ইত্যাদি ছাত্রগণও আসিয়া ব্রহ্মচারী-বাবার পদতলে আশ্রয় নিতে লাগিলেন। তখনই বৈরাটির সম্ভ্রান্ত তালুকদার পত্রনবিশদের পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত হর-গৌরী বটবৃক্ষ তলে মহাশ্মশান ও পুকুর সহ বিস্তৃত জায়গা ব্রহ্মচারীবাবাকে দান করিলেন আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য। বাবাও গৌরী আশ্রম নাম দিয়া সেখানে আশ্রম স্থাপন করিলে হরিবল ও রজনী সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে আশ্রয় নিল। ১৩১৮ সালে গৌরী আশ্রম হইতে লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে ফিরিয়া যাইবার পথে কিশোরগঞ্জ টাউনের সংলগ্ন নগুয়ার শ্রীসনাতন সাধুর বাড়ীতে উঠিলেন। সনাতন সাধু কর্ত্তাভজা দলের পাণ্ডা ছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা তাহার বাড়ীতে মায়ের আসন স্থাপন ও পূজা পাঠ ভোগরাগ দেওয়ার সব ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সদলবলে উদ্ধার করিয়া আসিলেন। এই সনাতন সাধুর বাড়ী পরে শান্তি আশ্রমে পরিণত হয়। ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সনাতন সাধু সদলবলে পবিত্র জীবন যাপন করেন।

নগুয়ায় কিছুদিন থাকিয়া ব্রহ্মচারীবাবা লক্ষ্মীয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে আসিলে পর ডেঙ্গু দে, নবীন দে, বিপিন দে, মৃণ্ময়ী, দীক্ষা নিলেন। তখন ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে শান্তিদানন্দ, রাধানাথ, বজনী, সরলানন্দ আছেন। তারপর পাতোয়াইরের মথুর মালী রোগী হিসাবে ব্রহ্মচারীবাবার শরণ নিলে এখানে থাকিয়া নীরোগ হইয়া অবলানন্দ নামে আশ্রম-জীবন যাপন করিতে থাকেন। এই অবলানন্দ, সরলানন্দ ও আরও কয়েকজন লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমে ঘরদরজা উঠাইয়া ঠাকুর ঘর, ভোগের ঘর এবং আরও ৪।৫টি কুটির নির্মাণ করিয়া ফুল ও ফলের বাগবাগিচা করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এর আগে পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের কিষ্টবাবুব বাড়ীতে ভোগরাগের ব্যবস্থা ছিল। ১৩১৮ সন হইতে আশ্রমেই পূজাপাঠ ভোগরাগ শুরু হয়। লক্ষ্মীয়া, মির্জাপুর, বাহাদিয়া, আঙ্গ্যাদি, হুসেনদি, কুমারপুর, নারান্দী, পাকুন্দিয়া, জাঙ্গালিয়া ইত্যাদি পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে পাঁচ বাটী ভিক্ষার প্রথা প্রবর্তন করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা আশ্রমের সেবাপূজার কাজ চালাইতেন। আশ্রমে প্রতিদিনই ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বহু লোকজন আসিতেন। আশ্রমে একবারই ভোগ লাগিত এবং উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী সকলকে লইয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। এই নিয়মেই আশ্রম চলিতে থাকে। ১৩১৮ সনে রাধানাথ ও শান্তিদানন্দকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলবাড়ী যাওয়ার পথে বয়লা গ্রামে বৈকুণ্ঠ শাঁখারীর বাড়ীতে উঠিয়া তাহাকে দীক্ষাদান করেন। তারপর জঙ্গলবাড়ী গিয়া যোগেন্দ্র কারকুন মহাশয়ের বাড়ীতে দশভূজা মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে সেবাপূজার কাজে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও যাত্রাদল ও সংসারের ঝামেলা ছাড়িয়া একান্ত মনে মায়ের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পরবর্ত্তীকালে কারকুন মহাশয় মায়ের আদেশমত জীবনযাপন করিতেন। এই সময়ে জঙ্গলবাড়ীর গোবিন্দ কর্ম্মকার মহাশয় বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনভজন শুরু করেন। পরবর্ত্তীকালে ঐ গোবিন্দ সাধুও অনেক শিষ্যসেবক করিয়াছিলেন। ইহার পর বাবা

জঙ্গলবাড়ী হইতে বৈরাটী গৌরী আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। বৈরাটী গিয়া আমতলার দশরথকে ও নাগডরার পবন নমদাসকে দীক্ষা দিয়া বাড়ীতে আসন স্থাপন করিয়া সেবাপূজায় নিযুক্ত করিলেন। সুন্দাইলের প্রকাশ সরকারও দীক্ষা নিলেন।

বৈরাটী আসিয়া রাঘবপুরের যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী দীক্ষা গ্রহণ করেন। চিক্‌নির সীতানাথ সাহা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কিছুদিন আশ্রমে বাস করেন। তারপর সংসারে চলিয়া যান। বৈরাটী হইতে হাসিমপুরের সুরেশ সরকার আসিয়া বাবাকে নিয়া গেলেন। বাড়ীতে গিয়া তিনি তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। সুরেশ সরকার, তাঁহার ভাতিজা নকুল সরকার, শচীন্দ্র রায় (খালিয়াজুরী), অমর দত্ত (হাসিমপুর) ভৈরব মেস্তরি (হাসিমপুর) দীক্ষা নিলেন। নন্দীগ্রামের কুঞ্জ মাষ্টার হাসিমপুর আসিয়া দীক্ষা নিলেন। তারপর ষাইটকাহন গিয়া অমর ডাক্তার, রামমোহন বিশ্বাস, রামনাথ বিশ্বাস ও ছেলে নগেন্দ্র বিশ্বাস দীক্ষা নিলেন। ষাইটকাহনের গুরুচরণ বিশ্বাস ও গোবিন্দ বিশ্বাস দীক্ষা নিলেন। ঐ গ্রামের সাধু হেমচন্দ্র দে ও রাজেন্দ্র দে, রামকুমার বিশ্বাস, জগন্নাথ দে দীক্ষা নিলেন।

১৩১৯ সন আরম্ভ হইল। তেলিগাতির সুরেশ সরকার, বলশী গ্রামের অশ্বিনী সরকার, গজেন্দ্র, শিবেন্দ্র সরকার দীক্ষা নিলেন। সেখান হইতে ব্রহ্মচারীবাবা চলিয়া আসিলেন আঠারবাড়ী। এখানে রোহিণী সরকার, মনোমোহন দে, ভজন মালী দীক্ষা নিলেন। তথা হইতে ধুরুয়ার লোকনাথ নমদাস দীক্ষা নিলেন সপরিবারে ; তাঁহার বাড়ীতে বাৎসরিক ৺দুর্গাপূজা হইত।

তারপর খামারগাঁওয়ের গিরীশ নাথ, হরিবল নাথ, রাজেন্দ্র শীল, সত্যেন্দ্র রায়, অবনী সরকার দীক্ষা নিলেন। নান্দাইলের শ্রীকুমুদ শীল, হরিবল মালী, কামালী মালী এবং আরও অনেকে দীক্ষা নিলেন। তারপর শ্রীযামিনীকান্ত কর দীক্ষা নিলেন। ১৩২৭ সনে সিংরৈলের

প্রখ্যাত তালুকদার শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত ব্রহ্মচারীবাবার বিশেষ কৃপা ও দীক্ষা পাইলেন। ১৩১৯ সনে সিংরৈল হইতে রওনা হইয়া চামারউল্লা গ্রামে হাবাধন সাধু (নারদ মুনির মত চেহারা) দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আশ্রমবাসী হইলেন।

১৩২০ সনের কথা। লক্ষ্মীয়া আশ্রমে আসিয়া এই বৎসর শান্তিদানন্দ, রাধানাথ সরকারসহ ব্রহ্মচারীবাবা গুপ্ত বৃন্দাবন তীর্থ ঘুরিয়া আসিলেন। লক্ষ্মীয়ায় কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া বাবা শ্রীহট্ট জেলার তীর্থ বিতাঙ্গলে স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ বৈষ্ণব সাধুর আখড়ায় গিয়াছিলেন। বাবার সাধনাবস্থায় রামকৃষ্ণ বাবাকে দর্শনদান ও সাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তারপর ব্রহ্মচারী-বাবা তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। সঙ্গে শান্তি, রাধানাথ ও সূর্য্যকান্ত দাসকে লইয়া নবদ্বীপ ধামে গিয়া হত্যা দিয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপালাভ করেন ও কলিকাতায় ৺কালীমাতার দর্শনলাভ করিয়া ৺গয়াধামে রওনা হইলেন। সেখানে গিয়া বিষ্ণুপাদে হত্যা দিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা পদব্রজেই তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। গয়াতে ব্রহ্মচারীবাবার পায়ে চিমটার আঘাত লাগিলে আহত হইয়া সেখান হইতে বৈরাটী আশ্রমে ফিরিয়া আসেন ও ভক্তদের সেবা-শুশ্রূষায় আরোগ্যলাভ করেন।

তার পরের বৎসর ১৩২১ সনে একমাত্র শান্তিদানন্দকে লইয়া পদব্রজে রামেশ্বর সেতুবন্ধ অভিমুখে রওনা হইলেন। রাস্তায় পুরীধামে হত্যা দিয়া জগবন্ধুর কৃপালাভ করিয়া তথা হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ গেলেন। সেখানেও তীর্থরাজ রামেশ্বর শিবের নিকট হত্যা দিয়া জানিতে পারিলেন তিনি শুধু রামেশ্বর নহেন, তিনি ত্রিভুবনেশ্বর শিব। তাঁহার কৃপালাভ করিয়া আশ্রমের দিকে রওনা হইলেন। মাদ্রাজের গ্রামে রান্না-করা অন্ন-ভিক্ষা দেওয়া হইত। ফিরিবার পথে একদিন সেই ভিক্ষার অন্নে মুরগীর মাংস ছিল। সেই ভিক্ষার অন্নই মহাপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ওই সুদূর রাস্তা পদব্রজে পরিক্রমা করিয়া ১৩২২ সনে আসিয়া লক্ষ্মীয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আমি শ্রীউমেশচন্দ্র দাস ১৩২৩ সনে কাঁঠালতলী গ্রামে থাকিয়া বনগাঁও হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়িতেছিলাম। ঐ গ্রামের সুরেশ চক্রবর্ত্তী (দয়ানন্দ স্বামীর শিষ্য) প্রচার করিতে লাগিলেন যে লক্ষ্মীয়ায় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া আত্মজিজ্ঞাসু শ্রীউপেন্দ্রকিশোর দত্তরায়, সুবেশ চক্রবর্ত্তী ও আমি বাবাকে দর্শন করিতে গেলাম। আশ্রমে গ্রামেব আরও ভক্ত এবং শ্রীতারক চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন। ভগবৎপ্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদি শুরু হইলে সকলেই ভাবোন্মত্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছিল। আমি বসিয়া তাহা দর্শন করিতে থাকা অবস্থায় ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে এক চড় মারিয়া বলিলেন, 'কিরে তুই কাঁদিস না কেন?' তারপর আমরা সকলে কাঁঠালতলী চলিয়া আসিলাম। সেইদিনই রাত্রে আমাব অজ্ঞানাভাবে কেবল কান্না আসিতে লাগিল। আমি কিছুতেই ঠিক থাকিতে পারিতেছিলাম না। কয়েকদিন পরেই শ্রীউপেন্দ্রকিশোব দত্তরায় লক্ষ্মীয়া গিয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে তাঁহার বাড়ীতে নিয়া আসেন। উপেন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে তখন মহাউৎসব শুরু হইয়া গেল। চারিধারের সব ভক্তরা আসিয়া ভিড় করিলেন। দিনরাত কীর্ত্তন আলাপ-আলোচনা চলে। উপেন্দ্রবাবু সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ক্রমে অতুল মাষ্টার সপরিবারে দীক্ষা নিলেন ও শ্রীশশীকান্ত দে সপরিবারে, শ্রীমুরারি মোহন দে সপরিবারে, রজনী মাষ্টার দীক্ষা নিলেন। এখানে কয়েকদিন খুব আনন্দ উৎসব হইতেছে। এর মধ্যে একদিন আমি ২টার সময় স্কুল হইতে আসিয়া উপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখি, উপেন্দ্রবাবুর বাড়ীর ভিতরের পূর্ব্ব দিকের ঘর হইতে আমার স্কুলের ছাত্র শ্রীহেমচন্দ্র রায় (বর্ত্তমানে পণ্ডিচেরী আশ্রমবাসী) দীক্ষা নিয়া বাহির হইলেন। এটা কি ব্যাপার দেখিতে উৎসুক হইয়া আমি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলাম মধ্যপাড়া-বানিয়াগ্রামের শ্রীপুলিন-

বিহারী সরকার দীক্ষা নিতেছেন। পরে ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'তুইও আয়।' আমি বলিলাম, 'আমি এখন দীক্ষা নিব না। আমি এখন স্বাধীনতা সংগ্রামেব কর্মী হিসাবে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।' তখন ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন, 'আমি সেই স্বাধীন ভারত'; বুকে টুকি দিয়া বলিলেন, 'আমিই ভাবত স্বাধীন কবিবার জন্য আসিয়াছি। আয় তুই মন্ত্র নিয়ে যা।' অভিভুত হইয়া আমি দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। এইদিন মসূয়াব সতীশ দে ও কাঁঠালতলীব ক্ষিতীশ দত্ত একসঙ্গে দীক্ষা নিলেন।

এই সময়ের এক অদ্ভুত ঘটনাব কথা বলি। অতুল মাষ্টাব বনগাঁওয়ের তালুকদার প্রিয়নাথ রায় ও যদুনাথ বায় মহাশয়ের বাড়ীতে তহশীলের কাজ করিতেন। প্রিয়নাথ রায়েব স্ত্রী সুশীলাসুন্দরী রায় ব্রহ্মচারীবাবার কথা শুনিয়া অতুল মাষ্টাবমহাশয়কে বলিলেন 'ব্রহ্মচারীবাবাকে রাত্রে আমার বাড়ীতে লইয়া আসিবেন, কেহ যেন টের না পায়।' অতুল মাষ্টার এই কথা ব্রহ্মচারীবাবাকে বলিলে তিনি তাহাতে রাজী হইলেন এবং একদিন গভীর রাত্রে উপেন্দ্র রায় ও অতুল মাষ্টার দুইজনে ব্রহ্মচারীবাবাকে লইয়া সুশীলা-সুন্দরীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সুশীলাসুন্দবী বাবাকে দর্শন কবা মাত্র 'এই বাবা আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া মন্ত্র দিয়াছেন' বলিয়া বাবার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। বাবা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া সাক্ষাতে দীক্ষা দিলেন। প্রিয়নাথ রায়ের ভাই যদুনাথ রায়েব স্ত্রীও আগেই প্রস্তুত ছিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তারপর রাত্রেই আবার উপেন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

এই সময় মুমুরদিয়ার প্রমদাশঙ্কর রায়ও দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। উপেন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গচিহাটা গ্রামের বহু ভক্ত আসিয়া ব্রহ্মচারীবাবার কৃপাশীর্ব্বাদলাভ করিয়া গিয়াছেন। কাঁঠালতলী হইতে বাবা লক্ষ্মীয়া চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিলে লক্ষ্মীয়ার শ্রীতারক চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ১৩২৩ সনে বনগ্রাম-কাঁঠালতলীর শ্রীকেদার সরকার লক্ষ্মণীয়া আসিয়া কিষ্টবাবুর বাড়ীতে দীক্ষা নেন। এখন তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে আছেন। মস্যূয়ার জমিদার নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভাগিনা গচিহাটার নিদানীবাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন, তিনি ব্রহ্মচারীবাবাকে শ্রদ্ধা করিতেন। গচিহাটার বিধু রায় ব্রহ্মচারীবাবার মাথায় পা দিলে পরবর্ত্তীকালে মহারোগে পা নষ্ট হয়। ব্রহ্মচারীবাবা সূক্ষ্ম দেহে মস্যূয়া গিয়া কৈলাস দে ভক্তকে মন্ত্র দীক্ষা দিয়া নিদানীবাবুর সঙ্গেও দেখা করিয়া অন্তর্ধান হন। তাঁহারা ব্রহ্মচারীবাবাকে খোঁজাখুঁজি করিয়া পাইলেন না। পরবর্ত্তীকালে খবর নিয়া জানা গেল ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন—এসব আমি জানি না। মা অনেক সময় আমার রূপ ধরিয়া কাজ করেন এবং এসব ঘটনা মা-ই জানেন।

১৩২৩ সনের শেষভাগে বৈরাটী আশ্রমে গিয়া গোবিন্দ সাধু বল্লভপুরের প্রচারককে দীক্ষা দিলেন। খালিয়াজুরীর রজনী দে দীক্ষান্তে পর্য্যটনে বাহির হইয়া বিরজানন্দ নামে হিমালয় পরিক্রমা করিয়া বহুদিন পর্য্যটন করেন। পরবর্তী ১৩২৭।২৮ সনে যখন শান্তিদানন্দ, যোগানন্দ, ধীরানন্দ, মোক্ষদানন্দ, শঙ্করানন্দ, পর্য্যটনে যাওয়ার আদেশ পান তখন তাঁহারা গিয়া বিরজানন্দকে হৃষীকেশে সাক্ষাৎ পান। মোক্ষদানন্দ জম্মু ষ্টেটের উধমপুরে আশ্রম করিয়া কোন এক ভক্ত নিয়া বাস করিতেন। এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা সকলেই উধমপুর আশ্রমে গিয়া মোক্ষদানন্দের আশ্রমে বাস করিতেন। বিরজানন্দ উধমপুর গিয়া অসুস্থ হইয়া ১৩৩৫ সনে দেহত্যাগ করেন। কালীয়ারার ঈশ্বর দত্তরায় ও ভাতিজা ক্ষিতীশ দত্তরায় ও তাঁহার ভ্রাতৃবধু সুনীতি দেবী বর্তমানে জগদলের আশ্রমে আছেন।

১৩২৪ সনের প্রথম ভাগে রাণাগাঁও-এর বিশ্বনাথ দাস ও তাঁহার বিধবা ভগ্নী বৈরাটী আশ্রমে আসিয়া দীক্ষা নেন। লক্ষ্মণপুরের কানাই মল্লবর্ম্মণ আসিয়া দীক্ষা নেন। সমাজ গ্রামের রামতনু নাথ আসিয়া

দীক্ষা নেন। কুল্লুয়াটী গ্রামের রসিক সরকার ও তাহার ভ্রাতা কৈলাশ সরকার দীক্ষা নেন। এই গ্রামের হরিভক্ত মল্লবর্ম্মণ ও ভারত নাথ দীক্ষা নেন। এই ভারত নাথ ১৩৩৬ সনে লক্ষ্মীয়া আশ্রমে আসিয়া লাল কাপড় পরিয়া ভূমানন্দ নাম ধারণ করিলেন এবং যোগানন্দ শঙ্করানন্দের সহিত লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৩৩৭ সালে লক্ষ্মীয়া অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় তাঁহারা সকলে ফিরিয়া গেলেন। দশহাল গ্রামের শিবেন্দ্র সরকার ভারত দে'ও দীক্ষা নেন। বুধপাশার অশ্বিনী ধর ও তাঁর শ্যালক কবিরাজ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী রামদয়াল দাস দীক্ষা নেন।

১৩২৯ সনের কথা। বোরগাঁও-এর শ্রীবীরেন্দ্র রাউত বি. এ., মাষ্টার হীরেন্দ্র রাউত, হরিপদ বিশ্বাস প্রভৃতি এই গ্রামের অনেক ভক্ত ছিল।

১৩২৫ সনে ব্রহ্মচারীবাবা লক্ষ্মীয়া আসিলেন। এখানে আসিলে নোয়াপাড়ার শ্রীপূর্ণচন্দ্র মজুমদার দীক্ষা নিলেন ও সেই বৎসর পূজার সময় ৪খণ্ড বেদান্ত দর্শন খরিদ করিয়া আশ্রমে দান করেন। শান্তিদানন্দকে বাবা বেদান্ত দর্শন পাঠ করান। আশ্রম লাইব্রেরিতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ইত্যাদি, রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত, বিবেকানন্দের অনেক বই, আরও অনেক মহাপুরুষের জীবনী ইত্যাদি এক আলমারী ভর্ত্তি নানা শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল। অবোধ্য শাস্ত্রগ্রন্থ যাহা সন্ন্যাসীরা বুঝিতেন না তাহা ব্রহ্মচারীবাবা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। এই ছিল ব্রহ্মচারীবাবার বিশেষত্ব। ১৩২৫ সনেই খাকুয়ার তারাকান্ত চৌধুরী, ক্ষিতীশ চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী ও লাখু ঘোষ (সুরেন ঘোষের ভাই) লক্ষ্মীয়া আসিয়া দীক্ষা নেন। সকলেই ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগের কর্মী। লক্ষ্মীয়ায় কিষ্টবাবুর বাড়ীতে বিক্রমপুর শেখরনগর গ্রামের কবিরাজ শ্রীরমণীমোহন গুহ রোজ আশ্রমে আসিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ শুনিতেন। পরে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর আস্তে আস্তে আশ্রমজীবন ধারণের মত প্রকাশ করিলে ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া স্ত্রীপুত্রের অনুমতি নিয়া

আসিতে বলিলেন। তিনি বাড়ী হইতে অনুমতি নিয়া আসিয়া পরবর্ত্তী কালে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রামানন্দ নামে ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে থাকিয়া গেলেন। নিকলী অঞ্চলে তাঁহার অনেক শিষ্য আছে।

১৩২৪।২৫ সনে নন্দীগ্রামবাসী কুঞ্জ মাষ্টার ব্রহ্মচারীবাবাকে নিজ বাড়ীতে নিয়া গেলেন। সেখানে শশীকান্ত ভদ্র সুধীর সরকারদের বাড়ীতে দীক্ষা নেন। সুধীররঞ্জন সরকার এখন ৩।৭৮ মহাজাতি নগর, বিরাটীতে বাস করেন। তাঁহার বড় ভাই কাজীপাড়া বারাসতে আছেন। মথুরানন্দ ব্রহ্মচারী চিত্রধাম আশ্রমে সমাধি-মন্দির, জগদল আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও আশ্রমের উন্নতিকল্পে বহু দান করেন। তিনি সঙ্গীত-বিদ্যায় খুব উন্নত ছিলেন। নিষ্ঠাবান ভক্ত সাধক তিনি।

শৈলজানন্দ ব্রহ্মচারীর জন্মস্থান যশোদল। তিনি আমাদের কাঁঠাল-তলীর উপেন্দ্র দত্তরায়ের মাসতুত ভাইয়ের সম্পর্কে ভাতিজা। কাঁঠাল-তলীতেই ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা নিয়া তিনি বার্নপুরে চাকুরী করিতেন। স্ত্রী মারা গেলে শোকগ্রস্ত হইয়া তিনি এক কন্যা ও এক হাবা পুত্রকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট রাখিয়া সাধু হইয়া নানা জায়গা ঘুরিয়া পণ্ডিচেরীতে কিছুদিন থাকিয়া দাক্ষিণাত্যে মনোরমা দেবীর নিকট হইতে সন্ন্যাস নিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। তারপর পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন, পূর্ব-পাকিস্তানে কিছুদিন, সব জায়গাতেই অস্থায়িভাবে থাকিয়া ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করিয়া বহু শিষ্যও করিয়াছিলেন। তিনি সুভাষ বসুর জীবিত থাকার কথায় আস্থাবান ছিলেন। এই নীতিতে সাধু খুব নিষ্ঠাবান থাকায় অনেকেই তাঁহাকে অপছন্দ করিতেন। তথাপি তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ব্রহ্মচারী বাবার পশ্চিমবঙ্গবাসী ভক্ত শিষ্যদের স্থাপিত শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘে আসিয়া যোগদান করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিবার প্রতিশ্রুতিতে হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে সাধন সংঘের অর্থানুকূল্যে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ও ২।৩ বৎসর থাকিয়া আবার উধাও হইলেন। সন্ন্যাসীর অভাবে আশ্রম নষ্ট হইয়া গেল। সেই হইতে সাধন সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ

নষ্ট হয়। পরে তিনি পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান। ফিরিবার পথে গারো পাহাড়ের (মেঘালয়) ৺কালীবাড়ীতে যান। সেখানে তাঁহার এক শিষ্য ছিল। সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তারিখ ১৩৮৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস।

খালিয়াজুরীর ডাক্তার হরেন্দ্র চৌধুরী নেত্রকোনায় ছিলেন। ১৩৩২ সনে মালনী আশ্রমে আসিয়া দীক্ষা নেন। সেই গ্রামের মুকুন্দ দত্ত বর্তমান হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ায় আছেন। তিনি ছাড়া আরও অনেকে তাঁহার ভক্ত ছিলেন। নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত তাঁহাদের একজন।

লক্ষ্মীগঞ্জ কাচারীর নায়েব মহেন্দ্র সরকার মহাশয় ব্রহ্মচাবীবাবার ভক্ত ছিলেন। তাঁহার মেয়েরা সবাই ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার বড় মেয়েকে খালিয়াজুবীর শচীন্দ্র রায় বিবাহ করেন। মাধুরী ৺শচীন্দ্র রায়ের কন্যা। বর্তমানে কাঁকিনাড়ায় আছে। লক্ষ্মীগঞ্জের জগন্নাথ সাহা ও নীলকণ্ঠ মাষ্টার দীক্ষা নেন।

মুমুরদিয়ার স্বর্গীয় কৈলাস রায়ের স্ত্রী তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ৺শিবলিঙ্গ ও সুদর্শনচক্রেব যথারীতি পূজার্চ্চনা করিতে পারিতেছিলেন না। ১৩২৩ সনের আশ্বিন মাসে কাঁঠালতলীর উপেন্দ্রবাবুকে খবর দিয়া সেই বিগ্রহদ্বয় ব্রহ্মচারীবাবাব আশ্রমে নিয়া যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কাঁঠালতলীর অতুল মাষ্টারকে দিয়া উপেন্দ্রবাবু ঐ শিবলিঙ্গ ও চক্র মাথায় করিয়া লক্ষ্মীয়া আশ্রমে নিযা আসেন। ঐ সনে ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে লক্ষ্মীয়া আশ্রমে ব্রহ্মচারীবাবা শিবলিঙ্গের 'সচ্চিদানন্দ শিব' ও চক্রের 'সুদর্শন চক্র' নামকরণে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তদুপলক্ষে আশ্রমে বিরাট উৎসব হয়। এই উৎসবের পর ব্রহ্মচারীবাবা ১৩২৫ সনে বৈরাকু যান। ঐ সনের চৈত্র সংক্রান্তির দিন ব্রহ্মচারীবাবা সুশীলানন্দ'র বাড়ীতে ছিলেন, করগাঁও নিবাসী যতীন্দ্রমোহন পণ্ডিত—বয়স ২০ বৎসর, কেন্দুয়া স্কুলের ছাত্র, বিপ্লবীদলের কর্মী, ব্রহ্মচারীবাবার নাম শুনিয়া সুশীলদাব বাড়ীতে গিয়া বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তারপর ১৩২৬ সনের কথা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে লক্ষ্মণীয়া আশ্রমে ব্রহ্মচারীবাবা ফিরিয়া আসিলেন। লক্ষ্মীয়া-বৈরাটী যাতায়াতের পথে কিশোরগঞ্জ নগুয়ার সনাতন সাধুর বাড়ীতে উঠিয়া শান্তি আশ্রমে বিশ্রাম করিতেন। গচিহাটার ইন্দুভূষণ দত্তরায় নগুয়া শান্তি আশ্রমে সুরেশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আসিয়া ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা করেন। পরবর্তীকালে তিনি লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমে গিয়া দীক্ষা নেন। এই সময় শান্তিদানন্দের সঙ্গে মনোমোহন দে খালিয়াজুরি হইতে লক্ষ্মীয়া আশ্রমে আসিয়া দীক্ষা নিলেন ও আশ্রমে থাকিয়া যোগসাধনা করিতে থাকেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি মোক্ষদানন্দ নাম গ্রহণ করেন। কোদালিয়ার নিকট চরপলাশ গ্রামের যোগেন্দ্র নাথের পাকুন্দিয়া বাজারে দোকান ছিল। তিনি ১৩২৬ সনের শিবরাত্রি উৎসবের অনেক জিনিসপত্র আশ্রমে দান করেন ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। কটিয়াদির রাধানাথ ঘোষ দীক্ষা নেন। অষ্টবর্গের প্রতাপচন্দ্র পাল বাহাদিয়া গ্রামে মামার বাড়ীতে থাকিয়া আশ্রমে আসিয়া দীক্ষা নেন। বাহাদিয়ার সুরেন্দ্র শীল এবং যতীন্দ্র শীলও দীক্ষা নিলেন।

১৩২৬ সনে শান্তিদানন্দ (১) কলৌ কালী মঙ্গল বা উমাপ্রেম (২) সত্যগাথা (৩) ধর্ম্মসম্মেলন ও (৪) লিঙ্গপূজাতত্ত্ব প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এই বইগুলি শান্তিদানন্দের সাধনভজনের স্মৃতিস্বরূপ রহিয়াছে। এই সনের ভাদ্র মাসে একদিন ব্রহ্মচারীবাবা লক্ষ্মীয়া কিষ্টবাবুর বাড়ীতে গিয়া একা চুপ করিয়া রহিলেন। তখন ধীরানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রম হইতে ব্রহ্মচারীবাবার খোঁজে বাহির হইয়া কিষ্টবাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে পাইলেন। সেখানে ধীরানন্দজীকে তিনি বলিলেন—আমি আগামীকাল নগুয়া চলিয়া যাইব। তুই কাহাকেও আমার যাওয়ার খবর দিবি না। তুই আগামী কাল নগুয়া গিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইবি। সেইমত তিনি নগুয়ার সনাতন সাধুর বাড়ীতে গিয়া বাবার সঙ্গে মিলিত হইলেন। এখানে ২।৩ দিন থাকিয়া পরে বৈরাটী চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারীবাবা বৈরাটী গিয়া ২।৩ দিন পর ধীরানন্দদাকে বলিলেন, 'তুই

নান্দাইল গিয়া এইসব অঞ্চলে দীপান্বিতা উপলক্ষে শ্রীশ্রী৺ভারতেশ্বরী মায়ের পূজার নিমন্ত্রণ করিয়া আয়। ধীরানন্দদা নান্দাইলে রওনা হইয়া বাঁশহাটী গ্রামে গিয়া রাত্রিবাস করিলেন। ঐ রাত্রেই ১৩২৬ সনের বিখ্যাত ঝড় সারা ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলা এই ৩৪ দিনে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। ধীরানন্দদা পরদিন ঝড় থামিলেই বৈরাটী রওনা হইয়া গেলেন। তিনি বৈরাটী গেলে পর ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন, 'তুমি শীঘ্র রাধানাথকে সঙ্গে নিয়া লক্ষ্মীয়া চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া দেখ কে কেমন আছে।' তদনুসারে রাধানাথদাকে সঙ্গে নিয়া তিনি লক্ষ্মীয়া চলিয়া আসিলেন। লক্ষ্মীয়া আসিয়া আশ্রম সব ঠিক আছে দেখিলেন। শান্তিদানন্দ ও মোক্ষদানন্দ লক্ষ্মীয়া আশ্রমে ছিলেন। আরও একজন ভক্ত চেংদেনার সুরেন্দ্র বিশ্বাস বাড়ীতে ঝগড়া করিয়া আশ্রমে আসিয়া ছিল। তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া রাধানাথদা শান্তিদানন্দ ও মোক্ষদানন্দকে নিয়া বৈরাটী চলিয়া গেলেন। বৈরাটী শ্রীশ্রীভারতেশ্বরী মায়ের প্রথম উৎসবের ধুমধাম শুরু হইল। আশ্রমের সব ঘরদরজা নূতন করিয়া গঠিত হইল। হরগৌরী বটবৃক্ষের গোড়া উঁচু সিঁড়ি করিয়া বাঁধান হইল। বৈরাটী আশ্রম স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিল। শ্রীশ্রীভারতেশ্বরী মায়ের আগমনী বার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে ১৩২৬ সনের দীপান্বিতায় মায়ের পূজার দিন আগাইয়া আসিল। ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য ভক্ত সকলের পূজার দিন সোয়া সের চাউল, প্রদীপ, ধূপ, ধুনা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়া আসিবার নির্দ্দেশ ছিল। ব্রহ্মচারীবাবা নিজেই মায়ের পূজায় নিযুক্ত হইলেন। সব ভক্তেরা নিজ নিজ প্রদীপ ও ধূপ ধুনা সাজাইয়া মায়ের মণ্ডপের সামনে রাখিলেন। পূজা শুরু হইল। এই সময়ে শান্তিদানন্দ বাবার আদেশে সকলকে জানাইলেন—সকলেই মায়ের আগমনের জন্য প্রণব মন্ত্রে মাকে ডাক আর অশ্রু বিসর্জন কর। ভক্তেরা মাকে আকুল প্রাণে কাঁদিয়া ডাকিতে থাকিলে পূজামণ্ডপের সামনে যে রোল উঠিয়াছিল তাহা আশেপাশের গ্রামের লোক শুনিতে পাইয়া কোন

বিপদ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া আশ্রমে আসিয়া খবর পাইল—মা আসিয়াছেন। ইহা জানিয়া সকলে আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারীবাবা পূজা শেষ করিয়া মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সকলকে জানাইলেন। সকলেই মায়ের নামে উপবাসী ছিল। পূজার পর সবাই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। উৎসব ২।৩ দিন সমানে চলিয়াছিল।

হরিমোহন নাথ নামক একটি লেংড়া বৈরাগী আশ্রমে আসিয়া থাকে। কখন দীক্ষা নিয়াছিল জানা নাই। লক্ষ্মণীয়া আশ্রমেও কিছুদিন থাকিয়া বৈরাটি আশ্রমে গিয়া পরে মারা যায়। তাহাকে সৎকার করিবার সময় ব্রহ্মচারীবাবাও শ্মশানে ছিলেন। হঠাৎ তাহার মাথার খুলিটা ফাটিয়া গিয়া কিছু মগজ ব্রহ্মচারীবাবার মুখে পড়িল। ব্রহ্মচারীবাবা তাহার মুখে পতিত মগজটা খাইয়া ফেলিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আমার মুখে পতিত হওয়ায় খাইয়া ফেলিয়াছি। মায়ের ইচ্ছায়ই মুখে পড়িয়াছিল।' বৈরাটি দীপান্বিতার উৎসব শেষ করিয়া শান্তিদানন্দের ছাপা সব পুঁথিপুস্তক শান্তিদানন্দ, রাধানাথ, সুশীলানন্দ, রাধানন্দ, মোক্ষদানন্দ, অবলানন্দ, সরলানন্দ ইত্যাদি সবাইকে লইয়া লক্ষ্মীয়া আশ্রমে ব্রহ্মচারীবাবা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ১৩২৬ সনের কার্ত্তিক মাস। আশ্রমে সচ্চিদানন্দ শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইবে শিবরাত্রি উপলক্ষে। সেই উৎসবের কাজ আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে করগাঁও-এর যতীন্দ্র পণ্ডিত ১৩২৪ সনের পৌষ মাসে রাজনীতির আবর্তে ধরা পড়িয়া এক বৎসর অন্তরীণ ছিলেন।

মহালক্ষ্মী মায়ের বাড়ীতে পাকা দেওয়ালের বাহিরে জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে কালীনাগ নামে এক ভয়ঙ্কর সর্প থাকিত। ব্রহ্মচারীবাবা রোজ রাত্রে কালীনাগকে ভোগ দিতেন। নাগ আসিয়া সেই ভোগ গ্রহণ করিত।

এখানে সাধনভজন করিতে থাকাকালে ব্রহ্মচারীবাবা শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী-মায়ের আবির্ভাব করাইয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাওয়ার জন্য মায়ের অনুমতি লইলেন। মা বলিলেন, 'আমি যাব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও আমার মূর্ত্তি খরিদ করিয়া আন।' সেই নির্দ্দেশমত ব্রহ্মচারীবাবা মূর্ত্তি খরিদ করিয়া আনিলেন ও স্থির হইল মায়ের কৃপা হইলে তাহা মালনী আশ্রমে লইয়া আসিবেন।

মহালক্ষ্মী মায়ের আঙ্গিনায় বটগাছের তলায় ধীরানন্দ মাঝে মাঝে বাত্রিতে থাকিতেন। একদিন রাত্রে তাঁহার প্রস্রাব পাইলে, গেট বন্ধ বলিয়া বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই দেখিয়া বটগাছের তলাতেই প্রস্রাব করিলেন। কিছুকাল পূর্বে মহালক্ষ্মী মায়ের এক পূজারী সর্পদংশনে মারা যান। তিনি ব্রহ্মদৈত্য হইয়া এই বটবৃক্ষে থাকিতেন। ধীরানন্দ বটবৃক্ষের তলায় প্রস্রাব করিলে ব্রহ্মদৈত্য তাঁহার উপর ভর করিল। ধীরানন্দের ভীষণ জ্বর হইল। মহালক্ষ্মী মায়ের বাড়ী হইতে আসিবার সময়ে তাঁহাকে সোয়ারী করিয়া ষ্টেশনে আনিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ধীরানন্দের কাছে ব্রহ্মচারীবাবা বসিয়া আছেন। ধীবানন্দ দেখিলেন, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি যেন তাঁহাব ঘাড়টা ভাঙ্গিয়া দিল আর ধীরানন্দ কাঁৎ করিয়া উঠিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভয় পাইয়াছ?' তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই বলিলেন। বাবা বলিলেন, 'ভয় নাই। তোমাকে ব্রহ্মদৈত্য পাইয়াছে।'

ধীরানন্দকে সোয়ারী করিয়া ষ্টেশনে আনিয়া গাড়িতে তোলা হইল। গাড়ীতে তিনি প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা ধীরানন্দজীকে বাহাদিয়ার বাড়ীতে তাঁহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর ব্রহ্মচারীবাবা মালনী আশ্রমে গিয়া লক্ষ্মীপূজার দিন মহালক্ষ্মী মাকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ইহার আগে ব্রহ্মচারীবাবা মহালক্ষ্মী মায়ের বাড়ীতে গিয়া সাধন-ভজন আরম্ভ করিলে সেই ব্রহ্মদৈত্য তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'তোমাকে আমি রাখিয়া দিব।' বাবা বলিলেন, 'পারিলে রাখিবা।' 'যে-কোন

একজনকে রাখিবই।' ব্রহ্মচারীবাবা এই সব ঘটনার কথা আগে বলেন নাই। যাহা হউক মালনী আশ্রমে আসিয়াই বাবা ব্রহ্মদৈত্যের নামে ভোগ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

এদিকে ধীরানন্দজী তাঁহার বাড়ীতে ডাক্তারের চিকিৎসায় ও মায়ের সেবাযত্নে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সুস্থ হওয়ার পর ফাল্গুন মাসে ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা করিলেন। ব্রহ্মচারী বাবা তখন মালনী আশ্রমেই আছেন। সেখানে দিগিন্দ্র ভট্টাচার্যও নিজের আগ্রহে সমাজসংস্কারের কাজে নিযুক্ত হইলেন। এই কাজ চলিল ১৩৩১ সালের শেষের দিক হইতে ১৩৩২ পর্যন্ত। অতঃপর অশ্বিনীকুমার ধর কবিরাজ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী মহাশয় সংসার পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবার আরব্ধ কাজ সমাজসংস্কার, 'সোনার ভারত' পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার ইত্যাদি নানা কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। যোগানন্দজীও এইসব কাজে যোগ দিয়াছিলেন।

১৩৩২ সনে ব্রহ্মচারীবাবা খুব কর্মব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার পত্রাবলীতে উল্লিখিত সিংরৈলের শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্তের নিকট লিখিত পত্রখানা পাঠ করিলেই ইহা উপলব্ধি হয়। যেসব কাজে তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন তাহা সম্পাদনে কত দায়িত্ব তাঁহার ছিল। পরবর্তী কালে তাঁহার এই আদর্শ ৺ভগবৎ কৃপায় স্বয়ং রূপায়িত হইয়াছে। মহাপুরুষদের কাজ এইভাবেই হয়।

১৩৩২ সনেরই অগ্রহায়ণ মাসে ব্রহ্মচারীবাবা কাওরাইদে ভক্ত মুরারি দে'র বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী মায়ের পূজা উপলক্ষে গিয়াছিলেন। সেই পূজার পূজক ছিলেন শঙ্করানন্দজী, তন্ত্রধারক অশ্বিনীকুমার ধর; চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন সুরেন্দ্রমোহন দত্ত। ব্রহ্মচারীবাবাকে লক্ষীয়া আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য কাঁঠালতলীর উপেন্দ্র রায়, তারক চক্রবর্তী, শঙ্কর দাস, ঈশ্বরচন্দ্র ধর প্রভৃতি ভক্তরা ছাড়াও কাঁঠালতলী হইতে অতুল মাষ্টার, শশী দে প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন কাওরাইদে মুরারি দে'র বাড়ীতে। ধীরানন্দজী ও যোগানন্দজীও

আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা অসুস্থ থাকায় মুরারিদা তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য রাখিয়াছিলেন। পূজা শেষ হইলে পর ভক্তরা সবাই চলিয়া গেলেন।

মুরারিদা প্রায় দুই মাস ব্রহ্মচারীবাবাকে নিজ বাটিতে রাখিয়া ঢাকার রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়কে দিয়া চিকিৎসা করাইলেন। ধন্য ভক্ত মুরারিদা! তাঁহার স্ত্রীও খুব ভক্তিমতী ও উত্তম সেবিকা ছিলেন।

যোগানন্দজী মাতৃভাণ্ডারের কাজে ব্যস্ত আছেন। 'সোনার ভারত' পত্রিকা ছাপানো ও প্রচার কাজেও তিনি নিরত। এই সময় উধমপুর হইতে মোক্ষদানন্দজী আসিয়া কাওরাইদে ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া ধীরানন্দ, যোগানন্দ ও শঙ্করানন্দজী কাওরাইদে মোক্ষদানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। মোক্ষদানন্দজী ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে কাওরাইদ থাকিয়া গেলেন! ব্রহ্মচারীবাবা কাওরাইদ আছেন জানিয়া কেদার সরকার বিবাহের পরই তাঁহার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। এই শেষ দেখা। কেদার সরকারের স্ত্রী ইন্দুবালা পত্রযোগে ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছেন।

১৩৩২ সনের ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে মোক্ষদানন্দজীকে লইয়া ব্রহ্মচারীবাবা কাওরাইদ হইতে নেত্রকোনা মালনী আশ্রমে আসিলেন। মোক্ষদানন্দজী মাতৃভাণ্ডারের কাজে যোগানন্দজীর সঙ্গে যোগ দিলেন। ফাল্গুন মাসে পাবনার দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মালনী আশ্রমে আসেন। তখন ব্রহ্মচারী বাবা মালনী আশ্রমে একটি সমিতি গঠন করিয়া আশ্রমের ভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিলেন এবং গম্ভীর চিত্তে মহাপ্রয়াণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আশ্রমের কাজকর্মও অনেক কমাইয়া ফেলিলেন। পত্রিকার কাজও বন্ধ হইয়া গেল।

দুর্ভাগা ১৩৩৩ সন আসিয়া উপস্থিত হইল। উপেন্দ্র রায় মহাশয় প্রায়ই আশ্রমে থাকিয়া অসুস্থ ব্রহ্মচারীবাবার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। আশ্রমের সন্ন্যাসী ভক্তরা নানা জায়গায় চলিয়া গেলেন। মহালক্ষ্মী

মায়ের পূজায় সুমতির প্রাধান্য স্থাপিত হইল। মহালক্ষ্মী মায়ের পূজা কুমারী ছাড়া কেহ করিতে পারিবে না। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে থাকিয়া মায়ের পূজা করিতে হইবে। আশ্রমের নিয়ম মাদকতা বর্জন এবং মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এইসব এবং আরও সব কঠোর নিয়মাবলী সাইন-বোর্ডে লিখিয়া আশ্রমে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইসব কঠোর অনুশাসনের জন্য অনেকেই অন্য আশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন। জগদলেও আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইলে পিসিমা কুমুদিনী. গোবিন্দ সাধু সবাই চলিয়া গেলেন।

ধীরানন্দ, যোগানন্দ, মোক্ষদানন্দ, জ্যৈষ্ঠমাসে লক্ষ্মীয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। কান্তিদানন্দ আগেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। অশ্বিনী ধর, সুমতি ও ব্রহ্মচারীবাবা আশ্রমে থাকিলেন। শঙ্করানন্দও মাঝে মাঝে গিয়া থাকিতেন। আশ্রম প্রায় খালি। উপেন্দ্র রায়ও মাঝে মাঝে গিয়া থাকিতেন।

১৩৩৩ সনে ব্রহ্মচারীবাবা আব আশ্রম হইতে বাহির হন নাই। ঐ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে ধীরানন্দ তাঁহার মাতাসহ মোক্ষদা-নন্দকে নিয়া তীর্থযাত্রায় রওনা হইলেন। কাওরাইদ গিয়া ৺কাশীধামের টিকিট কাটিয়া কাশী গেলেন। মাকে ৺বিশ্বনাথ মণিকর্ণিকা ইত্যাদি সমস্ত দর্শন করাইলেন। পরে প্রয়াগ গিয়া ত্রিবেণীতে স্নান তর্পণ শেষ করিয়া এলাহাবাদ গেলেন ও সেখান হইতে বৃন্দাবনধামে গেলেন। বৃন্দাবনে রেণুলাল পাণ্ডার বাড়ীতে থাকিয়া বৃন্দাবন মথুরা ও বেলবন ইত্যাদি সমস্ত জায়গা দর্শন করিলেন। বেলবনের সেবাইত ব্রহ্মচারী বাবাকে বিশেষভাবে চিনিতেন। আগের বছর মাসখানেক বেলবনে থাকিয়া এখানের মহালক্ষ্মী মাকে আবির্ভাব করাইয়া তাঁহাকে নিয়া গিয়াছেন। সেবাইত ঠাকুর বলিলেন, 'আমি দেখিয়াছি ভারত ঋষি রথে করিয়া চলিয়াছেন। তুমি তাঁহার রথে ঝুলিয়া যাইতেছ।'

গত বছর লক্ষ্মীমাকে নিয়া যাওয়ার পর বেলবনে মহালক্ষ্মী মায়ের আঙ্গিনায় ৬।৭ হাত বন্যার জল হওয়ায় মাকে মন্দির দালানের উপর

উঠাইয়া পূজার্চ্চনা হইত। এইসব দেখিয়া বৃন্দাবন হইতে গয়া গিয়া শ্রাদ্ধাদি করিয়া পথে বৈদ্যনাথধাম দর্শন করিয়া খড়্গপুর হইয়া রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধাম গেলেন। পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা দর্শন করিয়া কলিকাতায় ৺কালীমাতা দর্শন করিয়া মোক্ষদানন্দ উধমপুর চলিয়া গেলেন। ধীরানন্দ মাকে নিয়া নবদ্বীপ মহাপ্রভু দর্শন কবিয়া বাহাদিয়া গ্রামের বাড়ীতে মাকে পৌছাইয়া দিলেন। তখন শ্রাবণ মাস। ধীরানন্দ মাকে নিয়া বাড়িতেই রহিলেন। আষাঢ় মাসের প্রথমভাগে যোগেন্দ্র আসাম যাইবে শুনিয়া যোগানন্দও আসাম যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অম্বুবাচী উপলক্ষে আসাম কামাখ্যা মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে নওগাঁও গিয়া যোগেন্দ্রকে এক আত্মীয়-বাড়ীতে রাখিয়া যোগানন্দ আসামের নানা জায়গা ঘুরিয়া আবার পর্য্যটনে চলিয়া গেলেন। হবিদ্বার হৃষীকেশের দিকে। শান্তিদানন্দও পর্য্যটনে ছিলেন। সন্ন্যাসী ভক্তেরা প্রায় সকলেই পর্য্যটনে। কুমুদানন্দ বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া বাড়িতেই আছেন।

ব্রহ্মচারীবাবা মালনী চিত্রধাম আশ্রমে আছেন। তাঁহাব মহাপ্রয়াণের দিন আগতপ্রায়। আশ্রমপাড়ার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ী হইতে বড় পঞ্জিকা আনিয়া যাত্রার শুভদিন দেখিলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। ঐ সময়ে কাঁঠালতলীর উপেন্দ্র রায় ব্রহ্মচারীবাবার নিকট ছিলেন। উপেন্দ্রবাবুকে ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন, 'তুমি বাড়ী থাক। মা বলিয়াছেন এই ভাদ্র মাসটা পার হইলে আমি অনেক দিন থাকিব। কোন চিন্তা নাই, তুমি বাড়ী চলিয়া যাও।' উপেন্দ্র রায় বাবার মহাপ্রয়াণের সপ্তাহখানেক আগে আশ্রম হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তারপব বাবা সুমতিকে বলিয়াছিলেন, 'আমি যদি কোন জায়গায় চলিয়া যাই তুমি সেবা পূজার কাজ ঠিকমত করিতে পারিবে তো?' সুমতি উত্তর করিল 'হ্যাঁ, ঠিকমত করিতে পারিব।' ব্রহ্মচারীবাবার মহাপ্রয়াণের আগের দিন বৈরাটীর পরম ভক্ত বিষ্ণুরাম মাল ব্রহ্মচারীবাবার অসুখের খবর শুনিয়া বাবাকে

দেখিতে আসিলেন। মহাপ্রয়াণের দিন বিষ্ণুরামদা কাছেই ছিলেন। ঐ দিন বিকালে প্রসাদ পাওয়ার পর বাবা বিশ্রাম করিতেছেন। বিষ্ণুরাম বাবার কাছে বসিয়া আছেন। বিষ্ণুরামকে বাবা বলিলেন, 'বিষ্ণুরাম আমাকে একটু বাতাস কর ?' বিষ্ণুরাম পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছেন। তখন ব্রহ্মচারীবাবা দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া শায়িত ছিলেন। হঠাৎ বালিশটা উত্তরদিকে নিয়া উত্তর শিয়রে শয়ন করিয়া তিনবার 'নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া নির্বাক হইলেন। বিষয়টা বিষ্ণুরাম বুঝিতে পারিয়া হাঁকডাক করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সুমতি দৌড়াইয়া আসিয়া কান্নাকাটি শুরু করিল। ব্রহ্মচারীবাবা মহাপ্রয়াণ করিলেন। তারপর বহু লোক আসিয়া একত্রিত হইলেন। নানা যায়গায় ভক্তদের টেলিগ্রাম করা হইল। অনেকেই আসিলেন। পরের দিন ভক্তবৃন্দ সকলের উপস্থিতিতে ব্রহ্মচারীবাবার মরদেহ মালনী আশ্রমে সমাধিস্থ করা হইল। ১৩৩৩ সনে ২৮শে ভাদ্র রাধাষ্টমী তিথি ছিল। ঐ তিথিতে মালনী আশ্রমে মহাসমারোহে তিরোভাব তিথি উদ্‌যাপিত হইয়া আসিতেছে। এই সমুদয় বিবরণ শ্রীধীরানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। তিনি এখনও সুস্থ শরীরে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে দৃষ্টিহীন অবস্থায় পূর্ণ যোগ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীমৎ ধীরানন্দ ব্রহ্মচারী

ধীরানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা। ১৩৩৩ সনের শ্রাবণ মাসে মাকে নিয়া তীর্থভ্রমণ শেষে বাড়িতে আসিলেন এবং মায়ের নিকট থাকিতেন। আশ্বিন মাসের প্রথম দিকে লোকমুখে শুনিতে পাইলেন যে ব্রহ্মচাবীবাবা দেহত্যাগ করিয়াছেন। শুনিয়াই তিনি নেত্রকোনা বওনা হইয়া গেলেন। দেহত্যাগের তেরদিন পর সব ভক্তেরা ব্রহ্মচারী বাবার তিবোভাব উৎসব করেন মালনী চিত্রধাম আশ্রমে, যেখানে বাবার দেহত্যাগ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ধীবানন্দদাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন লক্ষ্মীয়ায়। কাশ্মীবের উধমপুবে মোক্ষদানন্দকে তিনি ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের খবর টেলি করিয়া জানাইলেন। ১৩৩৩ সনের কার্ত্তিক মাসে ধীরানন্দ উধমপুরে মোক্ষদানন্দের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে যোগানন্দ হৃষীকেশে ছিলেন। কয়েকদিন আগে উধমপুরে মোক্ষদানন্দের নিকট ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের খবব পাইয়া পুনরায় হৃষীকেশ চলিয়া গেলেন। ধীরানন্দ কিছুদিন মোক্ষদানন্দের নিকট উধমপুর থাকিয়া ফাল্গুন মাসে কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বার গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদ্বাবে গঙ্গার ধারে যোগনন্দ ও বিরজানন্দের সঙ্গে দেখা হইল। হরিদ্বার কুম্ভমেলায় মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ, যোগানন্দ ও বিরজানন্দ চারজন মাসখানেক হৃষীকেশে একত্র থাকিলেন। কুম্ভমেলার মাসখানেক সময় বাকি ছিল। হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা শেষ করিয়া মোক্ষদানন্দ বিরজানন্দকে নিয়া লাহোর আসিলেন। লাহোর হইতে রাউলপিণ্ডি হইয়া বারমুল্লায় একজন পণ্ডিত দণ্ডী ব্রহ্মচারীর নিকট কিছু সাধন করিলেন। যোগানন্দ একা সারদাপীঠে রওনা হইলেন। সারদাপীঠে তিনি ৺সরস্বতী মায়ের দর্শন লাভ করিলেন। তারপর সেখান হইতে ফিরিবার পথে দুর্গম রাস্তায় ভয়ানক জ্বর হইল। সেখানে জনমানবশূন্য পাহাড় জঙ্গল। এই অবস্থায় একটা গাছের নীচে শুইয়াছিলেন, তখন আদেশ

পাইলেন যে বন্য মহিষ আসিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া অন্য একটা গাছের আড়ালে গিয়া বসিলেন। এদিকে বন্য মহিষেব দল নিকট দিয়াই চলিয়া গেল। তাহারা ফিরিয়াও চাহিল না। বাঁচিয়া গেলেন। তাবপর রাত হইল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটা পাহাড়ীলোকের বাড়ীতে গিয়া কোনমতে রাত্রি যাপন কবিলেন। জ্বর ছাড়িলে এক ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে আপনি দয়া করিয়া একটু অন্নপথ্যের ব্যবস্থা করিলে ভালো হয়। অতিথিবৎসল ব্রাহ্মণ চাউল যোগাড় করিয়া অন্নপথ্য দিল। অন্নপথ্য কৰিয়া পুনবায় সেখান হইতে একা রওনা হইয়াছিলেন। বাবমুল্লায় দণ্ডী ব্রহ্মচাবীর আশ্রমে ধীরানন্দের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাবপব দণ্ডী ব্রহ্মচাবী দুইজনকে নৌকা কবিযা ক্ষীবভবানী মায়েব বাডীতে নিয়া গেলেন। এই ক্ষীবভবানী মাযেব বাড়ীতে প্রত্যহ ৮মণ দুধের ক্ষীর করিয়া ভোগ দেওয়া হইত। ক্ষীবভবানী মায়েব বাড়ীর ভগ্নদশা দেখিয়া বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—যবনবা তোমাব এই দশা করিল। আমি থাকিলে তাহার প্রতিশোধ নিতাম। তখন ক্ষীরভবানী মা আদেশ করিলেন—তুমি যে ধর্মপ্রচার করিয়া আসিয়াছ আমেরিকায় তাহা তোমার ইচ্ছায় নয় আমার ইচ্ছায়। আব আমার মন্দির আমি ইচ্ছা করিলে একরাত্রে স্বর্ণমন্দির কবিয়া ফেলিতে পারি। আমার মন্দির তুমি কি সংস্কার কবিবে? প্রয়োজন হইলে আমার মন্দিব আমিই সংস্কার করিব। এই আদেশ পাইয়া বিবেকানন্দ সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারাও ২।১ দিন থাকিয়া পুনরায় ঐ নৌকায় দণ্ডী ব্রহ্মচারীর সঙ্গেই বারমুল্লা চলিয়া আসিলেন। সেখান হইতে কাশ্মীবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নারায়ণ মঠে আসিয়া পৌছিলেন। কাশ্মীরে সপ্তাহ-খানেক থাকিয়া ব্রহ্মচারীবাবার ২য় বার্ষিক তিরোভাব উৎসবে যোগদান করিবার জন্য অমরনাথ দর্শন সংকল্প ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের দিকে রওনা হইলেন। বাসে উধমপুর আসিবার রাস্তায় বিরজা-নন্দকে পাইলেন। তিনিও অমরনাথ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ফিরাইয়া সাথী করা হয় এবং উধমপুর আসা হয়। এখানে ২।১ দিন

থাকিয়া পরে লাহোরে, তথা হইতে ৺কাশীধাম, কাশীধাম হইতে কাটিহার, কাটিহার হইতে বাহাদুরাবাদ ময়মনসিংহ হইয়া নেত্রকোনা মালনী আশ্রমে উৎসবের আগে পৌঁছিলেন। এখানে ভক্তমণ্ডলীর মনোভাব দেখিয়া উৎসবপর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা তিনজন কাওরাইদ মুরারি দে'র বাড়িতে আসিলেন। মুরারি দে'র বাড়ীতে আশ্বিন মাসে দশভুজা মায়ের পূজার নিমন্ত্রণ লইয়া তিনজন লক্ষ্মীয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন ১৩৩৪ সনের ভাদ্র মাস। সকলে মিলিত হইয়া লক্ষ্মীয়া আশ্রমে অহোরাত্র কীর্ত্তন সহকারে মহাসমারোহে তিরোভাব উৎসব পালন করিলেন। পুনরায় আশ্বিন মাসে মুরারি দে'র বাড়ীতে আসিয়া ৺দশভুজা মায়ের পূজায় যোগ দিলেন। শঙ্করানন্দ পূজক, ধীরানন্দ তন্ত্রধারক, যোগানন্দ চণ্ডীপাঠ করিয়া মায়ের পূজা শেষ করিলেন। তারপর তাঁহারা লক্ষ্মীয়া চলিয়া যান। ধীরানন্দ ব্রহ্মচারী লক্ষ্মীয়া বাহাদিয়া রহিয়া গেলেন। যোগানন্দ ও বিরজানন্দ বাহিরে চলিয়া গেলেন। বিরজানন্দ ১৩৪৮ সালে উধমপুরে মোক্ষদানন্দের কুটিরে মারা গেলেন। যোগানন্দ এই সময়ে কংগ্রেসের কাজে যোগদান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে শঙ্করানন্দ, ভূমানন্দও ছিলেন। তাঁহারা গান্ধীজির লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৩৩৭ সালের ময়মনসিংহে মুসলমান রায়টের সংবাদ পাইয়া ময়মনসিংহ চলিয়া আসেন।

১৩৩৮ সনে যোগানন্দ আবার বাহির হইলেন। প্রথম বৎসর বারদীর ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রমে অতিবাহিত করিয়া তারপর আবার পর্য্যটনে দাক্ষিণাত্যসহ সারা ভারত ঘুরিয়া পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সাধ্য-সাধনা করিয়া আশ্রমে স্থায়িভাবে থাকিবার অনুমতি পাইয়া পুনরায় গুরুভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে শুরু করিলেন। সকলেরই বাহিরের ঘোরাফেরা কমিয়া গেল। ১৩৪৫ সনে যোগানন্দ কেদারবাবুকে প্রথম আনিলেন। তিনি আগষ্ট দর্শন উপলক্ষে আসিয়া দুইমাস থাকিয়া আবার দেশে ফিরিয়া গেলেন। তখনই বিমলাকে পণ্ডিচেরী আনার কথাবার্ত্তা হয়। ১৩৪৬ সনে বিমলা পণ্ডিচেরী

আসিলেন। ১৩৪৫ সনে লক্ষ্মীয়া হইতে মোক্ষদানন্দ পণ্ডিচেরী আশ্রমে আসিলেন এবং ১৩৪৫।৪৬।৪৭।৪৮ এই চারি বৎসর সেখানে থাকার পর উধমপুর গিয়া আর বাহির হইলেন না। সেখানেই ১৩৮১।৮২ সনে মোক্ষদানন্দ মারা যান। ধীরানন্দ ১৩৪৬ সনে লক্ষ্মীয়া হইতে পণ্ডিচেরী আসেন। ১৩৪৭ সনে মায়ের চক্ষু অপারেশনের জন্য আবার লক্ষ্মীয়া বাহাদিয়ার বাড়ীতে গেলেন। মায়ের চক্ষু অপারেশন করিয়া বাড়ীতে থাকিলেন। আবার ১৩৫৪ সনে পণ্ডিচেরী আসিয়া ১৩৫৫ সনে পুনরায় মায়েব অবস্থা খাবাপ শুনিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। ১৩৫৬ সনে মা মাবা যান। শ্রাদ্ধশান্তি মহোৎসব শেষে ১৩৫৭ সনে আশ্রম-মাতাকে তুই হাজার টাকা দিয়া আশ্রমবাসী হইলেন। ইতিমধ্যে ২।৩ বাব যাতায়াত করিয়াছেন। শেষ আসিয়াছিলেন ১৩৭০ সনে। আজ পর্য্যন্ত পণ্ডিচেরী আশ্রমেই আছেন। ১৩৭৭ সনে চক্ষু অপারেশন করিলে বাম চক্ষু নষ্ট হয় ডান চক্ষুও পরে অপারেশনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইভাবেই এখন ১৩৭৭ সন পর্য্যন্ত সাধনভজন করিয়া ভালই আছেন। আরও এক ভক্ত নেত্রকোনা মহকুমার আইথর গ্রামের শ্রীলালমোহন সরকার (কেন্দুয়া হাইস্কুলের ছাত্র) ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ম্যাট্রিক পাস করিয়া কিছুদিন ব্রহ্মচারীবাবার নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবাপূজা করিয়াছিলেন। পরে কম্পাউণ্ডারি পাস করিয়া বর্দ্ধমান মহারাজার হাসপাতালে চাকুরি পাইয়া চলিয়া যান। সেখানেই নিষ্ঠার সহিত সাধনভজন করিয়া সেবাব্রতী হিসাবে হাসপাতালে চাকুরি করিতেন। তাঁহার এই নিষ্ঠার জীবনযাপন করার খবর সেখানের সকলেই জানতেন। ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। ব্রহ্মচারীবাবা দেহত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া লালমোহনও বর্দ্ধমানে তাঁহার বাসস্থানে পদ্মাসন করিয়া যোগসমাধিস্থ হইয়া দেহত্যাগ করেন। মহারাজা এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সমাধিস্থানে একটি মন্দির স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান।

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

যোগানন্দ ব্রহ্মচারী ১৩৩৮ সনে শেষ পর্য্যটনে বাহির হইয়া প্রায় এক বৎসর বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রমে থাকিয়া আবার ভারতবর্ষ পর্য্যটনে বাহির হন। দক্ষিণভারতেব তীর্থস্থানগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ ও পণ্ডিচেরী আসিয়া কিভাবে শ্রীঅববিন্দ আশ্রমে স্থান পাইয়াছেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ তিনি তাঁহাব রচিত মহাবির্ভাব গ্রন্থে উল্লেখ কবিয়াছেন। তিনি শ্রীঅবাবন্দ আশ্রমে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের নিকট ব্রহ্মচারীবাবার সম্বন্ধে লিখিতভাবে যাবতীয় ঘটনাবলী জানাইলে শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচারীবাবা খুব উচ্চস্তরের মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, শঙ্করাচায্য হইতেও তোমার গুরু বিস্তৃত জ্ঞানী ছিলেন। ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন যে জগন্মাতা মনুষ্যদেহ ধাবণ করিয়া আবির্ভাব হইয়াছেন। কোথায় তিনি আছেন আমাকে বলেন নাই। ব্রহ্মচারী বাবা বলিয়াছেন যে, মা বলিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের জেঠা। তাহাও শ্রীঅরবিন্দকে যোগানন্দ লিখিয়াছিলেন। তাহার অর্থ বয়সে বড় জেঠা নয়। জ্ঞানে বিবেকানন্দেব জেঠা। মা আমাকে আধ্যাত্মিক কোন অভাবে রাখেন নাই। তথাপি যদি মা বলেন তবে আমার যাইতে কোন বাধা নাই। শ্রীঅরবিন্দ এই কথার উত্তব দিয়াছেন যে, মা নির্দিষ্টভাবে তাঁহাকে কোন আদেশ দেন নাই। দিলে নিশ্চয়ই আসিতেন এবং তাহা হইলে অনেক কাজ হইত। তবে তোমাব গুরুর সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে সব আলোচনা হইয়াছে। তিনি মাযেব আবির্ভাব ও কাজেব পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচাবীবাবা সন্ন্যাসী ভক্তদের পর্য্যটনে যাইবার আদেশ দিলে যোগানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পর্য্যটনে আমরা কি পরিচয় দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিব? তিনি বলিয়াছিলেন, বারদীর লোকনাথবাবার কথা বলিবে। আর

যদি মৎসদৃশ ত্রিকালজ্ঞ ঋষির দেখা পাও তবে তিনি আমাকেও চিনিবেন। যোগানন্দ ত্রিকালজ্ঞ ঋষি শ্রীঅরবিন্দের নিকট আসিয়া গুরুদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীঅরবিন্দ তাহার প্রমাণ দিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন, মা নরদেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূ্তা হইয়াছেন, কিন্তু কোথায় নরদেহ ধারণ করিয়া আর্বিভূতা হইয়াছেন তাহা বলেন নাই। যোগানন্দ শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মা-ই কি সেই মা ?

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন, তিনি যে-মা নরদেহে আবির্ভূ্তা হইয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন এই মা-ই সেই মা। শ্রীঅরবিন্দকে তিনি ব্রহ্মচারীবাবার সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রশ্ন করিয়াছেন যোগানন্দ 'মহাবির্ভাব' গ্রন্থে তাহারই ব্যাখা করিয়াছেন। মহাবির্ভাব গ্রন্থ না পাঠ করিলে ব্রহ্মচারীবাবা যে কি মহাপুরুষ ছিলেন তাহা বুঝিতে পারিবেন না। যোগানন্দ শ্রীমাকে ব্রহ্মচারীবাবার ফটো দেখাইয়াছিলেন। ফটো দেখিয়া শ্রীমা বলিয়াছেন, তোমার গুরুর মুখখানা প্রেম মাখা। তিনি আমার সঙ্গে সব সময়ই থাকেন। ব্রহ্মচারীবাবা একদিন বলিয়াছিলেন দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের ভিতর দিয়া মহাবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এবার মা বাবা এসেছেন বাৎসল্য ভাবের ভিতব দিয়া প্রচার করিবেন। মার সঙ্গে কুমারী মেয়ে থাকিবে। আমরা পণ্ডিচেরীতে মায়ের সঙ্গে একটি কুমারী মেয়ে শ্রীচিন্ময়ীকে দিবারাত্র থাকিতে দেখিয়াছি। মা এবার কুমারী মেয়েকে আশ্রমে ভর্তি করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মচারী বাবা বলিয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দকে আমি এত উর্দ্ধে দেখিতে পাই যে তিনি যদি নীচে নামেন তবে জগতের অসম্ভব কাজ সাধন হইবে। সেই 'অতিমানস তত্ত্ব' শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীতে অবতরণ করাইয়া গিয়াছেন। তাহার প্রভাব পৃথিবীতে আস্তে আস্তে বিকাশ হইবে। অতিমানস সম্পূর্ণভাবে অবতরণ করিলে আসুরী শক্তির কাজ থাকিবে না। আসুরী শক্তি তাহাদের প্রভাব বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। সেই যুদ্ধে অদূর ভবিষ্যতে আসুরী শক্তির পরাজয় হইয়া দেবতা-মানবে

এই ধরাধামে অপূর্ব লীলা হইবে। আর এক কথা ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ পথে বসা আছেন। তাহাও জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। আমি মায়ের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা কবিতেছিলাম। সেই সময়ে যে 'পথে বসা' বলিয়াছেন তাহা ঠিক।

যোগানন্দ গুরুভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করিলে যাঁহারা আশ্রমে থাকিতে চাহিয়াছেন শ্রীমা তাঁহাদের সকলকেই আশ্রমে স্থান দিয়াছেন। ব্রহ্মচারী বাবার স্পর্শে যাঁহারা ছিলেন সকলেই অনায়াসে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শ্রীমার কৃপা পাইয়াছেন। স্বামী অভয়ানন্দের শিষ্য লক্ষ্মীয়া গ্রামের পূর্ণানন্দ যোগানন্দের পরিচয়ে প্রথম আসেন। পরে উধমপুর হইতে মোক্ষদানন্দ ও বনগাঁও হইতে কেদার সরকার, লক্ষ্মীয়া হইতে ধীরানন্দ, তারপর বিমলা (তাঁতের কাজ করে), ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী, যোগদানন্দ, সিংরৈলের যামিনী কর, যোগানন্দের মেজ ভাই শচীন্দ্র, তার পরের ভাই যোগেন্দ্র, তার স্ত্রী সরলা, মেয়ে পারুল ও ছেলে বাদল, শচীন্দ্রেব স্ত্রী সুরবালা ও তাহাদেব সঙ্গে কেদারবাবুর স্ত্রী ইন্দুবালা ও কন্যা নমিতা ১৩৫০ সনে অগ্রহায়ণ মাসে আসিল। তারপর কত লোক আসিয়াছে তাহার গণনা নাই।

পারুল, বাদল ও নমিতা আসার পরই ১৩৫০ সন, ইংরেজি ১৯৪৩ সনের ডিসেম্বর মাসে শ্রীমা পণ্ডিচেরী আশ্রমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহার আগেও কিছু কিছু ছেলেমেয়ে আশ্রমে আসিয়াছিল। প্রথম এই ১০।১২ জন ছাত্রছাত্রী নিয়া বিদ্যালয় শুরু করেন। আজ ১৩৫০ সালে সেই আশ্রম বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ যোগানন্দের নিকট হইতে ব্রহ্মচারীবাবার পরিকল্পনাগুলি জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার কাজের সমস্তই এখানে রূপায়িত হইবে। ব্রহ্মচারীবাবা আশ্রমে একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। যোগানন্দের ভাই যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, দীনতারিণী, সত্যেন্দ্র দে, বীরেন্দ্র, শচীন্দ্র, অপর যোগেন্দ্র, সত্যেন্দ্র রায়, পূর্ণেন্দুবাবুর ভাই মণীন্দ্র এই

কয়েকজনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করিত। এই বিদ্যালয় বেশীদিন পরিচালনা করিতে পারেন নাই। কেদারবাবু এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মচারীবাবার সব পরিকল্পনাগুলি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে রূপায়িত হইয়াছে।

যোগানন্দ পণ্ডিচেরী আসিয়াই গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দকে পর পর সব লিখিয়া জানাইতে শুরু করিলেন এবং তিনিও ব্রহ্মচারীবাবার সম্বন্ধে প্রশ্ন প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া বুঝাইয়া দিতে শুরু করিলেন। সেইসব প্রশ্নের যেমন যেমন উত্তর শ্রীঅরবিন্দ হইতে পাইয়াছেন তাহা এক`ত্রিত করিয়া আশ্রমের একজন বিশিষ্ট সাধক ও লেখক শ্রীঅনিলবরণ রায়ের সাহায্যে তাহা 'মহাবির্ভাব' গ্রন্থখানায় লিপিবদ্ধ করিলেন। যোগানন্দের বিরাট ভ্রমণকাহিনী ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ কাহিনী অনিলবরণ রায় বিস্তারিতভাবে প্রথম খণ্ডে, ব্রহ্মচারীবাবা সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে এবং যোগানন্দ নিজে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী ও ব্রহ্মচারীবাবা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছেন তাহা বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন।

এই 'মহাবির্ভাব' গ্রন্থ লিখিত হওয়ার পরই যোগানন্দ সিংরৈলের যামিনী করকে ব্রহ্মচারীবাবার প্রতিষ্ঠিত চারি আশ্রমের ফটো পাঠাইবার নির্দ্দেশ দিলেন। সেই চারি আশ্রমের ফটো যামিনী কর যোগাড় করিয়া পাঠাইলেন। এই ফটো ব্লক করিয়া ব্রহ্মচারীবাবার ফটো ও ভারতেশ্বরী মায়ের ফটো সবই ব্লক করিয়া নিলেন। তারপর মহাবির্ভাব গ্রন্থ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে ছাপাইতে দিলেন। পণ্ডিচেরী আশ্রমে ভক্ত আর্টিষ্ট সঞ্জীববাবু দ্বারা ব্রহ্মচারীবাবার তিনরঙ্গা ছবি ও ভারতেশ্বরী মায়ের তিনরঙ্গা ছবি ব্লক করিয়া ছাপাইয়া দিলেন সঞ্জীবনবাবু। লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার ফটোও ব্লক করিয়া ছাপাইয়া মহাবির্ভাব গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শান্তিদানন্দ লিখিত কলৌকালী মণ্ডল বা উমাপ্রেম, সত্যগাঁথা, লিঙ্গপূজাতত্ত্ব, ধর্ম্ম-সম্মেলন, ব্রহ্মচারীবাবা নিজের রচিত সত্যযুগাঙ্কুর বইগুলিও লুপ্তপ্রায়

ছিল। তাহাও সংগ্রহ করিয়া মহাবির্ভাবের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার এই গ্রন্থগুলি ছাপা না হইলে আজ তার কোন চিহ্নই থাকিত না। এই বইগুলি দ্বারা আজ ব্রহ্মচারীবাবা কিরকম মহাপুরুষ ছিলেন তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী গ্রন্থখানা যোগানন্দ ব্রহ্মচারী গৌরীপুরের জমিদার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অর্থানুকুল্যে ও গুরুভ্রাতা পূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়ের সাহায্যে কলিকাতা হইতে ছাপাইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী বইখানা কলিকাতায় ছাপাইতে খুব বেগ পাইতে হইয়াছে। পরের বইগুলি পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে ছাপাইতে সহজ হইয়াছে। পণ্ডিচেরীতে পুস্তকগুলি ছাপার খরচ গুরুভাইদের মধ্যে ধীরানন্দ কতক বহন করিয়াছিলেন। বাকি অর্থ যোগানন্দ ব্রহ্মচারী অনেকের নিকট হইতে ঋণ করিয়া দিয়া ছিলেন। বই বিক্রয় করিয়া কতক পরিশোধ করিয়াও দেনা শেষ হয় নাই। সেই প্রেসের দেনা তিনি ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে ফ্রিডম ফাইটার পেনশন পাইয়া পরিশোধ করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার অধ্যাত্মজ্ঞান হইতে মায়ের ভবিষ্যৎ-বাণী উল্লেখ করিয়া শান্তিদানন্দকে বৈরাটি আশ্রম হইতে লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে পত্র দ্বারা যাহা লিখিয়াছেন তাহা ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলীর ৮২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। বাবা শ্রীকৃষ্ণরূপে আমাকে আদেশ ও উপদেশ দিয়া আমাকে একটু জ্ঞান দিলেন এবং মাকে আনিয়া আমাকে মায়ের কোলে দিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং জানাইলেন—আমরা আসিয়াছি জগতের মঙ্গল বিধান করিতে। আরও বলিলেন—আমরা অর্থাৎ আমি দেবতাগণ নিয়া ইউরোপে মহাসমরে ব্রতী হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিব। তৎপর ভারত স্বাধীন করিয়া—সত্যধর্ম সংস্থাপন করিয়া দেবতা ও মানবের সম্মিলনে অপূর্ব লীলা করিব। তারপর আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া নানা দেবতার আবির্ভাব নানা ক্ষেত্রপীঠ হইতে শক্তি সহযোগে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বামন, রামাদি ও বুদ্ধ শংকরাদি, এমন কি

লোকনাথ, রামকৃষ্ণাদি মহাপুরুষ নিয়া মা জগতের মঙ্গল বিধানের জন্য ব্রতী হইয়াছেন।

এই বইগুলি ছাপা না হইলে ব্রহ্মচারীবাবার অধ্যাত্ম জীবনের কোন পরিচয় দিবার নির্দশন ছিল না। এই পুস্তকগুলি ব্রহ্মচারীবাবার বাঙ্ময় মূর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। অধ্যাত্ম জগতের শ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচারীবাবার বাঙ্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়াই তিনি শ্রীশ্রীজগজ্জননীর মহাবির্ভাবের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার উপরোক্ত পত্রেও তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেন, কোন্ পর্ব্বতের কোন্ গুহায় কোন্ পিপীলিকাটা নড়েচড়ে তাহা আমার দৃষ্টি এড়ায় না। তাহার অর্থ এই যে, তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছিলেন বলিয়া তাঁহার অজানা কিছুই ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী তারও বাবা আমি। বাবা বলিয়াছেন, এবার মা আমাকে ভেদাল্যার মুথা উঠাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবা জাতিভেদ মানিতেন না। জাতি বলতে মনুষ্যজাতি, পশুজাতি, পক্ষীজাতি ইত্যাদি। মানুষ মাত্রেই ভগবানের আরাধনার অধিকারী। তাই আচণ্ডাল ব্রাহ্মণাদি সকলকেই তিনি ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। শূদ্রকে উপনয়ন দান করিয়াছেন। বলিতেন, নিজের পূজা নিজেকেই করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীবাবার অনেক শূদ্র ভক্ত নিজেরাই ৺দূর্গাপূজা করিয়াছেন। বাবা বলিয়াছিলেন যে, বিবাহের মন্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় (মাতৃভাষায়) ব্যাখ্যা করিয়া পাত্রপাত্রীকে বুঝাইয়া দিবার জন্য। নতুবা বিবাহের কি অর্থ, স্বামী-স্ত্রীর কি সম্বন্ধ তাহা অনেকেই বুঝে না। তাই নানা রকম অশান্তির স্থষ্টি হয়। ঐ মন্ত্রগুলি বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা হয় নাই। অর্থনীতি সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন যে, গ্রামের চাষীরা সকলে একত্র হইয়া প্রতি গ্রামে একটি করিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করিয়া গ্রামের সমস্ত ফসল সেই ব্যাঙ্কে জমা দিয়া প্রয়োজনীয় সব কাজ ব্যাংকের সাহায্যে পরিচালনা করিবে। ব্যাঙ্কই সব ফসল

কেনাবেচা করিবে। অর্থের প্রয়োজন ব্যাঙ্কই মিটাইবে। এইভাবে চলিলে অর্থসংকট কিছুটা লাঘব হইবে। প্রয়োজনমতে সকলেই চাষাবাদ করিতে পারিবে। চাষে কোন বাধা-নিষেধ থাকিবে না। হাসানপুরের নকুল সরকারের গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবা নিজে উপস্থিত থাকিয়া সকলের দ্বারাই লাঙ্গল ধরাইয়া মনের মধ্যে যে দ্বিধা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ, গ্রামে গ্রামে তুলার চাষ করিবে। প্রয়োজন হইলে নিজে সুতা কাটিয়া নিজের বস্ত্র নিজে তৈয়ার করিয়া লইবে। তাহা হইলে আর বস্ত্রসমস্যা থাকিবে না। মনুষ্য জীবনের প্রধান কাজ ঈশ্বর লাভ। সেইজন্য শ্বাসে শ্বাসে মন্ত্র জপ করিবে। ভুলেও মিথ্যা বলিবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলিলে শক্তি কমিয়া যায়। নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা করিবে। ইহা একান্ত প্রয়োজন। দিবসে ত্রিসন্ধ্যা কর বা না কর, নিশিতে নিবিষ্ট মনে উপাসনা কর। রাত্রিতে বিছানায় বসিয়া জপ করিবে। জপ করিতে করিতে তন্দ্রা আসিলে যে সামান্য ঘুম হইবে তাহাই শরীরের জন্য যথেষ্ট। বেশী ঘুমাইলে আলস্যহেতু তমসাপ্রাপ্ত হইবে। ঘুম ভাঙ্গিলেই জপ করিতে থাকিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধমনে উপাসনা করিবে। উপাসনার শেষে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হইবে। প্রয়োজনমত সব কাজ নিজে করিবে। নিজের কাজ নিজে করিতে নিন্দা নাই। ৺ভগবানের উপর নির্ভর রাখিয়া সংসারে কাজ করিবে। তাহাতে আসক্তি থাকিবে না। কর্ত্তব্যবোধে কাজ করিবে। আসক্তি বন্ধনের কারণ। মাতাপিতা ভ্রাতাভগ্নী স্ত্রীপুত্রপরিবার সকলকেই ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি হিসাবে দেখিবে। ভগবৎজ্ঞানে সেবা করিবে। তবেই অহংকার আসিবে না। ভগবানের কৃপা লাভ হইবে। বর্ত্তমানে মনুষ্যসমাজ অহংকারে মত্ত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম ভালমন্দ জ্ঞান লোপ পাইয়া নানা রকম দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অচিরেই ভগবানের কৃপায় এই আসুরী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া মানুষ ভগবৎচিন্তায় নিযুক্ত হইবে। সুদিন আগতপ্রায়। পণ্ডিচেরীতে

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ যে আদর্শ স্থাপন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা মানবসমাজ গ্রহণ করিতে পারিলেই দেবতা-মানবের অপূর্ব্ব লীলা শুরু হইবে বলিয়া আশা করি। সারা পৃথিবীর মানবসমাজ অশান্তি ভোগের চরম সীমায় অবতীর্ণ হইয়া শান্তির সন্ধান খুঁজিতেছে। ভগবান বাঞ্ছাকল্পতরু, ভগবানের সন্ধান পাইবেই। ভারতবর্ষই বিশ্বশান্তির অগ্রণী হইবে।

৺নরেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল

পূর্ব্ব নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায় নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত ন' পাড়া গ্রামে।

৺নরেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল ব্রহ্মচারীবাবার পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন। প্রথম জীবনে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু পরে ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে খুব যোগাযোগ ছিল না। ইতিমধ্যে সংসার-জীবন যাপন করিতে থাকেন। ময়মনসিংহ শহরে তাঁহার বইয়ের ব্যবসা ছিল। বাংলা বিভাগ হইলে তিনি কলিকাতায় আসিয়া জয়দুর্গা লাইব্রেরী নামে এক বইয়ের দোকান করেন। তাঁর বড় ছেলে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র সান্ন্যাল ময়মনসিংহের ব্যবসা পরিচালনা করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া সান্ন্যালদা বলিয়াছেন। শেষে শ্রীগৌরাঙ্গদা বাংলাদেশ হইতে সব ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিয়া পিতার লাইব্রেরীর আরও উন্নতি সাধন করেন। বরাহনগর ১৯/৬ নং শরৎচন্দ্র ধর রোডে নিজে প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়াছেন। কলিকাতায় শ্রীশ্রীভারত সংঘ নামে গুরুভাইদের যে এক সম্মিলনী আছে সান্ন্যালদা ১৩৬৩ সনে তাহার সভ্য হইলেন। গুরুদেবের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। সকল গুরুভাই-ভগ্নিদের লইয়া কয়েকবারই তিনি ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব খুব আনন্দের সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীশ্রীভারত সঙ্ঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। ব্রহ্মচারী-বাবার শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে স্মারক গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

হইয়াছে তিনি তাহাতে প্রাণ খুলিয়া সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র মৈত্র মহাশয়কে শ্রীশ্রীভারত সংঘে গুরুভাইদের সঙ্গে ভক্ত করে তুলার অবদান সান্যাল মহাশয়ের। সভাপতি থাকাকালীন তিনি ১৩৮৫ সনের ২রা চৈত্র তারিখে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গ সান্যাল, শ্রীশ্যামানন্দ সান্যাল ও এক কন্যা কল্যানী এখন বর্তমান।

৺পূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়

পূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়, পূর্ব্ব নিবাস গচিহাটা গ্রামে, দীক্ষা নিয়াছেন ১৩২৫ সনে। তাঁহার মাতার আহ্বানে ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহাদের বাড়ীতেও গিয়াছেন। পত্রাবলীতে তাহা উল্লেখ আছে। তিনি পড়াশুনা শেষ করিয়া ১৩২৮।২৯ সনে কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহার কার্যস্থল ঠিক করিয়া নেন। তিনি সারা জীবনই সাহিত্যসেবী ছিলেন। কলিকাতায় অনেক সাহিত্যসেবীর সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন। কলিকাতাতেই তিনি সংসার জীবন-অতিবাহিত করিয়াছেন। ময়মনসিংহেরই এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের এক পরমাভক্তিমতী গীতাবাণীর সহিত পূর্ণেন্দুবাবুর বিবাহ হয় এবং উভয়েই বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিষ্ঠার সহিত সংসার-জীবন যাপন করিতেন। শ্রীমৎ যোগানন্দ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী গ্রন্থখানা পূর্ণেন্দুবাবুর সাহায্যেই কলিকাতা প্রেসে ছাপার কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। পূর্ণেন্দুবাবু যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সহিত ছাপার কাজ দেখাশুনা করিয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। বাংলা বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে শ্রীশ্রী৺ব্রহ্মচারীবাবার অনেক ভক্ত শিষ্য দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তন্মধ্যে মহেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে শ্রীমান অরুণকুমার বিশ্বাস ১৩৭৩ সনের ১২ই শ্রাবণ ৺ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসবের আয়োজন করিয়া শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারীকে পণ্ডিচেরী হইতে আহ্বান করিয়া আনেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বসবাস-

কারী গুরুভাইদের সকলকে আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলেন, উৎসবে উপস্থিত সকল গুরুভাইদের লইয়া ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শ অনুসরণ করার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘ নামে একটি মিলন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই সংঘ পরিচালনার ভার পূর্ণেন্দুবাবুর উপর ন্যস্ত হইল। পূর্ণেন্দুবাবু জীবিতকাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সহিত এই সংঘ পরিচালনা করিয়াছেন। এই সংঘের মাধ্যমেই ব্রহ্মচারীবাবার জন্মশত-বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ১৩৫০ সনে পূর্ণেন্দুবাবুর উৎসাহ উদ্যমে ব্রহ্মচারীবাবার বর্ষব্যাপী জন্মশতবার্ষিক উৎসব শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে গুরুভাইদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। শতবার্ষিকী উৎসবের সুরুতে সকলের সাহায্যে ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী গ্রন্থখানা পূর্ণেন্দুবাবুর ব্যবস্থাপনায় ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার উদ্যোগে ব্রহ্মচারীবাবার বিশেষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজ চলিতে থাকে; গ্রন্থটির অর্দ্ধেক ছাপার কাজ শেষ হইতেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং প্রায় দুই বৎসর কাল অসুস্থ থাকিয়া ১৩৮৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের সময় তিনি একপুত্র ও পাঁচ কন্যা বর্তমান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া স্মারকগ্রন্থের কাজ শেষ করিতে হয়।

শ্রীসুধীররঞ্জন সরকার

শ্রীসুধীররঞ্জন সরকারের পূর্ব্ব নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। তিনি ১৩২৮।২৯ সালে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষা নিয়াছেন। তাঁহার বড়ভাই শ্রীসাধনরঞ্জন সরকারও দীক্ষা নিয়াছেন। সাধনবাবু বারাসতে থাকেন। সুধীরবাবু ৩।৭৮ মহাজাতি নগর, বিরাটীতে নিজ বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব বাংলায় থাকাকালীন ব্রহ্মচারী-বাবার কাছে খুব যাতায়াত করিতে পারেন নাই। রামগোপালপুরে জমিদারী সেরেস্তায় তিনি বহুদিন চাকুরী করিয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসেন। এখানে আসিয়া সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া জীবিকার

ব্যবস্থা করেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর আমাদের সংঘের সাথে পরিচিত হন। সেই অবধি সংঘের একনিষ্ঠ সভ্য হইয়া সংঘ পরিচালনায় কাজ করিতে থাকেন। তাঁহার বিরাটীর বাড়ীতে কয়েকবারই ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব পালিত হয়। সুধীররঞ্জন সবকারেব পুত্র বাদল ও পুত্র বধূ উভয়েই উচ্চ শিক্ষিত। শ্রীশ্রী৺ঠাকুরের পরম ভক্ত। শিক্ষান্তে ৺ঠাকুরের নিত্য পূজাও সেবা করিয়া মহাআনন্দে নিজ বাড়ীতে বসবাস করিতেছেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১৯২০ সালের ১০ই অক্টোবর পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ-এর গৌরীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ বোহিণীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের সহোদব অনুজ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (দত্তক—পূর্ব্বনাম রজনীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য) গৌরীপুরের জমিদার ছিলেন এবং ১৯২৫ সালে তাঁহারই অধিকারভুক্ত সুনামগঞ্জ অঞ্চলে একটি 'উপনিবেশ' বা আশ্রম রচনার জন্য তিনি শ্রীভারতকে সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ সময় পূর্ণেন্দুপ্রসাদের পিতৃদেব কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য তাঁহার কাকার জমিদারীতে সদব নায়েব ছিলেন। পূর্ণেন্দু-প্রসাদের বয়স তখন পাঁচ বছর মাত্র। পূর্ণেন্দু-প্রসাদ অবশেষে ১৩৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পণ্ডিচেবী আশ্রমে শ্রীমাকে দর্শন করেন এবং শ্রীভারতের সাক্ষাৎ-শিষ্য যোগানন্দজীর সঙ্গে ঐ আশ্রমেই যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং এই দিকে প্রভাবিত হন। পূর্ণেন্দুপ্রসাদের রচিত 'শ্রীভারত ব্রহ্মচারী' নিবন্ধটি তাঁর শততম জন্মবার্ষিকীর শুভারম্ভে প্রকাশিত ব্রহ্মচারীবাবার পত্রাবলী'র শোভন সংস্করণের ভূমিকারূপে মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি ২৮/১ মান্নাপাড়া রোড, কলিকাতা-৯০ ঠিকানায় স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। নৈহাটি-দোগাছিয়াতে আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন রায়

শ্রীমনোরঞ্জন রায়ের পূর্ব্ব নিবাস হইল গ্রাম বড়ভাগ, কিশোরগঞ্জ। বর্ত্তমানে ৫/২, প্রভুবাস সরকার লেন, কলিকাতা-১৫। ১৯৪৩ সাল হইতে তিনি ব্রহ্মচারীবাবার সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত হইয়া তাঁহার শরণাগতি নিয়াছেন। সিংরৈলের শ্রীযামিনী কর ও মালনী আশ্রমের শ্রীহেমচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকট ব্রহ্মচারীবাবা ও পণ্ডিচেরীর শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি আছে। তিনি খুব একনিষ্ঠ ভক্ত। পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীভগবানচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আত্মীয় হিসাবে তাঁহার পরিচয়ে শ্রীশ্রীভারত সাধন সঙ্ঘে আসিয়া সভ্য হন। তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধাভক্তি ও মনের জোরে আধ্যাত্মিক জগতে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন। যাঁহাদের অধ্যাত্মজ্ঞান আছে তাঁহাদের সংসারেও যথেষ্ঠ কর্ম্মশক্তি আছে। তিনি নিজ কর্ম্মশক্তি ও অধ্যবসায়ের জোরে কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া ৺ঠাকুরের কৃপায় যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। অনেক আত্মীয়-স্বজনকেও সাহায্য করিয়া ব্যবসাবাণিজ্যে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। অনেক গরীবেরও তিনি অভাব মিটাইয়াছেন। মনোবাবু ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই কারণেই তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তির জোরে দীক্ষিত না হইয়াও তিনি ব্রহ্মচারীবাবাকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যাহা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তাঁহারা তিন ভাই, তিনি মেজ। বড় ও ছোট দুইভাই দেশে আছেন। বিষয়সম্পত্তি যথেষ্ট, তালুকদারী তো গভর্ণমেন্ট নিয়া নিয়াছে। চাষের জমি এখনও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে একশত বিঘার উপর বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তিনি দেশের বাড়ী হইতে কোন সাহায্য ছাড়াই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গুণে কলিকাতায় নিজে তো দাঁড়াইয়াছেনই, অনেক দুর্দ্দশাগ্রস্ত আত্মীয়স্বজনকেও দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসবাদিও কয়েকবার

করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসবও তাঁহার বাড়ীতে খুব আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হয়। ব্রহ্মচারীবাবাব স্মারক-গ্রন্থ রচনায় তাঁহাব উৎসাহ ও দান সর্ব্বাধিক। বাবাব অশেষ কৃপায় তাঁহার হৃদয়েব বল দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। তীর্থযাত্রাদিতেও তাঁহার খুব উৎসাহ। ১৩৫০ সালে প্রযাগ পূর্ণকুম্ভ মেলা—শাবীরিক অসমর্থ গুরুভ্রাতা শ্রীভগবান নন্দী, শ্রীযোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী সকলকে নিযা খুব উৎসাহেব সহিত এই প্রচণ্ড শীতেব দিনে দর্শন কবাইয়া আনিয়াছেন। কাহারও কোন অসুবিধাই হয় নাই। ঐ সনেই শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীবৃন্দাবন ধাম, মথুবা, আগ্রা, দিল্লী, হবিদ্বার, হৃষীকেশ ও লছমন-ঝুলা পর্যন্ত আবার ভ্রমণ কবাইয়া আনিয়াছেন। ফিবিবার পথে ৺কাশীধামে বাবা ৺বিশ্বনাথ ও গয়াধামে বিষ্ণুপাদ দর্শন করাইয়াছেন। ১৩৫০ সন (বাংলা ১৩৫০ সনের) ১২ই আগষ্ট শ্রীমনোরঞ্জন বাযের উদ্যোগে বৃদ্ধেব দল শ্রীসুধী-ররঞ্জন সরকার, শ্রীযোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী পণ্ডিচেরী আশ্রমে ১৫ই আগষ্ট তাবিখে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপন করিয়া দক্ষিণ ভারতে মাদুবাই শ্রীশ্রীমীনাক্ষীমাকে দর্শন করিয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধে শ্রীশ্রীরামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া ভারতের শেষ প্রান্ত কন্যা কুমারিকায় শ্রীশ্রীকুমাবী মাকে দর্শন পূজন ও বিবেকানন্দ শিলণ (সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী রক) দর্শন করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এই সবের মূলে মনোবাবুর দান সর্ব্বাগ্রে। শ্রীশ্রীভারত আশ্রম, গ্রাম পোঃ দোগাছিয়া নৈহাটীতে শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শ নিয়া সারাজীবন আশ্রমটিতে সাধন-ভজন-সহ ১৩৫০ সনের ভাদ্র মাস হইতে স্থায়ীভাবে বাস কবিতেছেন। মনোবাবুর দানের উপরই নির্ভর করিয়া প্রতি বৎসর ৺গুরুদেবের আবির্ভাব তিরোভাব উৎসব পালিত হইতেছে। গত ১৩৫০ সনের ২রা পৌষ শ্রীশ্রী৺ভারতেশ্বরী জগন্মাতার পূজা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অধুনা ব্রহ্মচারীবাবার নির্দ্দেশিত দীপান্বিতা তিথিতে বার্ষিক পূজা সুরু হইয়াছে। তাহাতেও তাঁহার দান

সর্ব্বাগ্রণ্য। ৺গুরুদেব তাঁর কাজের পুরস্কার সেই মতই ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। তাঁহার মনের জোর খুব বেশী। একান্তভাবে ব্রহ্মচারী-বাবার উপর নির্ভরশীল। তাঁহার তুলনা হয় না। মনের জোরেই আগাইয়া চলিয়াছেন। এরূপ উদারচেতা ধার্ম্মীক পুরুষের মনের জোর পাওয়া মানে ৺শ্রীশ্রী ঠাকুরের আশীর্বাদ।

শ্রীভগবানচন্দ্র নন্দী

শ্রীভগবানচন্দ্র নন্দীর পূর্ব্বনিবাস নেত্রকোণা মহকুমায় ছিল। তিনি ব্রহ্মচারীবাবার নিকট ছাত্রকালে দীক্ষা নিয়া মাত্র ২।১ বার সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের পর তিনি অধ্যাত্ম-জীবন যাপন আরম্ভ করিয়া একবার ব্রহ্মগায়ত্রী "পুরশ্চরণ" করা কালে নানা কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহা বুঝিতে না পারায় নিজের অধ্যাত্মজীবনের প্রথমেই এক ধাক্কা খাইয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে নিয়মিত সাধনভজন করিয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের পর নেত্রকোনা মালনী আশ্রমে সর্ব্বদা যাতায়াত ও সেখানে যাবতীয় বিধিব্যবস্থার মধ্যে শ্রীভগবানচন্দ্র নন্দীও একজন। শ্রীমধুরানন্দ ব্রহ্মচারীর সংসার ত্যাগ করিয়া এই সন্ন্যাস-জীবন যাপনের তিনিই পথ-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মধুবানন্দের বাড়ী ভগবান নন্দীর বাড়ীর নিকটেই ছিল। মধুবানন্দ খুব মধুব কীর্ত্তন গান করিতেন। তাঁহার স্ত্রীবিয়োগের পর মনের অবস্থা খারাপ হইলে উদ্দেশ্যবিহীনের মত ঘুরিতে থাকা-বস্থায় শ্রীভগবান নন্দী মহাশয় তাহাকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আত্ম চিন্তায় নিয়োগের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারও সুসময় উপস্থিত হওয়ায় মালনী আশ্রমে আসিয়া আশ্রম-জীবন গ্রহণ করিলেন। পরবর্ত্তী কালে তাহা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইবে। দেশবিভাগের পর শ্রীভগবান নন্দী বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে হালিশহর ষ্টেশনের কাছে জায়গা কিনিয়া বাড়ীঘর করেন। এখনও এখানেই

আছেন। হালিশহর ষ্টেশন হইতে যে রাস্তা গঙ্গার দিকে গিয়াছে সেই রাস্তা ভগবানদার বাড়ীর উপর দিয়াই মাতৃভক্ত সাধুপ্রবব রামপ্রসাদের ঘাটে গিয়া পৌছিয়াছে। তিনি খুবই ভাগ্যবান। এই বৃদ্ধ বয়সেও প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও যোগ আরম্ভ করিলেন। প্রায় দুই মাইল রাস্তা হাঁটিয়া প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া গঙ্গাস্নান ও যোগসাধনা আরম্ভ করিলেন। ইনি বোগমুক্ত অবস্থায় অতি বৃদ্ধ বয়সে শ্রীশ্রীভাবতসাধক সঙ্ঘেরসভাপতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

৺মহেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস

মহেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, স্ত্রী তরুলতা বিশ্বাস, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅরুণকুমার বিশ্বাস। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার পূর্ব্বধলার নিকট এক গ্রামে তাঁহাদেব বাড়ী ছিল। তিনি স্কুলে পড়িতে থাকাকালে বিপ্লবী অনুশীলন পার্টির সভ্য হইয়া কাজ করিতেন। ঐ পার্টির অনেক কর্মীই ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা সদ্‌গুরু জানিয়া তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনভজন করিতে আরম্ভ কবিলেন এবং মাঝে মাঝে গুরুসঙ্গও কবিয়া পবম আনন্দ লাভ করিতেন। পড়াশুনা ছাড়িয়া সংসাবজীবনে জমিদারী সেরেস্তায় কর্ম্মসংস্থান করিলেন। তারপর পরমাভক্তিমতী শ্রীতরুলতা বিশ্বাসের সহিত শুভপরিণয় কার্য সম্পন্ন হইলে দম্পতিযুগল পরম শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শে সংসার-যাত্রা করিতে থাকেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মচারীবাবার মহাপ্রয়াণ হয়। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী করাকালে নেত্রকোনায় অনেকদিন ছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার সমাধি-আশ্রম মালনী নেত্রকোনা হইতে এক মাইলের মধ্যে থাকায় আশ্রমের সঙ্গে খুব যোগাযোগ ছিল। মা-বাবার ৺ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া মহেন্দ্রদার বড়ছেলে অরুণ ছোটবেলা হইতেই ৺ঠাকুরের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। অরুণ প্রায়ই

মালনী চিত্রধাম আশ্রমে যাতায়াত করিত। আশ্রমের সাধুসন্ন্যাসীরাও তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। অরুণ নেত্রকোনাতেই লেখাপড়া করিত। মহেন্দ্রদার বাসায় তাঁহার স্ত্রী ৺ঠাকুরের নিত্যপূজা ও অন্নভোগ দ্বারা সেবা-পূজা করিতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি ভবানীপুরে জমিদার বাড়ীতেই বদলী হইয়া যান। তখন ভবানীপুরের জমিদারী কোর্টস অব ওয়ার্ডসে ছিল। তিনিও কোর্টস্ অব ওয়ার্ডসের অধীনেই চাকুরী করিতেন। একদিন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার অফিস পরিদর্শনে আসিবেন জানাইলে, সেইদিন সকাল সকাল অফিসে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী তরুলতাকে তাড়াতাড়ি ভোগরাগের জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। ভোগবাগের কাজে একটু দেরি হইল, তিনি রাগ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে কটূক্তিও করিলেন। যাহা হউক ভোগরাগ হইল। তিনিও প্রসাদ পাইয়া বরাবরের মত এক মুষ্টি অন্ন রান্নাঘরের পাশেই পুকুরে ফেলিয়া হাতমুখ ধুইতে গেলেন। অন্নগুলি জলে ফেলা মাত্রই দেখিলেন যে অন্নগুলি জলে না ডুবিয়া উপরে ভাসিয়া রহিল। তখন তিনি পুকুরের ঘাট হইতেই তরুলতাকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন, 'দেখ আজ কি অন্যায় কাজ হইয়াছে যাহার দরুণ জলে ফেলা প্রসাদী অন্নগুলি জলের উপর ভাসিতেছে। এমন কাজ তো কোন দিন হয় নাই। অন্ন কি জলে ভাসে? আমার খুব অন্যায় হইয়াছে।' আরও কাউকে ডাকিয়া আনিয়া নিজের ত্রুটির কথা জানাইয়া এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখাইলেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই খুব অনুশোচনা করিতে লাগিলেন— হায়, কি অন্যায় করিলাম! আমাদের কি উপায় হইবে? এই অনুশোচনার সঙ্গে তাড়াহুড়া করিয়া অফিসে যাইতে একটু দেরী হইয়া গেল। অফিসে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ময়মনসিংহ হইতে কখন কর্ত্তৃপক্ষ আসিয়া পৌঁছিবেন। তখন এক টেলিগ্রাম আসিয়া পৌঁছিল যে বিশেষ কোন কারণে কর্তৃপক্ষ এইদিন আসিতে পারিবেন না। পরবর্ত্তী তারিখ পরে জানান হইবে। টেলিগ্রামের মর্ম্ম জানিয়া এইদিন আর অফিসে বসিতে পারিলেন না। অভূতপূর্ব্ব ঘটনার কথা মনে হইয়া নানারকম

অনুশোচনা হইতে লাগিল। তাই তিনি বাসায় চলিয়া গেলেন। ঠিক এই সময়ে ৺ভগবানের দূত হিসাবে নেত্রকোনা মালনী আশ্রম হইতে সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিকাল হইয়াছে। মহেন্দ্রদা সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাকে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা বলিলেন—অনুশোচনাতেই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এখন আবার ভোগের ব্যবস্থা করুন। সন্ন্যাসী দাদা নিষ্ঠার সহিত রাত্রে যথারীতি ভোগ নিবেদন করিলেন। ভোগের পর সন্ন্যাসীদাদার সঙ্গে একত্র বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। প্রসাদ গ্রহণের শেষে পূর্ব্ব নিয়মে এক মুঠা অন্ন নিয়া জলে ফেলিলেন। জলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা জলের তলে প্রবেশ করিল। আর মহেন্দ্রদা সপরিবারে অনুশোচনা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। মহেন্দ্রদার জীবনে এই রকম অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে।

দেশবিভাগের পর মহেন্দ্রদার বড় ছেলে অরুণকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। অরুণ ১৮বি, রাধানাথ মল্লিক লেনে বাস করিতে লাগিল। ১৩৬৩ সনের ১২ই শ্রাবণ ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব উৎসব করিবার মনস্থ করিয়া পণ্ডিচেরী হইতে শ্রীমৎ যোগানন্দ ব্রহ্মচারীকে উৎসবের আগেই আহ্বান করিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্যভক্তগণকে খবর দিয়া আনিয়া উৎসব করিলেন। উৎসবে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী সকলের সহিত পরামর্শক্রমে পশ্চিমবঙ্গে গুরুভ্রাতাদের একটি স্থায়ী সংঘ গঠনের প্রস্তাব করিলে তাহা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ও শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘ নামে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অবধি আমাদের এই সংঘ চলিয়া আসিতেছে। এই সংঘের মারফতেই প্রতিবৎসর ব্রহ্মচারীবাবার বাংলা ১২ই শ্রাবণ আবির্ভাব উৎসব ও রাধাষ্টমী তিথিতে তিরোভাব উৎসব ভক্তগণের বাড়ীতে চলিয়া আসিতেছে। তাহার মূলে মহেন্দ্রদার বড় ছেলে শ্রীমান অরুণ-কুমার বিশ্বাস। ১৩৬৩ সনের পর মহেন্দ্রদাও সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসেন। ১৩৮০ সালে তিনি স্ত্রী শ্রীতরুলতা বিশ্বাস, তিন ছেলে

ও এক কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ব্রহ্মচারীবাবার তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

শ্রীঅরুণকুমার বিশ্বাস, শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস ও শ্রীসুজিৎ-কুমার বিশ্বাস এই তিন ছেলে ও এক মেয়ে শ্রীমতী মিনু। সকলেই বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছে ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই আছে। সকলেই ব্রহ্মচারীবাবার একনিষ্ঠ ভক্ত। ১৩৬৩ সনের ১২ই শ্রাবণ দ্বিতীয়বার কলিকাতায় শ্রীমান অরুণকুমার বিশ্বাস ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব উৎসব করিবার জন্য পণ্ডিচেরী হইতে শ্রীমৎ যোগানন্দ ব্রহ্ম-চারীকে উৎসবের পূর্ব্বেই আনাইয়া গুরুভাইগণের খোঁজখবর নিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহে উৎসব সম্পাদিত করেন এবং এই উৎসব উপলক্ষেই শ্রীমান অরুণকুমারের বাড়ীতে যোগানন্দ ব্রহ্মচাবী গুরুভাইদের সম্মতিক্রমে শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘ নামে এই সংঘ স্থাপন করিয়া গেলেন। তাহারও কয়েক বৎসর আগে দক্ষিণেশ্বরে৺পার্ব্বতী সান্ন্যালের বাড়ীতে প্রথম পশ্চিমবঙ্গে ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু সেখানে এত ভক্তের সমাগম হয় নাই। সংঘ স্থাপনের পর গুরুভাইরা যে যেখানে আছেন খবর পাইয়া আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। খবরের কাগজেও কয়েকবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। সংঘের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়া সারা জীবন তাহার পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। সভার কার্য্যালয় ছিল ২২বি, বুদ্ধু ওস্তাগার লেন, কলিকাতা-৯, আর সভার অধিবেশন হইত ১সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর দোকানে। বহু ভক্ত এই দোকানে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘের অধিবেশন উপলক্ষ্যে।

শ্রীমৎ মধুরানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীভারতচন্দ্র দেবনাথ পূর্ব্বধলার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষিত ছিলেন। সংসারজীবন বেশ সুখেই চলিতেছিল। তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন। ভজন-কীর্ত্তন, নাম-কীর্ত্তন, বাউল-কীর্ত্তন সব দিকেই তাঁহার অধিকার ছিল এবং খুব মধুর ভাষী ছিলেন। ২।১টি সন্তান হওয়ার পর তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইলে সংসারের কাজে আর তেমন উৎসাহ রহিল না। উদাসীর মত এদিক ওদিক কীর্ত্তনাদি করিয়া বেড়াইতেন। গুরুভ্রাতা শ্রীভগবানচন্দ্র নন্দী তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাদের গুরুদেবের মালনী আশ্রমে প্রথম সেবায়েত হিসাবে লোকের অভাব। তুমি গুরুভাই, আশ্রমে গিয়া সেবাপূজার কাজ কর। আর ভজন-কীর্ত্তনের তো মহাসুযোগ সেখানে রহিয়াছেই।' তিনি এই রকম চিন্তাই মনে মনে করিতেছিলেন। ভগবানদা তাহার উপলক্ষ্য হইলেন। তিনি বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সন্তানদের ব্যবস্থা করিয়া একেবারে ভগবানদার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন --চলুন আশ্রমে যাই। ভগবানদাও তাঁহাকে নিয়া আশ্রমে গিয়া আশ্রম কমিটির সকলকে ডাকিয়া তাঁহার কথা উত্থাপন করিয়া আদ্যন্ত বলিলেন। ভগবানদাও কমিটির একজন সদস্য। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তখন তাঁহাকে আশ্রম-সেবার কাজে নিযুক্ত করা হইল। অন্ধ চায় দৃষ্টিলাভ করিতে— ভারতচন্দ্র মন প্রাণ দিয়া ৺ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত হইলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার অন্তরদৃষ্টি খুলিয়া গেল। তাঁহার সেবা-পূজা ও সুমধুর কণ্ঠসঙ্গীতে নিজেও মজিলেন আর সকলকেও মজাইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন তাঁহার ব্যবহারে ও সাধন ভজনে। অতঃপর তিনি মধুরানন্দ ব্রহ্মচারী নাম ধারণ করিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন গুরুদেবের সমাধিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার। বাহির হইয়া পড়িলেন অর্থ সংগ্রহের জন্য। চারিদিকে সাড়া পড়িল আর অর্থও আসিতে লাগিল। সমাধি-মন্দিরের কাজও সুরু হইয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই মন্দিরের কাজ শেষ হইল। ব্রহ্মচারী-

বাবার সমাধির উপর সুরম্য মন্দির স্থাপিত হইয়া গেল। তাহার কিছুদিন পরেই ব্রহ্মচারীবাবার জন্ম ও সাধন ভূমি জগদল হইতে মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া আসিয়া খবর দিল যে সাধুবাবার জন্মভিটাটি হস্তান্তর হইয়া যাইতেছে। যদি আপনারা ইহা রক্ষা করিতে চান তবে আমরা স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি। মধুরানন্দ এই সংবাদ পাইয়া সকল গুরুভাই ও অনুরক্ত ভক্তগণকে জানাইয়া জগদল অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন ও সেখানে গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ব্রহ্মচারীবাবার জন্ম ও সাধন ভূমি উদ্ধার ও মন্দির স্থাপনের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিলেন। অচিরেই জায়গা উদ্ধার ও মন্দিরের কাজ আরম্ভ হইল। তাহাতে দুই বৎসরাধিক কাল অতীত হইতে থাকা কালে হঠাৎ তাঁহার পরম ডাক পড়িল। তিনি মন্দিরেব কিছু কাজ অসমাপ্ত রাখিয়াই পরমধাম প্রাপ্ত হইলেন। বহু শিষ্য, সেবক ও অনুরাগী ভক্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা

শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা, পিতা ৺মথুরচন্দ্র সাহা, সাং-ঢুলদিয়া। ৺মথুর সাহা একজন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। ঢুলদিয়া বাজারে তাঁহার একটি মনিহারি ও পশারীর নামকরা পাইকারী ও খুচরা দোকান ছিল। তিনি একজন সৎব্যবসায়ী বলিয়া এতদঞ্চলে খুব সুনাম ছিল। সারাদিন ব্যবসায়ের কাজে মনোযোগের সহিত লিপ্ত থাকিতেন, রাত্রে দোকান বন্ধ করিয়া রোজ ঢুলদিয়া হইতে প্রায় এক মাইল দূরে গচিহাটায় গোস্বামীদের পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত ৺রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গোঁসাইদের সঙ্গে নামকীর্ত্তন করিয়া রাত ১টা-২টায় বাড়ী ফিরিতেন। এই ছিল তাঁর নিত্যকর্ম্ম। তাহার কোনদিন ব্যতিক্রম হইত না। ৺মথুর সাহা না যাওয়া পর্য্যন্ত গোস্বামী মহোদয়েরা সকলে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন।

এছাড়া ঐ আঙ্গিনায় নামকীর্ত্তন মহোৎসবাদি লাগিয়াই থাকিত। ৺মথুর সাহাও তাহাতে যুক্ত হইয়া থাকিতেন।

এই মহাসাধুর পুত্র শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা ও শ্রীগোপালচন্দ্র সাহা দুই ভাই বর্ত্তমানে ৫০১/৩ অশোকনগরে বাস করেন। পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা বনগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন সেই স্বদেশী যুগের আমলে। দেশ উদ্ধার ব্রত তখনকার যুগের যুগধর্ম্ম ছিল। পাঠ্যাবস্থায়ই সেই মন্ত্রে দীক্ষা নেন। তারপর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া অনেকবার কারাববণ করেন। বার বার কারাবরণ করিয়া ১২।১৪ বৎসর জেল-জীবন যাপন করিয়াছেন।

বাল্যকালে ছাত্রজীবনেই ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গ লাভ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ ও উপাসনাদি কাজে মনোযোগ দেন। তাহা পরবর্ত্তী কারা-জীবনে আশীর্ব্বাদস্বরূপ কাজ করিয়াছিল। অনেকেই কারাজীবনের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া পাগল হইয়াছেন নতুবা আত্মহত্যা করিয়াছেন, এমনও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবার কৃপায় এই লোকটি সাধন-ভজনেই পরমানন্দে দীর্ঘ কারাজীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন। এই কারাজীবনে তিনি যে সব লোকের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শ্রীমাখনলাল বসু মহাশয় অন্যতম। মাখন-বাবু তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ সাথী।

মাখনবাবু একটু নাস্তিক ধরণের লোক ছিলেন। সতীশদার সঙ্গ লাভ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবার প্রসঙ্গাদি শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং জেলের মধ্যেই তাঁহার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন। অদ্যাবধি মাখনবাবু ব্রহ্মচারীবাবার একনিষ্ঠ ভক্ত ও সপরিবারে তাঁহার একনিষ্ঠ অনুরাগী। নিয়মিত সেবাপূজাদি তাঁহার বাড়ীতে বিদ্যমান।

সতীশ সাহা কিশোরগঞ্জ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। আমাদের ময়মনসিংহের প্রধান নেতৃস্থানীয় স্বরেন্দ্রমোহন ঘোষের সহকর্মী হিসাবে কাজ করিয়াছেন, বহু সভা-সমিতিতে স্বদেশী আমলের

মর্ম্মস্পর্শী বক্তা ছিলেন। বঙ্গ বিভাগ হইয়া স্বাধীনতার আমলে পূর্ব্ববঙ্গে বসবাস পরবাসীর মত হইয়া গেলে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসেন। এখানে আসিয়া আর তেমন যোগাযোগ রাখা ছাড়িয়া দিলেন। সাধারণভাবে যাহা না রাখিলে নয় সেইভাবে চলিতে থাকায় অর্থনীতিতে আর বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। সারাজীবন দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকায় পৈত্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যতে আর মনোযোগ দিতে পারেন নাই। দেশ বিভাগ হইলে দেশের সব ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনসন লাভ করিয়া তাহাতেই কোনমতে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইলেন। তিনি শ্রীশ্রীসাধন সংঘের একজন আজীবন সভ্য। অধ্যাত্মজীবনের সম্পদস্বরূপ কিছু মন্ত্রশিষ্য করিয়াছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আমলেই বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু একটি মাত্র কন্যার জন্মদান করিয়াই কারাজীবনধারী স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাঁর স্ত্রী পরমধাম প্রাপ্ত হইলে পরে আর তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। এইভাবেই এককন্যার বিবাহ দেওয়ার পর একটি নাতনী রাখিয়া জামাই পরলোক প্রাপ্ত হইলে বিধবা কন্যা ও নাতনীর ভরণপোষণের ভার নিজের উপর পড়ায় সংসার ত্যাগের উপায় বন্ধ হইয়া যায়। সংসারে বিরাগী হওয়া স্বাভাবিক হইলেও পারিপার্শ্বিক বন্ধনে তাহা অচল হইয়া যায়। এখন রাজর্ষি জনকের পথ তিনি ধরিয়াছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসন পান এবং তাতেই কোনমতে সংসারের চাহিদা মিটিয়া যায়। কোন রকম বিলাসিতা নাই। ভাব আছে তাই অভাব খুব সুবিধা করিতে পারে না। এইভাবেই বেশ আছেন।

শ্রীমাখনলাল বসু

শ্রীমাখনলাল বসুর বাড়ী ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমায় ছিল। ময়মনসিংহে থাকিয়াই লেখাপড়া করিয়াছেন। তখনকার স্বদেশী যুগের কর্ম্মী কেহই নিষ্কৃতি পান নাই। তিনিও দীর্ঘদিন জেল-জীবন যাপন করিয়াছেন। এম. এ. পাস করিয়া জেলে গিয়া আইন পরীক্ষা

দিলেন এবং পাস করিলেন। হিজলী জেলে থাকাকালীন আমাদের গুরুভাই শ্রীসতীশ সাহার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয়। সতীশদা জেলে অবস্থান কালে নিয়মিত যোগাভ্যাস করিতেন। সেজন্য তাঁহাকে সকলেই সাধুবাবুও বলিয়া ডাকিত। তাঁহার একটি এস্রাজ যন্ত্রও ছিল। মাঝে মাঝে এস্রাজ যন্ত্রেও সঙ্গিত করিতেন।

মাখনবাবুর একটু নাস্তিক ধরনের ভাব ছিল। ঈশ্বর প্রসঙ্গে দুই জনেই যাঁর যাঁর যুক্তি তর্ক রাখিতেন। সেই সময়েই সুযোগ মত সতীশদা ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে যে সব তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা শুনাইতেন। ব্রহ্মচারীবাবার সাধণতত্ত্ব শুনিবার জন্য মাখনবাবু খুব আগ্রহী ছিলেন। সতীশদার নিকট হইতে ব্রহ্মচারী-বাবার সাধনজীবন হইতে সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত সব এবং তারপর আশ্রম জীবন, তাঁহার প্রচার কার্য্য ও দেহরক্ষা পর্য্যন্ত সব তথ্য শ্রবণ করিয়া মাখনবাবুর নাস্তিকতা বিদূরিত হয়। জেলেই তিনি সতীশদার নির্দেশ মত সাধন-ভজন সুরু করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তদাবধি তাঁহার ব্রহ্মচারীবাবার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রগাঢ়ভাবে পরিস্ফুট হয়।

জেল হইতে মুক্তি পাওয়ার পর সন্ন্যাসী হইবার অভিপ্রায় নিয়াই বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ী ফিরিয়া কিছুদিন পরই তিনি ব্রহ্মচারীবাবার সমাধি স্থান নেত্রকোনার মালনী আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আশ্রমে তো ভিক্ষার দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা দিয়াই দৈনিক ভোগরাগ হয়। সঞ্চয়ের কোন বালাই নাই। আশ্রমবাসীরা আহার-সংযমে কঠোর। মাখনবাবুর আহার-সংযম অভ্যাস নাই। সারাদিনে একবার ভোগ লাগে, অপরাহ্ন হইয়া যায়। একদিন মাখনবাবু ভিক্ষায় গেলেন। ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আসিতে বেলা ১০টা হইয়া গেল। পরিশ্রম ও ক্ষুধায় তিনি রাস্তায়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। আর চিন্তা করিতে লাগিলেন 'ঠাকুর ভীষণ পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। আমার মত ক্ষুধার্ত্তের সন্ন্যাস হইবে না।' এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়া আশ্রম ছাড়িয়া ময়মনসিংহের বাসায় গিয়া

ওকালতি ব্যবসা করিবার মনস্থ করিয়া কাজে নিযুক্ত হইলেন। সংসার আশ্রমেই নিয়োজিত হইবার সিদ্ধান্তে বিবাহ করিলেন। ওকালতি চলিতে থাকিল। ব্রহ্মচারীবাবার সম্বন্ধে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খবরাখবর নিয়া তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গেল।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া নানারকম পরিকল্পনা করিয়া জীবিকার ঠিক ব্যবস্থা না হওয়ায় পরিশেষে তিনি পূর্ব্ব ব্যবসায়ে মনোযোগ দিলেন। এখন পর্য্যন্ত আলিপুর কোর্টে ওকালতি করিয়া যাইতেছেন।

শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘের তিনি একজন সুদক্ষ সভ্য। সংঘ স্থাপনার পর হইতেই গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "সোনার ভারত" নামক একটি ধর্ম্মীয় মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। মাখনবাবু সেই 'সোনার ভারত' পত্রিকা পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশ ও পরিচালনা করিবার জন্য সংঘের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়। এই 'সোনার ভারত' পত্রিকা পরিচালনা করিবার উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটি প্রেস স্থাপন করিয়া মাসিক পত্রিকা 'সোনার ভারত' প্রচার আরম্ভ করেন। তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে মাখনবাবুও অন্যতম। পত্রিকার জন্য তিনিও খুব আর্থিক, কায়িক ও মানসিক সাহায্য করিয়াছেন। কর্ম্মঠ পরিচালকের অভাবে ছয় মাসের বেশী পত্রিকাটি টিকিল না।

তিনি সাধন সংঘের একজন প্রবীণ সভ্য। অনেকদিন সহসভাপতি হিসাবে সংঘের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি বহু গুণান্বিত ও ব্রহ্মচারীবাবার একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা প্রণতি বসুও সাধন সংঘের একজন সভ্যা। তিনি খুব ভক্তিমতী এবং ঠাকুর সেবা তাঁহার নিত্যকর্ম্মের অঙ্গ। ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শ এই পরিবারের সকলেই পালন করিয়া আসিতেছেন। সংসারজীবন অতিশয় শান্তিতেই অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান বাসস্থান ৫/এ, মহীশূর রোড, কলিকাতা-২৬।

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়
শ্রীযুক্তা সুরুচিবালা রায়

উপেন্দ্রকিশোর রায় কান্দিউরা স্কুলের বিপ্লবী ছাত্র, ব্রহ্মচাবীবাবাব নিকট দীক্ষিত ও তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। ছাত্র ও বিপ্লবী জীবনে ব্রহ্মচারীবাবার নিকটই যাতায়াত করিয়া কাটাইছেন। পরবর্ত্তী কালে বিবাহের পর তাঁহার সংসারজীবনের প্রারম্ভেই ব্রহ্মচারীবাবা দেহত্যাগ করেন। গতিকেই পরবর্ত্তী কালে আশ্রমের সঙ্গে আর খুব যোগাযোগ রাখেন নাই। তবে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির অভাব ছিল না।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উপেন্দ্রদা ও তাঁর স্ত্রী সুরুচিবালা দিদি শ্রীশ্রীভারতসাধন সংঘের সভ্য ও সভ্যা হইয়া নিয়মিত সংঘে ও উৎসবাদিতে উপস্থিত থাকিতেন।

উপেন্দ্রদা খুব একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সুরুচি-বালা দিদি পূর্ব্ববঙ্গে থাকাকালীন একবার ভীষণ জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। অজ্ঞান অবস্থায় একজন সাধু আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিলেন। এই শীতল হাতের পরশে তাঁহার সর্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল। জাগিয়া দেখেন তাঁহার আর জ্বর নাই। ওই সাধুর চেহারাটা মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই। উপেন্দ্রদার বাড়ীতে ঠাকুরের ফটোও ছিল না। সুরুচি দিদির বড় ভাই তারাকান্ত চৌধুরী (খারুয়া) ময়মনসিংহে কাজ করিতেন, সেখানে তাঁহার বাসা ছিল। ময়মনসিংহে দাদার বাসায় বেড়াইতে গিয়া দেখেন দাদার বাসায় ঠাকুরের আসনে সেই সাধু বসা। দেখিয়া সুরুচি দিদির সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। সেখানে প্রণাম করিলেন। দাদাকে কখন জিজ্ঞাসা করিবেন সেই অপেক্ষায় ছিলেন। দাদা বাসায় আসামাত্র আগে জিজ্ঞাসা করিলেন যে—তোমার আসনে যে ফটো দেখিতেছি ইনি কে? এই ফটো কোথায় পাইলে? দাদা বলিলেন, 'ইনি আমাদের গুরুদেব শ্রীমদ্‌ভারত ব্রহ্মচারীবাবা। তিনি তোমাদের গুরু, উপেন্দ্রও তাঁহার নিকট দীক্ষিত।' পরে সুরুচি দিদি

দাদার কাছে তাঁহার জ্বরকালীন ঘটনা সব খুলিয়া বলিলেন। দিদি প্রাণমন দিয়া ঠাকুরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা এই ঘটনার অনেক আগেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া দিদি শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘের মারফতে ঠাকুর সেবার সুযোগ পাইলেন। ঠাকুরের ফটো নিয়া বাসায় রীতিমত ঠাকুরের সেবা পূজার্চনা করিয়া খুব অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের প্রত্যেক উৎসবে সুরুচিবালা দিদি ও পূর্ণেন্দুদার স্ত্রী গীতা-রাণী দত্তরায় উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের যাবতীয় সেবাপূজার কাজ অন্যান্য সকলকে নিয়া পরম ভক্তি সহকারে সম্পাদন করিতেন। গীতারাণী দত্তরায় আর ইহজগতে নাই। এখন সুরুচি দিদি অন্যান্যদের সঙ্গে সেবাপূজার কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অগাধ নিষ্ঠাভক্তির তুলনা নাই। শারিরীক অসুস্থতা নিয়াও অতি নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের কাজ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীসাধন সংঘের বরাবর সভ্যা আছেন।

৺তারাকান্ত চৌধুরী

তারাকান্ত চৌধুরী বিপ্লবী যুগের ছাত্র, ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষিত একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের পর ব্রিটিশ আমলেই বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ত্রী মারা গেলে পর সংসারের মমতা ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হিসাবে সারাভারত কপর্দ্দকহীন অবস্থায় বেশী পথ পায়ে হাঁটিয়া পরিক্রমা করিয়া যাবতীয় তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া হুগলী জেলার রঘুনাথপুর, পোঃ নইসরাই গঙ্গার ধারে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া এক কোম্পানীতে চাকুরী করিতেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে সংসারযাত্রার জন্য পুনরায় এক বয়স্কা রমণীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সংসারযাত্রা করিতেন। এই স্ত্রীও ভক্তিমতী, সেবাপরায়ণা ও নিষ্ঠার সহিত

স্বামী সেবা করিয়া শেষজীবনে তারাকান্তদাকে খুব শান্তি দান করিয়াছেন। তারাকান্তদা শেষজীবনে ঐ রঘুনাথপুরের বাড়ীতে দুইবার ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব করিয়া সমস্ত গুরু ভ্রাতাগণকে প্রাণ ভরিয়া আহ্বান করিয়াছেন।

তারাকান্তদা ময়মনসিংহে থাকাকালীন তাঁহারই বাসাব আসনে তদীয় ভগ্নী স্নুরুচিবালা দিদি ব্রহ্মচারীবাবার ফটো দেখিয়া অভিভূত হইয়াছিলেন। সেখানেও ঠাকুরের আসনে দৈনিক নিয়মিত সেবাপূজার্চ্চনা হইত। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামেব পেনসন পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহা নিজে গ্রহণ কবিতে পারেন নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী মালতী চৌধুরাণী তাহা পাইতেছেন।

৺কুমুদচন্দ্র সরকার

ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল গ্রামে কুমুদচন্দ্র সরকাব বাস করিতেন। তিনি সাধাবণ লেখাপড়া জানা গ্রামীণ লোক ছিলেন। তাঁহার মনে একটু কবিত্ব ভাব ছিল। গানবাজনায় ও কীর্ত্তনাদিতে বেশ আসক্তি ছিল। আধ্যাত্মিকি চর্চ্চারও কিছু চাহিদা ছিল। এই সময়ে ব্রহ্মচারীবাবার সন্ধান পাইয়া তাঁহাব নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তিনি কৃপাবশত দীক্ষাদানে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন। কুমুদদা শ্রদ্ধাভক্তির জোরে বেশ অগ্রসর হইয়াছিলেন।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে আসিলে শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘের মারফতেই তাঁহার পরিচয় পাই। তিনি খুব নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। সাধন সংঘের অধিবেশনে আসিয়া তিনি ঘরের এককোণে চুপচাপ বসিয়া একখণ্ড কাগজ ও কলম নিয়া লিখিতে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সংঘের অধিবেশনে এক চমৎকার মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়া সকলকে শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার চেহারার নমুনা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় না যে, এই ব্যক্তি এমন স্নুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব।

দেহত্যাগের কিছুদিন আগে তিনি ব্রহ্মচারীবাবার সাধনাবস্থা হইতে সুরু করিয়া বৈরাটী গৌরীআশ্রম প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন-গাথা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষকভাবে সঙ্গীতাকারে রচনা করিলেন এবং আমাদের কোন এক উৎসবে ৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীটে যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাসায় কয়েকজন সঙ্গীতকারকে দিয়া তাহা পরিবেশন করাইয়া এমন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করিলেন যে প্রতিটি ভক্তই অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি এই উৎসবেই অসুস্থ হইয়া অনেকদিন নানা হাসপাতালের চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও আর নিষ্কৃতি পাইলেন না। শেষ পর্য্যন্ত হাসপাতালেই তাঁহার শেষনিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার রচনাবলীও .তাঁহার পথেই অন্তর্ধান হইয়া গেল। দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াও তিনি মনের জোরে তাঁহার বাসস্থানে দুইবার ঠাকুরের উৎসব করিয়াছেন।

নিরীহ মানুষের মত তিনি তামাক খাইতেন আর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে, আমার কোন চিন্তা নাই। যিনি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন তিনিই সমাধা করিবেন। আমি কি করিব। তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তির জোরে সবকাজ সুচারুরূপে শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি কোন চিন্তাই করেন নাই। এইভাবে তিনি দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া বেশ আনন্দেই ঠাকুরের উপর নির্ভরশীল থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী ও দুই পুত্র বর্ত্তমান আছে।

শ্রীঅবনীমোহন দত্ত

শ্রীঅবনীমোহন দত্তর ময়মনসিংহ জেলার নিয়ামতপুর গ্রামে বাসস্থান ছিল। ছোট বেলায়ই ব্রহ্মচারীবাবার ভক্তের নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উপাসনাদি করিয়া আসিতেছেন। দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসেন ও নৈহাটিতে বাসস্থানের জায়গা করিয়া সেইখানেই বাস

করিতেছেন। শ্রীশ্রীভারতসাধন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি একজন উক্ত সংঘের সভ্য হন। এবং নিয়মিতভাবেই সংঘের প্রতি যোগাযোগ রাখিয়া চলিতে থাকায় সংঘ সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়া আজও নিয়োজিত আছেন। আর্থিক খুব সুব্যবস্থা না থাকিলেও ঠাকুরের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাভক্তি আছে। নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনা পূজাপাঠ জীবনের ব্রত হিসাবেই চালাইয়া যাইতেছেন। সংঘের কাজ সদিচ্ছা ও নিষ্ঠার সহিত করিবার মনোবৃত্তি থাকিলেও আর্থিক সংকটে ঠিকমত তাহা পরিচালনা করিতে পরিতেছেন না। পরিবারের সকলেই ঠাকুরের প্রতি অনুরক্ত। দারিদ্র্যের ভিতর দিয়াও ব্রহ্মচারীবাবাকে উপলক্ষ্য করিয়া বেশ আনন্দেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছেন। শ্রদ্ধাভক্তিই তাঁহার পাথেয়।

৺রামমোহন বিশ্বাস

রামমোহন বিশ্বাস ময়মনসিংহ জেলার কোন এক গ্রামে বাস করিতেন। তিনিও ছাত্রাবস্থাতেই ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বি. এ. পাস করিয়া তিনি শিক্ষাকতার কার্য্য করিতেন। দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াও মাষ্টারী করিয়া শেষে বাঁশদ্রোনিতে রায়পাড়ায় নিজে পাকাবাড়ী করিয়াছিলেন। শেষজীবনে ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শে খুব নিষ্ঠার সহিত সাধন ভজন ও নিয়মিত পূজাপাঠ করিতেন। শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘের একজন সভ্য ছিলেন। নিজে বাড়ী করিয়াই ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব উৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তার পরও আরও একবার উৎসব করিয়াছেন। তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। স্বামী স্ত্রী শ্রদ্ধার সহিত ঠাকুর সেবা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। গুরুভাইভগ্নীদের উপর তাঁহার অকৃত্রিম ও উদার স্নেহ-ভালবাসা ছিল। স্ত্রী বর্ত্তমান রাখিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন।

৺গোবিন্দচন্দ্র বিশ্বাস

কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী গ্রামে গোবিন্দ বিশ্বাস মহাশয় বাস করিতেন। তিনি ছোট বেলায়ই ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা লাভ করেন। ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে সাধন-ভজন নিয়া সংসারে থাকিয়াই অগ্রসর হইতে থাকেন। অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি একজন পাঠক ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বক্তা হইয়াছিলেন। পরে এতদঞ্চলে বহু শিষ্য-সেবক করিয়া জীবনযাপন করিতেন। দেশ বিভাগের পরও তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসেন নাই। ছেলে এখানেই চাকুরী করিত। সাধনভূমি পরিত্যাগ করিয়া শেষে পশ্চিমবঙ্গে ছেলের এখানে আসিয়া মারা যান। শ্রীশ্রীভারত সংঘের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল না।

৺যোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুন

যোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুন কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ তালুকদার পরিবারের লোক। তিনি মা-কালীর ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জয়কালী নামে একটি যাত্রাদল ছিল। ব্রহ্মচারী-বাবা যখন জন্মভূমি ও সাধনভূমি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীয়া পাগলনাথ সিদ্ধাশ্রমে গিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই সময়েই কারকুন মহাশয় তাঁহার জয়কালী যাত্রাদল নিয়া লক্ষ্মীয়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

লক্ষ্মীয়া বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। শ্রীমহেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহারা আস্তানা করিয়া ঐ গ্রামে ও আশেপাশের গ্রামে অভিনয়করিতে থাকাবস্থায় জানিলেন এখানে পাগলনাথের বাড়ীতে একজন মহা-পুরুষ আসিয়াছেন। শুনিয়া দলের মালিক কারকুন মহাশয় ব্রহ্মচারী-বাবাকে দর্শন করিতে গেলেন। তিনি একজন কালীভক্ত ছিলেন ও তাঁহার মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনটি প্রশ্নের যিনি ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারিবেন তাঁহার নিকট হইতেই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

ব্রহ্মচারীবাবার নিকট গিয়াই তিনি প্রশ্ন তিনটি উত্থাপন করিলে ব্রহ্মচারীবাবা অতি সহজ ভাবেই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া উক্ত কারকুন মহাশয়ের মনপ্রাণ বিমোহিত করিয়া দিলেন। আর তিনিও দীক্ষা নিবার জন্য আকুল প্রাণে প্রার্থনা জানাইলে ব্রহ্মচারীবাবা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দলের সকলেই দীক্ষা নিতে শুরু করিলেন। দলে নাচ গান করিতেন সুরেন্দ্র নামক এমন একটি ছেলে, মায়ের একমাত্র পুত্র, ব্রহ্মচাবীবাবার সঙ্গে রহিয়া গেলেন। পরবর্তী কালে সাধনভজনে ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে জ্ঞান লাভ করিলে ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত কবিলেন ও শান্তিদানন্দ নামকরণ করিলেন। ঐ শান্তিদানন্দ ব্রহ্মচারী (১) কলৌকালীমঙ্গল বা উমাপ্রেম (২) সত্যগাথা (৩) লিঙ্গপূজাতত্ত্ব (৪) ধর্ম্ম সম্মেলন—এই চারিখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সব গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় তিনি সাধনপথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলেন। দলের যাত্রাগানের জুড়ীর গায়ক রাধানাথ সবকার, সুশীলানন্দ, হরচন্দ্র বাইন ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষা নিয়া উচ্চস্তরের সাধক হইয়াছেন। যাত্রার দল এখানেই শেষ হইল।

দীক্ষার পর কারকুন মহাশয় ব্রহ্মচারীবাবাব উপদেশে বাড়ীতে পৃথক আঙ্গিনা করিয়া মা কালীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন ও নিত্যপূজা ভোগরাগ সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। আমরা শুনিয়াছি অচিরেই তিনি মায়ের আদেশ পাইতে লাগিলেন ও মায়ের আদেশেই তাঁহার জীবন পরিচালিত হইত। দেশ বিভাগেব পর তিনি মায়ের আদেশে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া মছলন্দপুর ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে দক্ষিণ চাতরা গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নব্বই বৎসরেব উর্দ্ধকাল জীবিত থাকিয়া সুস্থ ও সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন ১৩৬৩ সনের আষাড় মাসে। তাঁহার জীবনের অনেক কাহিনী পশ্চাৎপটেই রহিয়া গিয়াছে।

তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান আছে। তিনি জীবনে একজনকেই দীক্ষা ও শিক্ষা দিয়াছেন এই দক্ষিণ চাতরার শ্রীনির্মল

পাল নামক এক ভক্তকে। এই ভক্ত সংসারজীবনে কঠোর সাধন ভজন করিতেন। তাঁহার স্ত্রীরও অকালে দেহত্যাগ হয়। তারপর নির্ম্মল পাল মহাশয় সংসারের সকল মায়া পরিত্যাগ করিয়া হৃষীকেশে গিয়া সাধনভজন করিতে শুরু করেন। বর্ত্তমানে ব্রহ্মচারীবাবার একনিষ্ঠ ভক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমৎপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী দোগাছিয়া গ্রামে শ্রীশ্রীভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলে এই আশ্রমেই সাধনভজনের উপ-যুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় নির্ম্মল সাধু এখানেই চলিয়া আসিয়াছেন এবং সাধনভজনে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী সেন

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী সেন কিশোরগঞ্জের নিকট বয়লা গ্রামে বাস করিতেন। তিনি বাল্যকালেই ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষা নিয়া তাঁহার উপদেশমত নিষ্ঠার সহিত সন্ধ্যাপূজার্চ্চনা করিতেছেন। দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পাতিপুকুর S. K. Deb Road ৩নং পল্লিশ্রী কলোনীতে নিজ বাসস্থান করিয়াছেন। অবসর সময়ে শাস্ত্রা-লোচনাদি করিয়া ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শে বেশ অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীশ্রীভারতসাধন সংঘের তিনি একজন অতি বয়স্ক সভ্য। ১৩৮৭ সনের ১২ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব উৎসব খুব নিষ্ঠার সহিত সকল গুরুভাইবোনদের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে উদযাপিত হইয়াছে। উৎসবে পূজা পাঠ ভজন কীর্ত্তন ভোগরাগ প্রসাদ বিতরণ খুব সুচারু-রূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তির কোনপ্রকার ত্রুটী ছিল না। উৎসবানন্দে সকলেই সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছেন।

৺উপেন্দ্রকিশোর দত্তরায়

কাঁঠালতলীর উপেন্দ্রকিশোর দত্তরায় ব্রহ্মচারীবাবার গৃহস্থ ভক্তদের সকলের অপেক্ষা বেশী বয়স্ক ও আদর্শ ভক্ত ছিলেন। তিনি দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই ব্রহ্মচারীবাবার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সাধক ও ভক্ত ছিলেন। উপেন্দ্রবাবু জীবিতকালের অধিকাংশ সময়ই ব্রহ্মচারী-বাবার সঙ্গ করিতেন। তাঁহার আভিজাত্যপূর্ণ বিরাট বাড়ী-ঘব বিষয়-সম্পত্তি ছিল। সংসার বিরাগের দরুণ তাঁহার সব নষ্ট হইযাছে, কিন্তু সেদিকে কোন মোহ বা আকর্ষণ ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই ঠাকুরের নামে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। ব্রহ্মচারীবাবা অনেকবার তাঁহার বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। আশ্রমের বিশেষ বিশেষ কাজে উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পবামর্শ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা সেই মত কাজ করিতেন। ব্রহ্মচারীবাবার সংসারী ভক্তগণেব মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর দত্তরায় বয়সে, জ্ঞানে, গুণে, শ্রদ্ধা, ভক্তিতে সকলের উপবে ছিলেন। তাঁহার তুলনা ছিল না।

৺যামিনীকান্ত কর

যামিনীকান্ত কর ময়মনসিংহের সিংরৈল গ্রামে বাস করিতেন। কিশোরগঞ্জ বনগ্রাম স্কুলের ছাত্র। কাঁঠালতলী, বনগ্রাম, গাচিহাটা ঢুলদিয়া ব্রহ্মচারীবাবার প্রথম ও প্রধান প্রচার-কেন্দ্র। বনগ্রাম স্কুলে পাঠ্যাবস্থায়ই যামিনীদা দীক্ষালাভ করেন এবং খুব নিষ্ঠার সহিত সাধন ভজন করিতেন। তিনি সংসারজীবনে দারপরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মচারী-বাবার সঙ্গ ও আদর্শ বিচ্যুত হন নাই। সারাজীবনই ব্রহ্মচারীবাবার কাজে সহায়তা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের কিছুদিন আগেই "সোনার ভারত" পত্রিকা প্রকাশের ও সমাজ সংস্কারের কাজে খুবই মনোযোগ দিয়াছিলেন। যামিনীদা এইসব কাজে বাবার অনুসরণ করিতেন। ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের পরও পণ্ডিচেরীতে মাতৃভাণ্ডার

গ্রন্থাবলী ছাপার কাজে তাঁহার অবদান খুব বেশী। ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ছাপার কাজে যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে থাকিয়া ব্রহ্মচারীবাবার পত্রগুলি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভক্তদের বাড়ী হইতে সংগ্রহের কাজও তিনি যথাসাধ্য করিয়াছেন। তারপর পণ্ডিচেরী হইতে চারি আশ্রমের ফটোগুলিও যামিনীদার কায়িক পরিশ্রমেই উঠাইয়া পণ্ডিচেরীতে আনিয়াছেন। মাতৃভাষার গ্রন্থাবলীর পুস্তকাদি বাংলাদেশে বিক্রয় করিয়া শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের প্রেসের কতক দেনা পরিশোধ করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

দেশ বিভাগের পর যামিনীদা সিংরৈলের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কিশোরগঞ্জে বাসা করিয়া থাকিয়া গুরুভাইদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া চলিতেন ও সকলকে সাহস দিয়া চালাইতেন। অনেক নূতন নূতন যোগসূত্রও স্থাপন করিয়াছেন। হেমদা ও যামিনীদার সঙ্গ লাভেই আমাদের বর্ত্তমান শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘের একনিষ্ঠ সভ্য পরমভক্ত শ্রীমনোরঞ্জন রায় মহাশয়ের ব্রহ্মচারীবাবার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। হেমদা ও যামিনীদার নিকট হইতে ব্রহ্মচারী-বাবার আদর্শ নিয়া মনোবাবু ছোটবেলায়ই কয়েক বৎসর কঠোর সংযমের সহিত আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহার মূলে যামিনীদার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। যামিনীদা কয়েকবারই পণ্ডিচেরীতে গিয়াছেন। ব্রহ্মচারী-বাবার তথ্যাদি সংগ্রহে যামিনীদার সহযোগিতা অতুলনীয়। তিনি বাংলাদেশ প্রবর্ত্তনেব আগের বৎসরেই কিশোরগঞ্জে থাকাবস্থায় দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন।

৺সুরেন্দ্রমোহন দত্ত

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত ময়মনসিংহ জেলার সিংরৈল গ্রামের একজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত তালুকদার ও উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ পরিবারের লোক। তিনি একজন বিজ্ঞ সত্যানুসন্ধিৎসু লোক ছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার সম্বন্ধে তিনি খুবই অনুধাবন করিয়া তাঁহার কৃপালাভে নিজেকে ধন্য ও সার্থক করিয়াছিলেন।

তখনকার দিনের সামাজিক ছুৎমার্গ অনাচারের (মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা) ইত্যাদি দুর্নীতি পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে "ভারত সমাজ গঠন প্রতিষ্ঠান" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রবর্ত্তন করিয়া সামাজিক দূর্নীতি অপনোদনের জন্য গ্রামে গ্রামে প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুরেনবাবু ব্রহ্মচারীবাবার একজন আদর্শ সংসারী ভক্ত-শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার পরমভক্ত আদর্শ সংসারী শিষ্য হাসানপুরের সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়কে সুরেনবাবুর বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহার সংসারকে ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আদর্শ সংসার স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ বিভাগের পর সেখানে বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। পরবর্ত্তী কালে সকলেই পর পর দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী গ্রন্থের ২।১টি পত্র পাঠ করিলেই ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে তাঁহার কেমন নিবিড় সম্বন্ধ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন, তাঁহার তুলনা হয় না। শেষজীবনে কলিকাতায় আসিয়া দেহত্যাগ করেন।

৺সুরেশচন্দ্র সরকার

সুরেশচন্দ্র সরকার নেত্রকোনার হাসানপুর গ্রামের বিপ্লবী যুগের লোক ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায়ই ব্রহ্মচারীবাবার কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া আদর্শ সংসারজীবন যাপনের সংকল্প নিয়া সংসারযাত্রার পথে অগ্রসর

হন। ব্রহ্মচারীবাবার একজন নিষ্ঠাবান আদর্শ সংসারী ভক্ত-শিষ্য হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সংসারে থাকিয়াও প্রায়শঃই ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেন। হিন্দু সমাজের সকলকে জলচল করা, নিজের হাতে লাঙ্গল ধরা, নিজের বাড়ীতে পূজা পার্ব্বণ নিজে করা ইত্যাদি সমাজ সংস্কারের যাবতীয় কাজ তাঁহাদের গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুরেশদার বাড়ীতে বয়নশিল্পেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দেশ বিভাগের পরও কষ্ট স্বীকার করিয়া দেশ পরিত্যাগ করেন নাই। সুরেশদা কিছুদিন সিংরৈলে সুরেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার আদর্শ সংসার স্থাপনে সহায়তা করেন। শেষ বয়সে তিনি স্বদেশেই দেহত্যাগ করেন।

৺নকুল সরকার

নকুল সরকার নেত্রকোনার হাসানপুর গ্রামের একজন বিশিষ্ট কায়স্থ বংশের সম্ভ্রান্ত তালুকদার ও বিত্তশালী পরিবারের লোক ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া তাঁহার আদর্শে সংসারযাত্রায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার ভারত সমাজ গঠন প্রতিষ্ঠানের একজন বড় সভ্য ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে বার্ষিক দুর্গোৎসব হইত। ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষালাভের পর নিজের পূজা নিজে করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। হিন্দুমাত্রই সকলকে জলচল করা ও নিজে লাঙ্গল ধরার প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা হাসানপুরে সর্ব্বতোভাবে নূতন সমাজ গঠনের কাজে আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলকেই ব্রহ্মচারী-বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি দেশেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে তাঁহার ছেলেরা দেশত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বেলঘরিয়াতে বাসস্থান করিয়াছেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের আদি বাসভূমি পূর্ববঙ্গের কোণাপাড়া, বর্তমানে পি-২২৬ নং পর্ণশ্রী, কলিকাতা-৬০। পূর্ব্ব বাংলায় থাকাকালীন তিনি অগ্নিযুগের যুগান্তর পার্টির কর্ম্মী ছিলেন যোগানন্দ ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে। সেই সময় হইতেই লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে যাতায়াত করিতেন। ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার উপর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যার জন্য আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১৩৬৩ সনে ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য, প্রশিষ্য ও ভক্ত-অনুরক্তগণের স্থাপিত শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া সংঘের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যপদ বহাল রাখিয়া আর্থিক, কায়িক ও মানসিক শ্রম দিয়া সর্বান্তঃকরণে তাহা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের দেশের পরিবারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপেন্দ্রনারায়ণ রায় সস্ত্রীক ও কন্যা কুমারী ইন্দ্রানী রায়, জ্যেঠতুতো ভাই ৺সুধেন্দুনারায়ণ রায় সস্ত্রীক ও ৺শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায় সপরিবারে পুত্রকন্যাসহ শ্রীমং পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শে সাধনভজন করিতেছেন। উপেন্দ্রনারায়ণ রায় মুর্শিদাবাদে স্বগৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকাকালে ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ভূপেনবাবু ব্রহ্মচারীবাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সারাজীবন অতি নিষ্ঠার সহিত সৎসঙ্গ, ধর্ম্মালোচনা, উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাভক্তি অতুলনীয়। ৺নগেন্দ্রচন্দ্র ধর যুগান্তরের কর্ম্মী ও গুরুভাই মনে করিয়া ভূপেন্দ্রবাবুকে খুব স্নেহ করিতেন। অগ্নিযুগের পরবর্ত্তী কালে অসহযোগ আন্দোলনেও ভূপেন্দ্র-বাবুর অনেক অবদান আছে। ময়মনসিংহ সম্মিলনীরও তিনি একজন সক্রিয় কর্ম্মী। পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা ও স্ত্রী সহ তিনি জীবিত আছেন। বড় তিন ছেলেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া যোগ্য পদে অধিষ্ঠিত। সংসার-আশ্রমে শান্তি বিরাজমান।

শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র মৈত্র

শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র মৈত্র ময়মনসিংহ জেলার সদরে সেহরায় বসবাস করিতেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত হন। ঐ সময় থেকেই জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ এবং ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার এই বোধ মনে জাগ্রত ছিল। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধুদার) কথায় আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হইয়া যুগান্তর দলে যোগদান করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকায় নানা আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া কয়েকবার কারাবাসও করিতে হয়। ঐ সময় হইতেই তিনি ধর্মের দিকেও আকৃষ্ট হন।

তিনি আমাদের গুরুভ্রাতা পরম ভক্ত ৺নরেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের ময়মনসিংহ শহরে পুস্তক ব্যবসায়ের সমব্যবসায়ী বন্ধু ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পাবলিশিং ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। ১৩৬৩ সনে ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য-প্রশিষ্য ও ভক্ত-অনুরক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গঠিত শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘে উক্ত সান্যাল দাদার সঙ্গে এই ধর্ম্মপ্রাণ মৈত্র মহাশয়ও নিয়মিত ভজন কীর্ত্তন উপাসনাদি ও উৎসবাদিতে যোগদান করেন এবং দীক্ষিত না হইয়াও সংঘের সভ্য হইয়া প্রকৃত গুরুভাইর মত সকলের সঙ্গে আপন জ্ঞানে মিশিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিচেরীতে যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর ও যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর সহায়তায় শ্রীমার দর্শন লাভের সুযোগ পান এবং উদ্বুদ্ধ হন। যেহেতু ব্রহ্মচারীবাবার এখানে সাম্প্রদায়িকতা বলিতে কিছু ছিল না, তাই মৈত্র মহাশয় এইদিকে আকৃষ্ট হন এবং মৈত্র মহাশয়ের মানসিক, কায়িক ও আর্থিক দানও অনেক রহিয়াছে। আমাদের সংঘের পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন ৺পূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়। তিনি সান্যাল মহাশয় ও মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই সব করিতেন। হঠাৎ দুই মাসের ব্যবধানে ৺পূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায় ও সান্যাল মহাশয় আমাদের আরব্ধ গুরুদেবের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ শুরু করিয়া তাহার কাজ বাকি থাকিতেই উভয়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেই অসমাপ্ত কাজে সুধীন মৈত্র মহাশয় আপ্রাণ

চেষ্টায় তাহা সমাপ্তি করিতেছেন। ৮বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯ "সুপ্রকাশনী" পুস্তক প্রকাশন সংস্থা তাঁহারই নিজস্ব প্রচেষ্টায় স্থাপিত। বর্তমানে সুধীনবাবু ৫৩/১ ডাঃ নীলমণি সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯০ বসবাস করেন।

শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী

অশোকনগরে ছোটবেলা হইতেই পড়াশুনার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরীর আত্মজিজ্ঞাসা জাগে। তাই সাধু-মহাপুরুষের জীবনী সৎ গ্রন্থাদি পাঠ, সাধু সঙ্গ ইত্যাদি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের সাথে সাথেই চলিতেছিল। বি.এ. পরীক্ষা দিয়াই পাঠ শেষ করেন। তখন হইতেই অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভ হয় এবং সদ্‌গুরুর সন্ধানে লাগিয়া যান। তাঁহার পিতামাতা বর্ত্তমান এবং তিনিই সংসারের বড ছেলে ও দরিদ্র সংসারের একমাত্র ভরসা। আত্মজিজ্ঞাসা এত প্রবল হইয়া দাঁড়াইল যে কিছুতেই সংসারের দারিদ্র্য মিটাইবার দিকে মন যাইতে চাহিল না। মনের চাহিদা মিটাইবার জন্য সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ ও নামকীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলেন। কে তাহাকে অভীষ্ট সিদ্ধির পথ নির্দ্দেশ দিবেন সেই সন্ধান কবিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার মনে সাম্য অবস্থা আসিল। তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সন্ন্যাসী শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গ লাভ করিয়া আলাপ-আলোচনায় মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবার নির্দ্দেশিত সাধন পথে অতীব নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে ১৩৫০ সালের সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-ধামে চলিয়া গেলেন। পূর্ণ এক বৎসর সেখানে কঠোর তপস্যা করিয়া পুনরায় দোগাছিয়ায় গুরুদেবের শ্রীশ্রীভারত সাধন আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক হবিষ্যান্ন করিয়া তপস্যারত আছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সাধন পথে অনেক উপলব্ধিও হইয়াছে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার করগাঁও গ্রামে ১৩১১ সনের ২৯শে পৌষ শুক্রবার সংক্রান্তির দিন জন্ম। ৺ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা ও সন্ন্যাসপ্রাপ্ত চিরকুমার শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারীর তৃতীয় ভ্রাতা ও চতুর্থ ভ্রাতা সুরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ১৩২৭ সনের ৩রা জ্যৈষ্ঠ কাঁঠালতলীর পরমভক্ত ৺উপেন্দ্রকিশোর দত্ত রায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। ৺ব্রহ্মচারীবাবা কয়দিন যাবৎই এখানে উপস্থিত ছিলেন। যোগেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের এই প্রথম বাবাকে দর্শন লাভ হয়। কাঁঠালতলী ভক্তদের বাড়ীতে আরও ৩।৪ দিন থাকাকালীন ৺ব্রহ্মচারীবাবা যোগানন্দ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তদের উপস্থিতিতে আলোচনা করেন যে বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে স্কুলের পড়াশুনা ঠিকমত চলিবে না। এইসব ছেলেদিগকে আশ্রমে লইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উচিৎ শিক্ষাদান করিলে ভাল হয়। উপস্থিত সকলেই তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। কাঁঠালতলী হইতেই যোগেন্দ্র সুরেন্দ্রসহ আরও ৪।৫ জন ছেলে লইয়া ১৩২৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭।৮ তারিখের শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাতে ৺ব্রহ্মচারীবাবা লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তদবধি তাহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত জীবনযাপন শুরু হইল কঠোরতার ভিতর দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনারও ব্যবস্থা হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী আষাঢ় মাসে তাহাদের দীক্ষাদান করেন ৺ব্রহ্মচারীবাবা। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চারি বৎসর চলিয়াছিল। তারপর নানাপ্রকার বিপর্য্যয়ে বন্ধ হইয়া গেল। শিক্ষার্থীরা যার-তার বাড়ীতে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্ররও তাহাই হইল। যোগেন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া সংসার জীবনে যোগদান করিযা ১৩৩৬ সনের ফাল্গুন মাসে বিবাহ করে। ১৩৩৪ সনের পৌষ মাসে এক কন্যা পারুল ও ১৩৪৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসে এক পুত্র বাদল জন্মগ্রহণ করার পর প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে ১৩৪৮ সনের আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে। ১৩৫৪ সনের জ্যৈষ্ঠে সেই পক্ষের এক পুত্র বকুল জন্মগ্রহণ করে ও ১৩৫৮ সনের কার্ত্তিক মাসে সেই স্ত্রীও মারা গেল।

তারপর আর বিবাহ করে নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগানন্দ ব্রহ্মচারী ৺ব্রহ্মচারীবাবার উপস্থিতিতে তাহারই নির্দ্দেশে চলিতেছিলেন। ১৩৩৩ সনের ২৮শে ভাদ্র ৺ব্রহ্মচারীবাবা দেহত্যাগ করিলে তিনি পর্য্যটনেই বেশী সময় অতিবাহিত করিয়া পণ্ডিচেরী আশ্রমে উপস্থিত হন এবং শ্রীঅরবিন্দের অনুমতিক্রমে ১৩৩৮ সন হইতে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। কিছুদিন তিনি নিরুদ্দেশ অবস্থায় ছিলেন। পণ্ডিচেরী আশ্রমে স্থায়ী হইলে পর সকলেব সঙ্গে যোগাযোগ করিলে ১৩৫০ সনের অগ্রহায়ণ মাসে যোগেন্দ্র তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী ও কন্যা পারুল ও ছেলে বাদলকে লইয়া পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম পরিদর্শন করিতে গেলে, সেখানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয় ও সেই আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ দৃঢ হয়। ১৩৪৯ সনে যোগেন্দ্র তার মেজদা শচীন্দ্রর সঙ্গে কলিকাতা কলেজ স্ট্রীটে তার কাজে যোগদান করে। ১৩৫৪ সনের দেশ বিভাগেব পর তাহারা দেশত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটির নিকটবর্ত্তী দোগাছিয়া গ্রামে বাসস্থান তৈয়ার করিয়া ১৩৫৮ সনের ফাল্গুন মাসে পরিবারের সকলকে লইয়া চলিয়া আসে। ছোট ভাই সুরেন্দ্র হীরেন্দ্র দুইজন ঐ বাড়ীতে থাকে। শচীন্দ্র যোগেন্দ্র দুইজন কলিকাতা বাসায় থাকিয়া ১সি, কর্নওয়ালিশ বিল্ডিংস্থিত পাইকারী জুতার দেখাশুনা করে।

১৩৬১ সনে মেজ ভাই শচীন্দ্র মারা গেলে যোগেন্দ্র একাই ব্যবসা পরিচালনা করিতে থাকে। কলিকাতার জীবনযাপনে গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় ৺পূর্ণেন্দুভূষণ দস্তরায়ের সঙ্গে প্রথম হইতেই ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ছিল। পরবর্ত্তীকালে শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়ও আসিয়া মিলিত হইলেন। ভূপেনবাবু হিন্দুস্থান লাইফ ইনসিওরে কাজ করিতেন আর পূর্ণেন্দুদা হিন্দুস্থানের একাউন্টেন্ট ছিলেন আর সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। পাবলিশার ও বুক বাইণ্ডিং-এর কাজও ছিল। উভয়েই খুব নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করিতেছিলেন। দেশ বিভাগের পর ৺মহেন্দ্র বিশ্বাস গুরু-ভ্রাতার পুত্র শ্রীমান অরুণ বিশ্বাস ১৮বি, রাধানাথ মল্লিক লেনের বাসায়

বাস করিতেন। ১৩৬৩ সনে অরুণের একান্ত ইচ্ছায় শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী কলিকাতা আসিলেন ও ৺ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব উৎসবের আয়োজন করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আগত যতদূর জানা সব গুরুভাইদের খোঁজখবর লইয়া আমন্ত্রণ করিলেন। এই উপলক্ষে বেশ কিছু ভক্তের সমাবেশ হইল। অরুণের বাসায় খুব জাঁকজমকের সহিত উৎসব সুসম্পন্ন হইল। উৎসবে উপস্থিত সকল ভক্তগণের ইচ্ছায় পশ্চিমবঙ্গে ৺ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য, অনুশিষ্য ও ভক্তদের লইয়া একটি সংঘ স্থাপনের পরিকল্পনা হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীশ্রীভারত সাধন সংঘ নামে এক সংঘের উদ্বোধন করা হইল। যোগেন্দ্রর ১সি, কর্নওয়ালিশ বিল্ডিং কলিকাতা-১২ দোকানে প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম রবিবার সকল ভক্তগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিবেন। আর প্রত্যেকেই যে যাহার পরিচিত গুরুভ্রাতাদের সন্ধান করিয়া সংঘে যোগদানের ব্যবস্থা করিবেন। আগামী বৎসরে চারিটি উৎসব হইবে যথা— ৺ব্রহ্মচারীবাবার আবির্ভাব ১২ই শ্রাবণ, তিরোভাব রাধাষ্টমী তিথি, শুভ নববর্ষ ও শুভ ৺বিজয়ার প্রীতি সম্মেলন। এইভাবে দিনদিন ভক্তেরা যোগাযোগ করিতে থাকায় আজ সংঘের অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক ভক্তেরাই আসিয়া মিলিত হইয়াছেন।

এই সংঘের সংগঠক শ্রীঅরুণ বিশ্বাস সংঘ পরিচালনায় ৺পূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায় ও যোগেন্দ্রর একান্ত সহযোগিতায় আজ পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে ভক্তগণের সকলের বিশেষ ইচ্ছায় সন্ন্যাসী ৺শৈলজানন্দ ব্রহ্মচারীকে উপলক্ষ করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে থাবমল পাওয়ার হাউসের গায় এক ৺শিবমন্দিরে নূতন আশ্রম স্থাপন করিয়া বৎসর ২।৩ সেখানে উৎসবাদি সুসম্পন্ন করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত শৈলজানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রমে পূর্ব্ব অভ্যাস মত অনুপস্থিত শুরু করিলে সেবাইতের অভাবে আর সেখানে সেবা পূজার কাজ বন্ধ হইয়া গেলে তাহার ইতি হইয়া গেল। শৈলজানন্দ ব্রহ্মচারীও শেষে বাংলাদেশে গিয়া দেহ রক্ষা করিলেন। তারপর পূর্ব পাকিস্তানে

১৩৫০ সালের সেখ মুজিবর অভ্যুত্থানের গণ্ডগোলে শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (ইন্দুদা) তাঁহার আশ্রম নেত্রকোনার চাপারকোণা হইতে পালাইয়া আসেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া নাটাগর বাসস্থান ঠিক করিলেন। ১৩৫০ সালে ৺ব্রহ্মচারীবাবার জন্ম শতবর্ষ পূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষে টেংরা শ্রীমনোরঞ্জন রায়ের ৫/২, প্রভুরাম সরকার লেনের বাড়ীতে শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী পণ্ডিচেরী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট পূর্ণানন্দদা বলিলেন যে আমি নাটাগরে খুব অসুবিধায় দিন যাপন করিতেছি। তাই আপনি আমার একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাইবেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন সেখানে তোমার অসুবিধা হইলে আমি যোগেন্দ্রকে বলিয়া দিতেছি তোমার যদি পছন্দ হয় তাহার বাড়ীতে ৺ঠাকুর মন্দির, নাটমন্দির ও থাকবার জায়গা আছে। সেখানে গিয়া থাকিতে পার। এককথায় তিনি রাজী হইলেন। আর পরবর্ত্তী তিরোভাব উৎসব ১৩৫০ সনের রাধাষ্টমী তিথিতে তিনি সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত দোগাছিয়ায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিত সেবা পূজাদি চলিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যে ৺ব্রহ্মচারীবাবার অশেষ কৃপায় এক শিক্ষিত পরানুরাগী যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসী হইয়া আশ্রমের সকল কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন ও কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। আর এক সন্ন্যাসী গুরুভাই হৃষিকেশ ছিলেন। তিনিও আসিয়া আশ্রমে যোগদান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বয়সের ভারে প্রায় অচল অবস্থায় নিত্য কর্ম্মাদি করিয়া চলিয়াছেন। আশ্রমের পরিচালনার সিংহভাগ শ্রীমনোরঞ্জন রায় দিতেছেন। আর ভক্তগণও মাসিক চাঁদা হিসাবে কিছু কিছু দিয়া যাইতেছেন। তাহাতে সাধকদের কোন অসুবিধা হইতেছে না। গ্রামবাসীরাও সাদর সাহায্য চালাইয়া যাইতেছেন। সকলের আপ্রাণ সহানুভূতিই আশ্রম প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। ৺ঠাকুরের অশেষ কৃপায় তাহারই অনুকূল বায়ু বহিতেছে বুঝা যায়। পরম ভক্ত যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিজে মিষ্টভাষী। স্রষ্টা সতীশ সত্যিকারে

৺ঠাকুরের কৃপা পাইয়াছেন। সর্বদা ৺ঠাকুরের স্মরণ করেন তাহা তাঁহার কার্যকারণে বোঝা যায়। বহু তীর্থস্থান ঘুরিয়া আসিয়াছেন এবং সময় পাইলেই তীর্থে যাওয়ার আগ্রহ দেখান।

সংগীত

[১]

প্রাণ কান্দে তোমার লাগিয়া,
সতত তোমারে চাহে এ পরাণ
আকুল তোমার লাগিয়া
তোমা হারা হয়ে
কিবা ফল আর
বিফল জীবন রাখিয়া॥
বল, কোথা গেলে পাব তব দরশন
কি জানি কে দিবে বলিয়া
বন্ধুহীন দেশে পথ হারা হয়ে
আঁধারে মরিনু কাঁদিয়া॥
ওহে দয়াময় দেখা দিয়ে দিনে
শান্তি বারি সিচিয়া
আমার চির প্রজ্জ্বলিত
জীবনের জ্বালা
জুড়াও করুণা করিয়া॥

তারক চক্রবর্ত্তী

[২]

তুমি না জাগালে গুরু
জাগিবে না প্রাণ আমার ;
তুমি না ঘুচালে প্রভু
ঘুচিবে না এ আঁধার ;
সকলি তোমারি করে
ভুলে আছি অহংকারে,
মিছে আমার আমার ক'রে
ঘুরে মরি অনিবার ॥

তুমি না ভাঙ্গালে মোহ
ভাঙ্গাতে আর নাহি কেহ
চরণে তুলিয়া লহ
দাসের জীবন ভার ॥

তুমারি করুণা বিনা
কেহ তো তোমারে পায় না
তন্ত্রে মন্ত্রে যায় না জানা
বিনা ভক্তি উপাচার ॥

শান্তিদানন্দ

[৩]

ভজরে মন শ্রীগুরুধন
গেল দিন বিফলে,
আসিয়া ভবে বিষয় বিভবে
গরিমা গৌরবে মজিলে ;
কুচিন্তা পাশরি বল হরি হরি
ডুবিল তরী অকূলে ॥

চাহিয়া চরণে অনাথ শরণে
আকুল পরাণে ডাকিলে,
ভব ভয় যাবে অভয় পাইবে
কোলে তুলে লবে কাঙ্গালে,
আর কেন মন মোহে নিমগন
ভাসিছ নয়ন সলিলে
জয় গুরু বলে ডাক বাহু তুলে
ভব কূলে যাবে অবহেলে ॥

হৃদি মন প্রাণ জীবন যৌবন
ঢলিয়া চরণ যুগলে
জয়তি ভারত সচ্চিদানন্দ
গাও ব্রহ্মনাম কুতূহলে ॥

শান্তিদানন্দ

[৪]

বিশ্বমঙ্গলকারী
প্রেমময় হরি অরুণ বসনধারী
নমামি ভারত সুন্দরম্।
অসীম মহাগুণরাশি
স্বভাব সুন্দর সন্ন্যাসী
রূপ-উজ্জ্বল পূর্ণশশী
নমামি ভারত সুন্দরম্॥

আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়
দেহ মহা দীপ্তিময়
প্রকাশ শুদ্ধ মাধুর্য্য
নমামি ভারত সুন্দরম্
কলি কলুষ নাশন
জীব দুঃখ নিবারণ
প্রীতি পূরিত বদন
নমামি ভারত সুন্দরম্॥

হরিনাম দানকারী
মোহ পাপতাপহারী
জয় সচ্চিদানন্দ হরি
নমামি ভারত সুন্দরম্॥

পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

[৫]

প্রেমভরে গাওরে সবে
শ্রীভারতে গুণগান।
সে যে ধন্য করি ভারত ভূমি
এল জগদল ধাম।
সে যে জীবের ভাগ্যে উদয় হলো
ধন্য জগদল ধাম।
তাদের ধন্য জীবন প্রেমিক সুজন
দীনমণি আর রামরতন॥
সে যে ভবের কর্ণধার
কর অভয় চরণ মার,
সকল ভাবনা যাবে ধন্য হবে
পূর্ণ মনস্কাম।
(ও ভাই) রবে না রবে না যম যাতনা
(পাবে) ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
সে যে বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর
জগৎ সুধাকর
ভারত-লক্ষ্মী রথ সারথি
ভাবনা কিরে আর,
(ও ভাই) থাকতে তাঁরে চিনলি নারে
এমন দুরাচার অধম॥
সে যে জগদ্গুরু ভাই
এমন দয়াল দেখি নাই
এল ঘোর কলিতে জীব তরাতে
(যার) দয়ার সীমা নাই,
তোরা নয়ন মেলে হৃদয় খুলে
কল্পতরুর নে শরণ॥

রাম দাস

[৬]

এল এক সোনার মানুষ বঙ্গেতে
শ্রীভারত নামেতে ।
(ও তাঁর) হেমদণ্ড বাহু দোলে
অরুণ বসন অঙ্গেতে,
(সে যে) জীবের দ্বারে দ্বারে ফিরে
মায়া মানুষ রূপেতে ॥

(ও তাঁর) প্রেমে গড়া তনুখানা
(তাঁরে) জানতে চাইলে যায় না জানা
(ও তোর) দেহ প্রাণ সঁপে দে না
(জীবন) ধন্য হবে ভবেতে ॥

জীব মোহে কাল কাটালি
ভবে কে বা রে তুই ভুলে গেলি,
সদা কাম ক্রোধের দাস হয়ে
বদ্ধ মায়ার জালেতে ॥

ভব নদীর তুফান ভারী
(আছে) সদ্‌-গুরু-অভয় তরী,
(গাহ) জয় গুরু জয় ভারত হরি
চিন্তা কি ভব পারেতে
শ্রীভারত নামেতে ॥

রাম দাস

(৭)

তোমারে ভাবিয়া তোমারে ডাকিয়া
তোমারে চাহিয়া চলিব আমি।
তোমারি মূরতি স্মরি দিবা রাতি
ভকতি মিনতি করিব আমি॥

তব রূপ জ্যোতি হেরিব নয়নে
তব নাম গান গাহিব বদনে।
শয়নে গমনে ভোজনে কথনে।
তোমারি ধিয়ানে রহিব আমি॥
তোমারি মহিমা জাগাইব হৃদে
আপদে বিপদে সুখে বা সম্পদে
আবেগে আহ্লাদের ছুই আখি মুদে
চিন্তিব অন্তরে অন্তরযামী॥

প্রেম ফুলে আর নয়ন জলে
পূজিব ও-পদ জয়গুরু বলে
(ওগো) যাই যদি ভুলে তুলে নিও কোলে
হেলায় কাঙ্গালে ভুলো না তুমি

(৮)

শ্রীগুরু-বন্দনা

গুরুদেব দয়া কর দীনজনে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে
ভব সাগর তাড়ন কারণ হে
রবিনন্দন বন্ধন খণ্ডন হে
শরণাগত কিংকর ভীত মনে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

হৃদিকন্দর তামস ভাস্কর হে
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শংকর হে
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদভনে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

মনবারণ শাসন অঙ্কুশ হে
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে
গুণগান পরায়ণ দেবগণে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে
হৃদিগ্রন্থি বিদারণ কারক হে
মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

রিপু শোধন মঙ্গল কারক হে
সুখ শান্তি বরাভয় দায়ক হে
ত্রয় তাপ হরে তব নামগুণে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

অভিমান প্রভাব বিমর্দ্দক হে
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

তব নাম সদা শুভ সাধক হে
পতিতাধম মানবপাবক হে
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে
ভব রোগ বিকার বিনাশক হে
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

[৯]

ওঁ দেব ভারত ওঁ।
নাহি জানি উপাসনা
ভজন ব্রত সাধনা
কি গুণে হবে করুণা ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

অহেতুক কৃপাসিন্ধু
চাহে দাস একবিন্দু
শুকাবেনা তাহে সিন্ধু ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

স্বয়ম্ভূ স্বরূপ তুমি
মূলাধারে কুণ্ডলিনী
জাগাইতে নাহি জানি ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

মহাবিষ্ণু স্বাধিষ্ঠানে
ব্যাপৃত ভব পালনে
উদ্ধার অধমজনে ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

দশদল মণিপুরে
মহারুদ্র রূপ ধরে
সংহর এ তিনপুরে ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

অনাহতে তুমি ঈশ
গুণময় পরমেশ
কলুষ কালিমা নাশ ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

বিশুদ্ধ কমলে দেব
তুমি গুরু সদাশিব
ভকত বৎসল ভব ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

আজ্ঞাচক্রে তুমি চিত্ত
প্রকাশ পরমতত্ত্ব
মহত্ত্ব বিশ্বব্যাপিত ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

মহাপদ্ম সহস্রারে
ত্রিকোণ নিলয়ান্তরে
বিরাজ বিন্দু আকারে ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

অন্তরে বাহিরে তুমি
শাস্ত্র মুখে শুনি আমি
সকলের অন্তর্য্যামী ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

ব্রহ্মরূপ তুমি গুরু
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু
বিধি বিষ্ণু হর গুরু ওঁ
ওঁ দেব ভারত ওঁ ॥

শান্তিদানন্দ

(১০)

গুরুদেব দেহি পদ পরম হে
পাতি গৌর কলেবর শোভিত হে,
চারু চিকন চিকুর রাজিত হে
ভালে বালারুন লাল তিলক হে
গুরুদেব দেহি পদ পরম হে।

সুখদায়ক সুমুখ কমল হে
নাতি নীল নিভ আঁখি যোগেশ হে
শোভা বিলসিত নাসা সুন্দব হে
গুরুদেব দেহি পদ পরম হে।

কানে কনক কিরণ রাজিত হে
আভা উজল আনন আদৃত হে
ভুরু আয়ত বিশাল হৃদয় হে
গুরুদেব দেহি পদ পরম হে।

দেহ দীঘল নাভি সুগভীর হে,
কর কমল চরণ রুচির হে
বাস গৈরিক সুবেশ সুঠাম হে
গুরুদেব দেহি পদ পরম হে।

ভাষে বিরাজিত সুধা সরস হে
নাতি ধীর গতি মাতি মানস হে
বল বিরাজিত কর কোমল হে
গুরুদেব দেহি পদ পরম হে।

কভু আসনে আবেশে আসীন হে
মন মোহিত হসিত বদন হে
অক্ষমালা দোলে বক্ষ চুমিয়া হে
গুরুদেব দেহি পদ পরম হে।

জনপদ জগদল জনম হে
দীন দুঃখী কাঙ্গাল উদ্ধারক হে
নমো নারায়ণ নর আকার হে
গুরুদেব দেহি পদ পরম হে।

শান্তিদানন্দ

[১১]

প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে
শম দম সুশোভিত চারু চিত
সুখ সম্পদ আস্পদ বিভাবিত
জ্ঞান ধ্যান প্রেম রাগ রঞ্জিত হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

দীনবন্ধু দীনমণি নন্দন হে
রাম রতন সূত সুশোভন হে
জগদল ধামে দেহ ধারণ হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

লোক হিত রত প্রীত বদন হে
দুঃখ দূরিত দুষ্কৃত মর্দ্দন হে
পাপ তাপ রোগ ভঞ্জক হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

স্বতঃ বিনয় নত সুচরিত হে
শুদ্ধ কলেবর কান্তি পূরিত হে
চির কুমার স্বভাব সুন্দর হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

ভক্তি মুক্তি শুদ্ধি সিদ্ধি রাজিত হে
প্রিয় মানব মহিমা মণ্ডিত হে
শান্তি বিবেক বৈরাগ্য ভূষিত হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি রাজিত হে
ধর্ম্ম সার সত্য ভাতি শোভিত হে
জীব জগৎ সুহৃদ সহায় হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

ভক্তি প্রিয় ভব ভয় নাশন হে
পুণ্য পূর্ণ চিত পূত চরণ হে
সুখ সেবিত ভকত সুজন হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

ভাব মধুর প্রেম শ্রীনিবাস হে
প্রীতি প্রাপণ ললিত বিলাশ হে
আর্য্য আচার নিয়ম স্থাপক হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

ব্রহ্ম জ্যোতিঃ উজ্জলিত বদন হে
বর অভয় আনন্দ নিদান হে
পরমেশ নররূপ ধারণ হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

লোক হিত রত বিধৃত রূপ
বর্ষ বিংশতি অধিক কৃত তপ
শিক্ষা-দীক্ষা উপাসনা বর্ত্তক হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

শিবরূপ দিব্যভাব বিকাশন হে
সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ ঈশান হে
হরি হরাত্মক সচ্চিদানন্দ হে

প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।
দ্বৈত্য ভাব বিহীন বিশ্ব প্রেমিক হে
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় প্রচারক হে
শান্তি নিকেতন শান্তি শরণ্য হে
প্রাণ প্রতিম ভারত সুন্দর হে।

শান্তিদানন্দ

[১২]

নমো গুরু কল্পতরু ভারত ওঁ
নিত্যনিরঞ্জন দেব শাশ্বত ওঁ
ভব বন্ধন মোচন কারণ ওঁ
শোক দুঃখ পাপ তাপ নাশন ওঁ
জগদঘ মপ হব শঙ্কর ওঁ।

চারু শশাঙ্ক শঙ্কিত বদন ওঁ
ফুল্ল সরোজ সুন্দর নয়ন ওঁ
প্রীতি পূরিত মোহন মূরতি ওঁ
নমঃ গুরু কল্পতরু ভারত ওঁ।

বিশ্ব বিরাট পুরুষ রতন ওঁ
নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প নির্গুণ ওঁ
বিধি বিষ্ণু শিব সচ্চিদানন্দ ওঁ
নমঃ গুরু কল্পতরু ভারত ওঁ।

দীন শরণ পতিত পাবন ওঁ
ভব ভয় ভীত জন তারণ ওঁ
জন্ম মরণ বারণ কাবণ ওঁ
নমঃ গুরু কল্পতরু ভারত ওঁ।

চির নির্ম্মল কোমল সরল ওঁ
ভক্ত বৎসল দয়াল ভূপাল ওঁ
প্রেম সলিল অমল কমল ওঁ
নমঃ গুরু কল্পতরু ভারত ওঁ।

জ্ঞান ক্ষিরোদ সাগর কৌস্তুভ ওঁ
ভক্তি চন্দ্রমা ক্ষরিত চন্দ্রিকা ওঁ
কর্ম্ম যজ্ঞ পূর্ণ আহুতি ওঁ
নমঃ গুরু কল্পতরু ভারত ওঁ।

তব চরণে প্রণতঃ পতিত ওঁ
শুভ আশীষ বরিষ শিরসি ওঁ
তার করুণা কণিকা বিতরি ওঁ
নমঃ গুরু কল্পতরু ভারত ওঁ॥

শ্রীমহেশচন্দ্র সরকার